ভাগীরথী পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী



এ. মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২

RAMYANI BEEKSHYA
Bhagirathi Parva
(*A Travelogue in Bengali*)
By Subodh Kumar Chakravarti

প্রকাশক :
নিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীসুধীর মৈত্র
ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-১৪

স্বাতিকে

যথেমে দ্যাবাপৃথিবী সত্তঃ পর্যেতি সূর্যঃ
এবা পর্যেমি তে মনঃ।

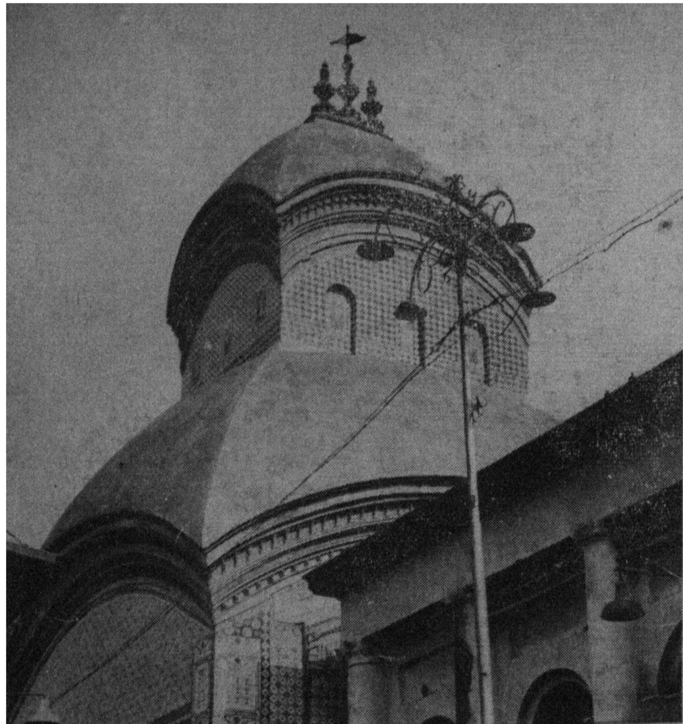
-অথর্ব বেদ, ৬.৮.৩

আকাশ-ধরা রবিরে ঘেরি
যেমন করি ফেরে,
আমার মন ঘিরিবে ফিরি
তোমার হৃদয়েরে।

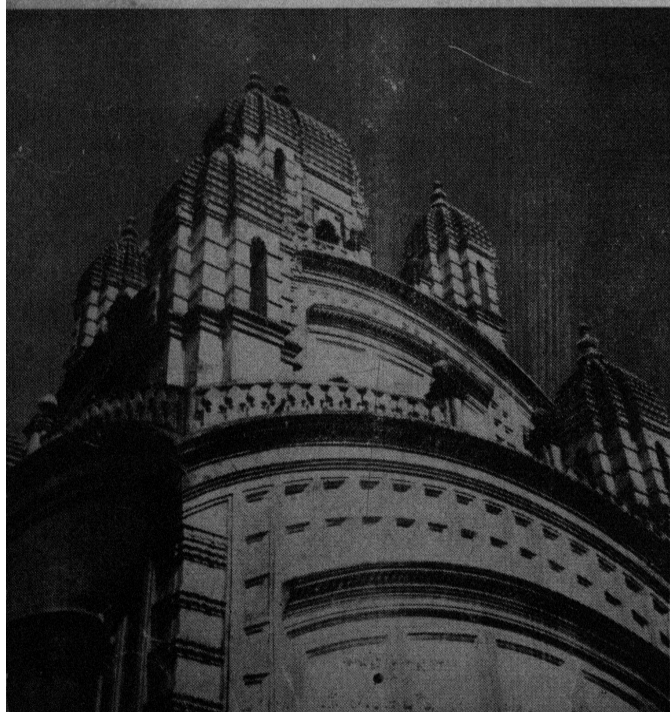
— রবীন্দ্রনাথ



দীঘার সমুদ্র সৈকত ফটো ঃ লেখক



কালীঘাটের
মন্দির



টালিগঞ্জের
মন্দির



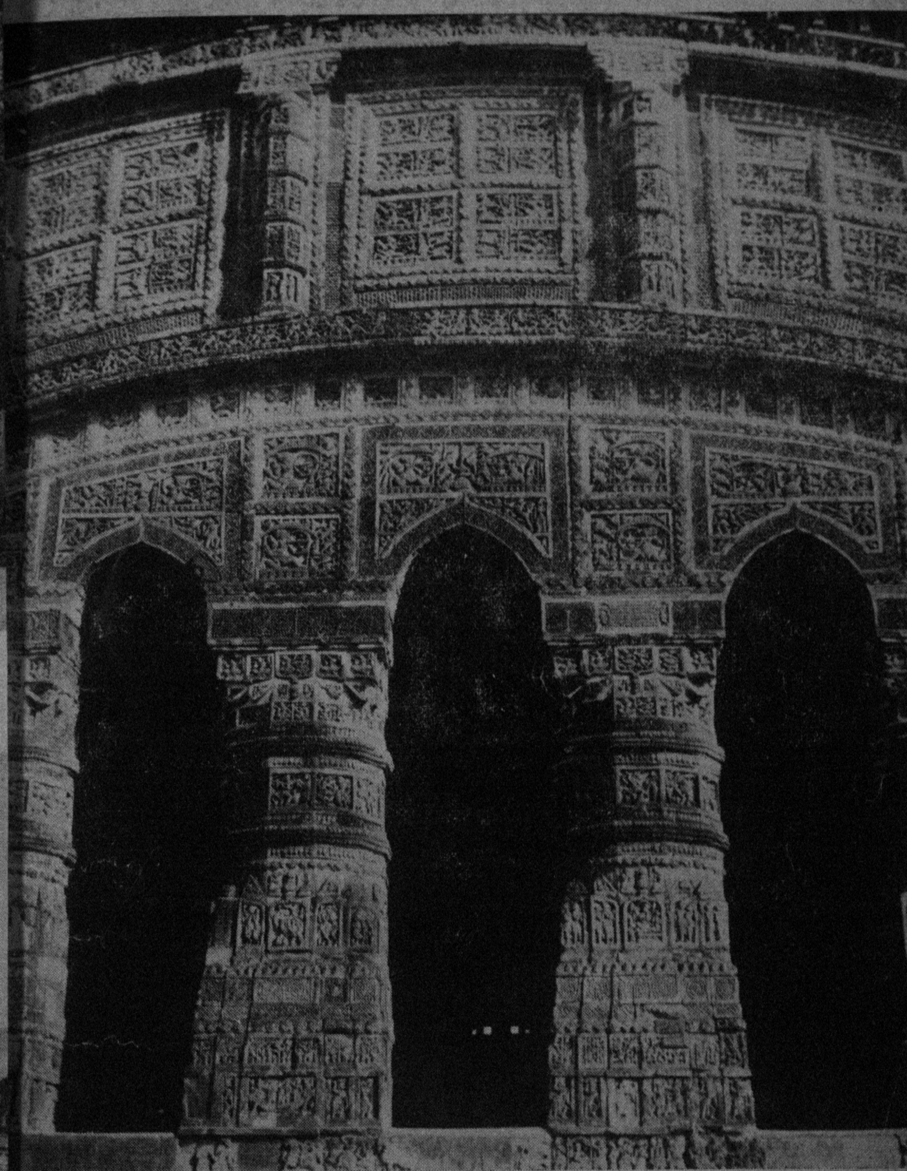
দক্ষিণেশ্বরের মন্দির

(উপরে) পরেশনাথের মন্দির (নিচে) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

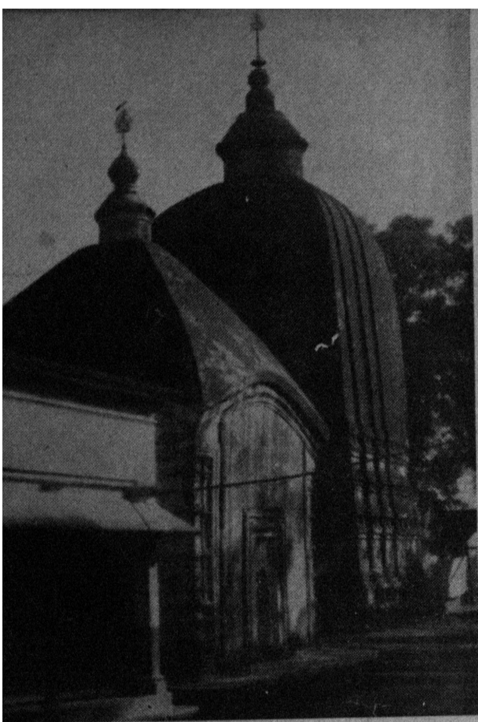
ারে) বেলুড়মঠ (নিচে) কলকাতার গঙ্গা

ফটো ডঃ সীতাংশু

(উপরে) শান্তিনিকেতনের শ্যামলী   (নিচে) দীঘার সমুদ্র

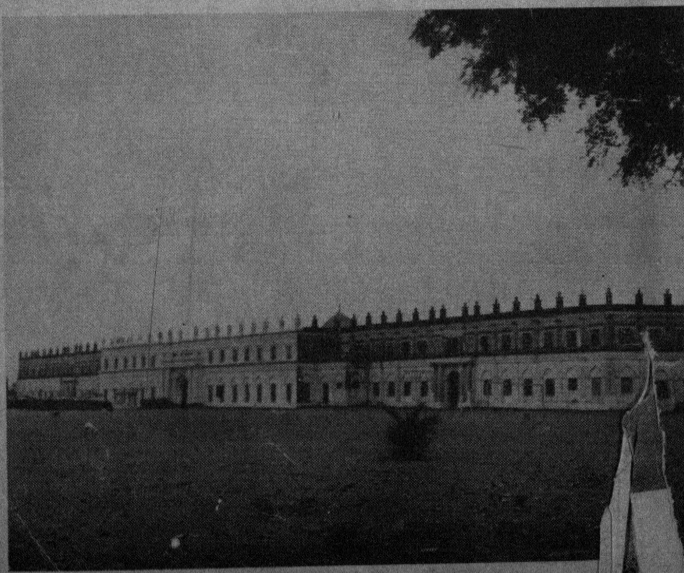


বিষ্ণুপুরের জোড়-বাঙলা মন্দিরে পোড়ামাটির কাজ 4



মলুকের বর্গভীমা মন্দির
টো : শ্রীমতী সাহানা মাইতি

মুর্শিদাবাদের ইমামবাড়া ফটো ডঃ সীতাংশু মিত্র



১

মনে হল, একটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেলুম। না, অশরীরী কোন প্রাণী নয়। দেখলুম, কোন তপস্বী পুরুষ যোগাসনে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। নারব নির্জন চারিদিক, নিস্তব্ধ অন্ধকারে আবৃত। রাতের অন্ধকার নয়। পাহাড়ের এই উপত্যকায় আলো নেই কেন, তা বুঝতে পারছি না। এগিয়ে যেতে সাহস হল না। আমি দূরে থেকে এই তপস্বীকে দেখতে লাগলুম।

কী আশ্চর্য! তপস্বীর সামনে এখন আর একটি মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। বাঘছালপরা জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসী ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। জোড় হাতে তপস্বী তাঁর কাছে কিছু ভিক্ষা চাইলেন। তারপরে দুজনেই তাকালেন উপরের আকাশের দিকে।

আমিও উপরের দিকে তাকালুম। একি, এ তো বৃষ্টির ধারা নয়। এ যে ঝর্ণার মতো প্রবল ধারা। কিন্তু এই ধারা তো পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে না, নামছে শূন্য থেকে। তার পরেই সেই ধারা সন্ন্যাসীর জটায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি নিজের চোখ দুটি রগড়ে নিলুম। না, স্বপ্ন আমি দেখছি না। তপস্বী আবার ধ্যানমগ্ন হয়ে গেছেন, অদৃশ্য হয়েছেন সন্ন্যাসী। আমিও বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। হঠাৎ চমকে উঠলুম কলকল ধারার শব্দে। দেখতে পেলুম যে সন্ন্যাসী ফিরে এসে তাঁর জটা মুক্ত করেছেন। তিনটি জলধারা পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে গেল, আর তিনটি প্রবাহিত হল পশ্চিম দিকে। তারপরে সপ্তম ধারা নির্গত হতেই তপস্বী সেই ধারার আগে আগে চলতে লাগলেন।

এবারে এই ধারা খুব বেগে বইছে। তপস্বী এখন একটি

রথে উঠে রথ ছুটিয়ে দিলেন। আর সেই প্রবল জলধারা চারিদিক প্লাবিত করে রথের অনুসরণ করে ছুটছে। কিন্তু আমি কোথায়!

আবার আমি আমার দু চোখ রগড়ে নিয়ে দু ধারে চেয়ে দেখলুম। না, এ তো পাহাড় নয়। এ আমি কোথায় বসে আছি! আব কিসের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি!

পাশ থেকে কে যেন ফিসফিস করে বলল: ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম!

পাশে তাকিয়ে দেখলুম, স্বাতি আমার কথা শুনে হাসল। কোন উত্তর দিল না।

স্টীমারে আমরা গঙ্গা পাব হচ্ছি—খেজুরিয়া ঘাট থেকে ফরাক্কা। গৌড় দেখে কলকাতায় যাচ্ছি। আমি আর স্বাতি। সঙ্গে আর কেউ নেই। স্টীমারের উপর তলায় সামনের দিকে বসেছি দুজনে। অন্ধকারে বাতি জ্বেলে স্টীমার চলছে। জলের শব্দ পাচ্ছি, ইঞ্জিনের শব্দও। এক ফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। সেই চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সব কিছু। শীতল বাতাসে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম আমি। সারাদিনের পরিশ্রমের জন্যে সামান্য একটুখানি তন্দ্রার মতো ঘুম। কিন্তু ঘুমিয়ে যা দেখলুম, সে কি আমার কল্পনা!

না, কল্পনা নয়। যে তপস্বীকে আমি দেখলুম, তিনি সাধারণ মানুষ নন। তাঁর মতো মনোবল থাকলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। তিনিও তাই করেছিলেন। সগর বংশ উদ্ধারের জন্যে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে এনেছিলেন অযোধ্যার রাজা ভগীরথ।

সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। আর যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। কোথায় লুকিয়ে রাখবেন সেই ঘোড়া! সাংখ্য-দর্শন প্রণেতা কপিল মুনি পাতালে তপস্যা করছেন, ইন্দ্র তাঁরই আশ্রমে ঘোড়া লুকিয়ে রাখলেন।

সগরের ষাট হাজার পুত্র খুঁজতে খুঁজতে পাতালে গিয়ে ঘোড়া দেখতে পেল। ভাবল যে মুনিই ঘোড়া চুরি করেছেন। তাঁকে আক্রমণ করতে গিয়েই তাঁর রোষে সবাই ভস্ম হয়ে গেল।

সগরের ছিল দুই রাণী। বড় রাণী হলেন বিদর্ভ রাজকন্যা কেশিনী, আর ছোট রাণী কশ্যপের কন্যা সুমতি বা শৈব্যা। রাজা এই রাণীদের সঙ্গে তপস্যা করে সন্তান লাভ করেন। বড় রাণী একটি লাউ প্রসব করেছিলেন, এরই বীজ থেকে ষাট হাজার পুত্রের জন্ম। এক সঙ্গে তারা ধ্বংস হয়ে গেল। বেঁচে রইল ছোট রাণীর ছেলে অসমঞ্জ ও নাতি অংশুমান। নারদের কাছে পুত্রদের ধ্বংস হবার সংবাদ পেয়ে সগর অংশুমানকে পাতালে পাঠালেন। অংশুমান কপিল মুনিকে প্রসন্ন করে যজ্ঞাশ্ব নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু পিতৃব্যদের উদ্ধার করতে পারল না। মুনি বলেছিলেন যে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনতে পারলে তারা উদ্ধার হবে।

রাজা সগর গঙ্গাকে আনতে পারেন নি, পারেন নি তাঁর পুত্র ও পৌত্র। প্রপৌত্র দিলীপও পারেন নি। দিলীপের পুত্র ভগীরথ এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। বিকলাঙ্গ ভগীরথ কী ভাবে তা করেছিলেন, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

সত্যিই ভগীরথ বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মেছিলেন। অষ্টাবক্র মুনি যখন তাঁর কাছে আসেন, তখন তিনি এমন ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে মুনি ভুল বুঝেছিলেন। রাজা তাঁকে বিদ্রূপ করেছেন ভেবে শাপ দিয়েছিলেন যে এই বিদ্রূপের জন্যে তিনি বিকলাঙ্গ হবেন, কিন্তু সত্যিই বিকলাঙ্গ হলে তিনি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবেন। শাপে বর হল ভগীরথের। বিকলাঙ্গ ভগীরথ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তারপরেই গোকর্ণ তীর্থে গেলেন তপস্যা করে গঙ্গাকে আনবার জন্যে।

স্বাতির দৃষ্টি বোধহয় আমার উপরে নিবদ্ধ ছিল। বলল : কী ভাবছ বল তো ?

গঙ্গার কথা।

নিশ্চয়ই পৌরাণিক কথা ?

বললুম : হ্যাঁ।

ভেবেছিলুম যে আমার উত্তর শুনে স্বাতি হাসবে। কিন্তু হাসল না। বলল : গঙ্গা চরিত্রটি আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়।

কেন ?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : গঙ্গাকে কখনও শিবের স্ত্রী মনে হয়, কখনও বিষ্ণুর স্ত্রী। কখনও আবার সরস্বতীর মতো কুমারী মনে হয়। কিন্তু কেন এমন মনে হয় তা জানি না।

তার ভাবনা শুনে আমি হাসলুম। বললুম : আমাদের এই আলোচনা শুনলে লোকে হাসবে।

লোকের কথা তো কখনও চিন্তা কর নি।

আজও করি না।

তারপরে বললুম : গঙ্গা হল হিমালয়ের কন্যা, সুমেরু দুহিতা মেনকা তার মা। দুটি মেয়ে - গঙ্গা আর উমা। পুরাণে আছে যে দেবতারা কোন কাজের জন্যে গঙ্গাকে চেয়ে নিয়ে যান। কী কাজ, তার উল্লেখ পুরাণে নেই। কিন্তু কৃত্তিবাস বলেছেন যে গঙ্গার বিয়ে দেবার কথা ছিল শিবের সঙ্গে, কিন্তু মায়ের শাপে গঙ্গা জল হয়ে যায়। কার্তিকের জন্মের ব্যাপারে গঙ্গাকে আমরা মায়ের ভূমিকায় দেখি। বেশ রহস্যময় এই ঘটনা, অশ্লীলও বটে। তার পরে গঙ্গাকে আমরা বৈকুণ্ঠে দেখি বিষ্ণুর সঙ্গে। লক্ষ্মী সরস্বতী ও গঙ্গা এই তিনজন বিষ্ণুর স্ত্রী। পরস্পর বিবাদ করে গঙ্গা ও সরস্বতী নদী হয়ে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়েছে।

গঙ্গা যে জল হয়ে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করছিলেন, সে গল্প পুরাণে আছে। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা গঙ্গাকে মুক্তি দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু গঙ্গার বেগ ধারণের ক্ষমতা

বসুন্ধরার নেই বলে শিবকে এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। তপস্যা করে ভগীরথ শিবকেও রাজী করিয়েছিলেন। তারপরে আবার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। গঙ্গা ভাবলেন যে শিবকে ভাসিয়ে নিয়ে পাতালে চলে যাবেন, আর শিব তা বুঝতে পেরে নিজের জটার মধ্যেই গঙ্গাকে আবদ্ধ করে রাখলেন। আবার তপস্যা। আশুতোষ শিব প্রসন্ন হয়ে গঙ্গাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু গঙ্গা সাত ধারায় প্রবাহিত হলেন, পূর্বে তিন ধারা, তিন ধারা পশ্চিমে, আর সপ্তম ধারা ভাগরথী নামে ভগীরথকে অনুসরণ করে বাঙলায় এলেন।

স্বাতি বলল: কেন জানি না, এই প্রসঙ্গে একটি দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শাঁখ বাজিয়ে ভগীরথ আগে আগে চলেছেন, আর গঙ্গা বয়ে চলেছেন পিছনে।

বোধহয় কোন ছবি দেখেছ রামায়ণে।

তাই হবে।

আমরা তখন গঙ্গার মাঝামাঝি এসে পৌঁছে গেছি। এ কূল ও কূল আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু জল, আর জলোচ্ছ্বাস। বাতাস, আর ইঞ্জিনের শব্দ। যাত্রীরা কেউ কথা বলছে, কেউ চুপ করে আছে। কিন্তু আমরা নীরবে থাকতে পারলুম না। গঙ্গার প্রসঙ্গ মনে হল শেষ হয় নি। তাই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেই স্বাতি বলল: গঙ্গার ভাগীরথী নাম কি শুধু হিমালয়ে?

বললুম: না। এখানেও গঙ্গার ভাগীরথী নাম। গঙ্গোত্রি হিমবাহের পশ্চিমে গোমুখ গুহা থেকে বেরিয়েছে ভাগীরথী, আর পূর্ব দিক থেকে অলকনন্দা। দেবপ্রয়াগে এই দুই ধারা মিলিত হবার পর নাম হয়েছে গঙ্গা। বাঙলায় তার ভাগীরথী নাম, ইংরেজ এর নাম দিয়েছে হুগলি। এ নাম সমস্ত ভাগীরথীর নয়, নবদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ধারাকে ইংরেজরা হুগলি বলত।

স্বাতি বলল : আমরা ভাগীরথী বলি না, হুগলিও না, আমরা গঙ্গাই বলি। গঙ্গার মতো মিষ্টি নাম বুঝি হয় না।

মিষ্টি নাম হয়তো আছে, কিন্তু প্রাণে এমন সাড়া জাগায় না। দুর্গা বললে যেমন সমস্ত দুর্গতি দূর হয়ে গেল মনে হয়, তেমনি গঙ্গা নাম করলে পবিত্র মনে হয় দেহ মন। এটা নামেরই মাহাত্ম্য।

স্বাতি বলল : সমুদ্রে পৌঁছে আবার আমরা গঙ্গা সাগর বলি। ভাগীরথী সাগর বা হুগলি সাগর বলি না তো।

আমি বললুম : গঙ্গা সাগর বলতেই হবে।

কেন ?

সমুদ্রের সাগর নাম হবারও একটা গল্প আছে। গর মানে গরল বা বিষ। বিষের সঙ্গে জন্ম হয়েছিল বলে রাজা বাহু তাঁর ছেলের নাম রেখেছিলেন সগর। বিমাতা বিষ পান করিয়েছিল সগরের মাকে। তবু সগরের মৃত্যু হয় নি মায়ের পেটে। এই সগর সমুদ্রকে নিজের পুত্র রূপে কল্পনা করেছিলেন বলেই সমুদ্রের নাম সাগর হয়েছে।

কেন ?

তাঁর ষাট হাজার ছেলের ভস্ম সমুদ্র ধারণ করেছিল দীর্ঘকাল। গঙ্গার পবিত্র স্পর্শে তাদের উদ্ধার হয়েছে। কপিল মুনির আশ্রমে তাই গঙ্গাসাগরের মিলন।

স্বাতি বলল : গঙ্গাসাগর নামটিও বড় মিষ্টি।

কিন্তু তখন আমার পণ্ডিতদের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। পুরাকালে গঙ্গাসাগর কোথায় ছিল সেই কথা। মহাভারতে আমরা দেখি যে যুধিষ্ঠির তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে কৌশিকী তীর্থে এসে উপস্থিত হন, তারপর ঘুরে ফিরে সব দেখতে থাকেন। এর পরেই পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগরসঙ্গম, আর সমুদ্রের তীরে কলিঙ্গ দেশ। এখন প্রশ্ন হল, কৌশিকী তীর্থ কোথায়! গঙ্গা ও কোশি নদীর সঙ্গম হল কৌশিকী তীর্থ। সে জায়গা

বাঙলায় নয়, বিহারে। কাজেই মহাভারতের এই কথা মেনে নিতে হলে বাঙলার অস্তিত্বই থাকে না।

ঐতিহাসিক যুগে কবি কালিদাসের রঘুবংশে আমরা যে বর্ণনা পাই তা পড়ে মনে হয় যে বাঙলার পশ্চিমাংশে প্রবাহিত হত গঙ্গা, এবং তার মধ্যে বড় বড় দ্বীপ ছিল। এই জন্যেই বোধহয় পেরিপ্লাস বাঙলার নাম দিয়েছিলেন গঙ্গা-হৃদয়।

চীনের পরিব্রাজক হিউএন চাঙ এ দেশে এসেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে। তিনি সমতটের দক্ষিণে সমুদ্র দেখেছিলেন। পণ্ডিতরা বলেন যে এই সমতট হল ঢাকা জেলার উত্তরাংশের নাম। তার মানে বাঙলাদেশের দক্ষিণাংশ ছিল সমুদ্রগর্ভে।

আরও একজন কবির কথা আমরা জানি। তিনি কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীর কবি কহ্লন। তাঁর বর্ণনায় আছে যে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে আসেন, তখন গৌড়ের পরেই ছিল সমুদ্র।

কাজেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এই সব বর্ণনার মধ্যে একটা মিল আছে। মহাভারতের যুধিষ্ঠির কৌশিকী তীর্থের কতটা দূরে সমুদ্র দেখেছেন জানা নেই, কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর ললিতাদিত্য গৌড়ের পরেই সমুদ্র দেখেছেন। এ কালের ভূতত্ত্ববিদেরাও এ কথা মেনে নিয়েছেন। বলেছেন যে বর্তমানের বাঙলা কোন প্রাচীন দেশ নয়। আনুমানিক এক হাজার বছর পূর্বে বাঙলার দক্ষিণাংশ সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে উঠেছে। তাঁরা মনে করেন যে তার আগে সমুদ্রের স্রোত রাজমহল পর্যন্ত প্রবাহিত হত, আর গঙ্গাসাগর ছিল গৌড়ের কাছাকাছি।

কিন্তু কলকাতার পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে চন্দ্রকেতু গড়ে পৌঁছলে এ সব কথা মেনে নেওয়া আর সম্ভব হবে না। পণ্ডিতরাই আজকাল মেনে নিয়েছেন যে পেরিপ্লাসের গাঙ্গে আর টলেমির গঙ্গারিদাই হল এই চন্দ্রকেতুগড়। মাটি খুঁড়ে যে সব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে প্রমাণ হয় যে এর বয়স আড়াই হাজার বছরের কম

হবে না। হরাপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক বলেও হয়তো মেনে নিতে হবে একদিন।

সমুদ্র ধীরে ধীরে সরে গেছে, না গঙ্গার পলিমাটিতে জেগে উঠেছে নতুন নতুন দ্বীপ, তার আলোচনা পণ্ডিতরাই করবেন। কিন্তু এক সময় যে বাঙলায় অনেক দ্বীপ জেগে উঠেছিল, তা আমরা নাম দেখেই জানতে পারি। নবদ্বীপ আজও নবদ্বীপ আছে। কিন্তু চক্রদ্বীপ খড়্গদ্বীপ আর্যদ্বীপ ডুমুরদ্বীপ শৃগালদ্বীপ হয়েছে চাকদহ খড়দহ আড়িয়াদহ ড়মুরদহ ও শিয়ালদহ।

স্টীমার ভাঙা গলায় ভোঁ-ভোঁ করে দু বার শব্দ করল। সচকিত হয়ে আমি দেখলুম যে ওপারের বাতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। স্বাতিও দেখতে পেয়েছিল। বলল: এমন করে আর বোধহয় কাউকে গঙ্গা পার হতে হবে না।

কেন?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল: গঙ্গার ওপরে পুল তৈরি তো প্রায় শেষ হয়ে এল। এর-পরে সেই পুলের ওপর দিয়ে ট্রেন চলবে, মোটর বাসও চলবে।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করল: এই স্টীমারগুলোর কী হবে?

ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন। কিন্তু আমার অন্য কথা মনে পড়ে গেল। বললুম: দেখতে দেখতে দ্বিতীয় যুগের শেষ হয়ে যাবে।

মানে?

বললুম: ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বসুর লেখা পড়েছিলুম। ছোট ছোট স্টীমার এসেছে দেশে। নতুন আবিষ্কার, নতুন আমদানি, নতুন অভিজ্ঞতা এ দেশের মানুষের। রাজনারায়ণরা একটা স্টীমারে চড়ে গৌড় দেখতে যাচ্ছেন গঙ্গা বেয়ে। নদীর দু ধারে গ্রামের লোকেরা ভিড় করে এসেছে স্টীমার দেখতে। ছেলেরা হাততালি দিয়ে চেঁচাচ্ছে, ধোঁয়া কলের লা এয়েছে রে, ধোঁয়া কলের লা এয়েছে।

লা কি ?

জানি নে।

স্বাতি আমার উত্তর শুনে হাসল।

বললুম : মানে জানি না বলেই শব্দটা মনে আছে। আর এও মনে আছে যে কোন দিন নদীর ধারে নোঙর দেখলেই গ্রামের লোকেরা পালিয়ে যেত।

কেন ?

ভয়ে। বোধহয় ভাবত, অন্য কোন জগৎ থেকে নতুন জাতের জীব এসেছে। যতক্ষণ নদী বেয়ে যাচ্ছে ততক্ষণই সাহস। তীরে নামলেই ভয়। এ বেচারাদের শাকসবজির দরকার, দরকার দুধ ডিম। কিন্তু তাদের কাছে বিক্রি করবে কে! গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে গ্রামের সব লোক।

কত দিনের পুরনো ঘটনা ?

বোধহয় একশো বছরের। রাজনারায়ণের দলে ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তাঁর লেখা বর্ণপরিচয় আমরা পড়েছি।

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল : বিশ্বাস করতে সত্যিই কষ্ট হয়।

বললুম : আজ এক শো বছর পরে দেখ। সেই স্টীমার বাতিল হয়ে গেল, সভ্যতার দৌড়ে টিকতে পারল না। রেলগাড়িতেও বেশি দিন লোকে চড়বে না। এ যুগের মানুষ দু দিনের পথ পাঁচ ঘণ্টায় যাচ্ছে, আর এই বেগ সঞ্চারিত হচ্ছে সমাজে। ক্রমে এই বেগের বাসনা আরও বাড়বে, আর সব কিছু পুরাতনকে পিছনে ফেলেই আমরা এগিয়ে যাব।

আমাদের স্টীমারের গতি কিছু মন্থর হয়েছিল। আরও মন্থর হবে। তারপরে পারে এসে থামবে।

স্টীমারের রিফ্রেশমেণ্ট রূমে এক ফাঁকে আমরা খেয়ে নিয়েছিলুম। স্টীমার পারে পৌঁছলে আমরা নেমে ট্রেনে উঠব। খালি ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে যাত্রীদের অপেক্ষায়। কিন্তু সাধারণ

যাত্রীদের মতো আমাদের ছুটতে হবে না। আমাদের রিজার্ভেসন আছে। ধীরে সুস্থে গিয়ে আমরা নিজেদের জায়গায় উঠতে পারব।

তারপরেই একটা দুর্ভাবনা এল মনে। হয়তো একটা কুপে দিয়েছে আমাদের। রাতের গাড়ি। সে গাড়িতে আর কোন যাত্রী তো থাকবে না!

জানি না আমি ঘেমে উঠছিলুম কিনা। বেশ গরম বোধ হয়েছিল। গায়ের চাদরখানা সরিয়ে ফেলতেই স্বাতি বলল: কী হল?

বললুম: তোমার চাদরখানা নাও।

গঙ্গার হাওয়ায় আমার শীত লাগবে বলে এই চাদরখানা সে আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল। ভাল লেগেছিল এই স্নেহের স্পর্শ। আমি তার মনের উত্তাপও যেন খানিকটা পেয়েছিলুম। স্বাতি এইবারে সেই চাদরখানা টেনে নিয়ে সুটকেশে তুলে রাখল। কিন্তু উত্তাপ যেন আমার গায়ে লেগেই রইল। আমি আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম।

ভোঁ-ভোঁ করে আবার বাঁশি বাজল স্টীমারের। যাত্রীরা সজাগ হয়ে উঠল। ব্যস্ত হয়ে উঠল অনেকে। কিন্তু স্বাতি নিশ্চিন্ত মনে আবার আমার পাশে এসে বসল।

২

তারপর সেই মুহূর্তটি এল।

স্টীমার ভাল করে থামবার আগেই অসংখ্য কুলি হুড়মুড় দুড়দাড় করে লাফিয়ে উঠল। যাত্রীদের মালপত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগল তারা। এক যাত্রীকে পৌঁছে দিয়ে বোধহয় আর এক যাত্রী ধরবার চেষ্টা। প্রবল দরাদরি হয় বলেও শুনেছি। যাত্রীদের সঙ্গে নাকি পয়সা নিয়ে যুদ্ধ করে। কিন্তু স্বাতি এদের সামলালো, বলল: আমাদের তাড়া নেই। আমরা ধীরে ধীরে যাব।

কাজেই আমাদের কুলি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। ভিড় খানিকটা কমবার পরে আমরা উপর থেকে নিচে নামলুম। তারপরে স্টীমার থেকে বেরিয়ে খানিকটা দূরেই ট্রেন দেখতে পেলুম। খালি ট্রেন তখন ভরে যাচ্ছে। আমরা আমাদের রিজার্ভেসন দেখলুম একটা কুপেয়।

আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। কিন্তু তার কোন ভাবান্তর দেখতে পেলুম না। অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে সে কুপের দরজা খুলে কুলিদের উপরে তুলে দিল। তারপরে আমার দিকে চেয়ে বলল: তোমার তো খুব অসুবিধা হবে!

হ্যাঁ, অসুবিধা একটু হবে বৈকি। হয়তো কুলিদের সাহায্য নিতে হবে। কিংবা স্বাতি একটু সাহায্য করলেই গাড়িতে উঠে পড়তে পারব। বললুম: প্ল্যাটফর্ম থাকলে অসুবিধা হত না।

বলে ডান হাতটা বাড়িয়ে দরজার হাতল ধরতে যাচ্ছিলুম। বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: তাড়াহুড়ো কোরো না।

বলে নিজে আমাকে অনেক যত্নে ঠেলে উপরে তুলে দিল। বাঁ হাতটা আমাকে ব্যবহার করতেই হল না।

নিচে থেকে স্বাতি বলল : তুমি চুপটি করে বসে থাক। আমি উপরে উঠে শুইয়ে দেব।

কুলি জিনিসপত্র কোথায় রেখেছে, সে তা নিচে থেকেই দেখে নিল। তারপরে পয়সা মিটিয়ে তাদের বিদায় দিল। বলল : একটু অপেক্ষা কর। এ-গাড়ি কলকাতায় কখন পৌঁছবে জেনে আসি।

বলে সে সরে গেল।

স্বাতি আজ একা। আজ তার সঙ্গে মামা মামী নেই। মামা মামীর সঙ্গে এবারে সে বেড়াতে বেরোয় নি। আমিও তাঁদের সঙ্গী হই নি এবারে। এবারের যাত্রা আমার সম্পূর্ণ অন্য রকম। এবারের যাত্রায় স্বাতি আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা নাটকীয় ঘটনায় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে দার্জিলিঙের হাসপাতালে।

শ্রীনগরের সেই প্রত্যূষের কথাও মনে পড়ছে। দিল্লীতে একটা চাকরির ইণ্টারভিউ দেবার জন্যে পাঠানকোটের বাসে তুলে দিয়েছিল স্বাতি। সবাইকে সেখানে ফেলে আমি দিল্লী চলে এসেছিলুম। তারপরে চাকরি নিয়ে আসামের গৌহাটিতে। চাকরিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম।

তারপরে সেই দুর্ঘটনা ঘটল।

কালিম্পঙ শহরে আমাদের ফার্মের একটা নতুন শাখা উদ্বোধনের পর আমরা একখানা ল্যাণ্ড রোভারে দার্জিলিঙ আসছিলুম— পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের বড় সাহেব মিস্টার ইন্নিস, আমি ও আমার সহকর্মী মিস্টার জয়সুখ লাল। পশ্চিমবঙ্গের শাখাগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছিল মিস্টার লালের উপরে। আমাকেও তিনি এক রকম জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

দুর্ঘটনা ঘটেছিল ঘুমের কাছাকাছি এসে। ঘন কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ের গায়ের শাদা চিহ্ন দেখে

আমরা চলেছিলুম। পাহাড়ের একটা বাঁকে সাড়াশব্দ না দিয়ে উল্টো দিক থেকে আর একখানা গাড়ি এসে প্রায় ঘাড়ে পড়েছিল। সেই গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা বাঁচাতে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে হল। তারপরে কী হয়েছিল জানি না।

সকাল বেলায় দার্জিলিঙের হাসপাতালে আমি চোখ খুলে-ছিলুম। মাথায় চোট পেয়েই আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। আর ব্যথা করছিল বুকের উপর দিকটায়। ছবি তুলে জানা গিয়েছিল যে আমার গলার হাড়ে চিড় খেয়েছে। মিস্টার ইনিসের ভেঙেছে বাঁ হাতের কব্জি, আর মিস্টার লাল খোঁড়া হয়েছেন—তাঁর ডান পায়ের অ্যাঙ্কেল সরে গিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে ড্রাইভারের কোন আঘাত লাগে নি। সে-ই গাড়ি চালিয়ে আমাদের এই হাসপাতালে এনেছিল।

কিন্তু দিল্লী থেকে দার্জিলিঙে স্বাতি এল কেমন করে, এ আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল। সন্ধ্যা বেলায় ডাক্তার আমার কাছে এসে উজ্জ্বল মুখে বলেছিলেন, কাল বোধহয় তিনি এসে পৌঁছবেন।

আমি মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কে ?

স্বাতি দেবী।

স্বাতি !

আমি চমকে উঠেছিলুম, বিস্ময়ের আমার সীমা ছিল না। তাই দেখে ডাক্তার বলেছিলেন, দিল্লী থেকে টেলিফোন করেছিলেন, কেমন আছেন জানতে চাইলেন, তারপর বললেন যে প্রথম প্লেনেই রওনা হচ্ছেন।

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন আমার মনে জট পাকিয়ে উঠছিল। স্বাতি আমার কথা জানল কী করে, কে খবর দিল তাকে, সে কি একা আসছে ! এ সব প্রশ্নের জবাব আমি ডাক্তারের কাছেই পেয়েছিলুম। আমার অবস্থা আশঙ্কাজনক

দেখে মিস্টার ইনিসের পরামর্শে তাঁরাই দিল্লীতে 'তার' পাঠিয়েছিলেন। আমার পকেটেই তুখানা চিঠি ছিল, একখানা স্বাতির কাছ থেকে পাওয়া, আর একখানা তাকে লেখা, ডাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলুম।

স্বাতির কথা শুনে আমি অভিভূতের মতো ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। তাই দেখে ডাক্তার বলেছিলেন, এ ভালই হল। আমাদের আর ভাবনা রইল না।

তারপরেই মিস্টার ইনিস এসেছিলেন আমাকে দেখতে। কুশল জিজ্ঞাসার পর বলেছিলেন, শি ইজ কামিং টুমরো।

আমি বলেছিলুম, তাই তো শুনলুম।

শি ইজ ইওর—

লজ্জিত ভাবে আমি বললুম, মাই—

কথাটা আমি শেষ করতে পারলুম না, ভেবে পেলুম না কী বলব। তার আগেই সাহেব বললেন, বুঝেছি।

মুখে তাঁর সরল প্রসন্ন হাসি। ডাক্তারও হাসছিলেন।

আরও লজ্জা পেয়েছিলুম আমি।

তারপরে স্বাতি এসেছিল দিল্লী থেকে উড়ে। হাসপাতাল ছেড়ে আমরা হোটেলে এসে উঠেছিলুম। এখন কলকাতায় ফিরছি। কয়েক দিন কলকাতায় থেকে কাজে যোগ দিতে যাব। স্বাতি কি তখন দিল্লী ফিরে যাবে ?

জানি না কী করবে। আজ কী করবে, তাই কি আমি জানি!

বাহিরের অন্ধকারে যাত্রীদের ছুটোছুটি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি স্থির হয়ে বসে আছি গাড়ির ভিতরে। ছোট একটি কুপে কম্পার্টমেণ্ট। নিচের বার্থে আমি বসে আছি, আর উপরে একখানি বাঙ্ক। তুজনের জন্যে এই কুপে। তৃতীয় ব্যক্তি এখানে ঢুকতে পারবে না। সারা রাত আমরা একা এই গাড়িতে থাকব। আর কেউ থাকবে না।

কিন্তু এত ছোট গাড়িতে সারা রাত আমরা কাটাব কী

করে! এই বদ্ধ পরিবেশে দম যে আটকে যাচ্ছে! কোন দিক থেকে বাতাস আসছে না কেন! গাড়ির পাখাও কি চলছে না!

আমি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। মাথার উপরে ছুখানা পাখা ঘুরছে। কিন্তু বন বন করে ঘুরছে না, ঘুরছে আস্তে আস্তে। পাখার কোন জোর নেই। এ পাখার বাতাস যেন শীতল নয়। মনে হল, কপালে আমার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, কান ছুটো গরম হয়ে উঠেছে, আর একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

স্বাতি ঠিক এই সময়েই ফিরে এল। প্রসন্ন হাসি তার মুখে। বাহির থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল: নিশ্চিন্তে যাওয়া যাবে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে আর কোন ভয় নেই। কলকাতায় আমরা সকালে পৌঁছব।

আমি আশ্চর্য হলুম স্বাতির কথা শুনে। এ কী বলছে সে! ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে যে দম আটকে যাবে! এতটুকু গাড়ির ভিতর—

দরজার হাতল ধরে স্বাতি উঠে পড়েছিল। গাড়ির মিটমিটে আলোয় তার স্বচ্ছন্দ ভাব দেখে আমার বিস্ময়ের যেন সীমা রইল না। আর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চেয়ে সেও চমকে উঠল, বলল: তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে?

কই, না। কষ্ট কিসের!

তবে এমন ঘেমে উঠেছ কেন!

বলে নিজের ডান হাতে আমার কপালটা মুছে দিল। বলল: ইস্!

তারপরেই ওধারের জানালার দিকে চেয়ে বলল: ওমা, জানালাটা যে বন্ধ আছে!

বলেই ওপাশে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল। এধারের জানালাও দিল খুলে। তারপরে আমার পাশে বসে বলল: গাড়ি ছাড়লে তোমার বিছানাটা বিছিয়ে দেব।

কিন্তু বাহির থেকে কোন শীতল বাতাস এল বলে আমার মনে হল না। সেই বদ্ধ আবহাওয়া যেন আরও কঠিন হয়ে আমার বুকের উপরে চাপ দিতে লাগল।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল: কী কষ্ট হচ্ছে বল তো?

আমার কষ্টের কথা আমি আর লুকোতে পারলুম না, বললুম: এই কামরাটা খুবই ছোট না! একটা বড় কামরায় গেলে বোধহয় ভাল হত।

ভয়?

বলে স্বাতি খিল খিল করে হেসে উঠল।

লজ্জা পেয়ে আমি বললুম: তোমাকে আমি ভয় পাব কেন!

তবে কি তোমাকে আমি ভয় পাব?

সহসা এ কথার উত্তর আমি দিতে পারলুম না। কিন্তু স্বাতি বলল: মানুষ মানুষকে ভয় পাবে কেন! ভয় তো পশুকে। মানুষ শয়তানকেও ভয় পায়, ভয় পায় না দেবতাকে। আমরা তো সে সব কিছু নয়, আমরা মানুষ। আমরা ভয় পাব কেন!

আমি আশ্চর্য হয়ে স্বাতির মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল: মনুষ্যত্বে কি তোমার বিশ্বাস নেই, না বিশ্বাস হারিয়েছ আজকাল?

বলে আমার চুলের মধ্যে একটা হাত চালিয়ে দিল।

আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। উত্তর দেবার মতো কিছু ভেবে পাচ্ছিলুম না। তার এই স্নেহের স্পর্শে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল। বাহির থেকে কি হঠাৎ বাতাস আসতে শুরু করেছে!

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে স্বাতি বলল: তুমি ভারী ছেলেমানুষ।

এ কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারলুম না।

৩

ভোর বেলায় চোখ মেলে দেখলুম যে খোলা জানালার ধারে স্বাতি বাহিরের দিকে চেয়ে বসে আছে। বোধহয় অসতর্কতার জন্যে তার গায়ে আমার পা ঠেকে গিয়েছিল। তাই আমার দিকে ফিরে তাকাল। আর আমার চোখ মেলা দেখে হাসল, এ হাসি উপহাসের নয়, এ তৃপ্তির হাসি। সারা রাত ঘুমিয়েছি বলেই বোধহয় সে এমনি হাসি দিয়ে তার তৃপ্তির কথা আমাকে জানিয়ে দিল।

আমার আর এক মুহূর্ত শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করল না। আমি উঠে বসলুম। জিজ্ঞাসা করলুমঃ কখন আমরা কলকাতায় পৌঁছব?

স্বাতি বললঃ সাড়ে সাতটায় পৌঁছবার কথা, কিন্তু মনে হচ্ছে পথে দেরি হয়ে গেছে।

কী করে বুঝলে?

কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে এলাম, কিন্তু একটা স্টেশনেরও নাম আগে শুনি নি। কলকাতার কাছাকাছি হলে নামগুলো শোনা মনে হত।

ট্রেনের গতি কিছু মন্থর হয়েছিল। তাই দেখে আমি বললুমঃ এবারে গাড়ি থামলে কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া যাবে।

স্বাতি বললঃ সঙ্গে টাইম টেব্‌ল থাকলে নিজেরাই হিসেব করে নিতে পারতাম।

টাইম টেব্‌ল না থাকলেও রেলে যাতায়াত করা যায়। কুলিরা আরও বেশি নির্ভরযোগ্য।

স্বাতি কোন উত্তর দেবার আগেই ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল।

নবদ্বীপ ধাম। এ জায়গাটি অন্ধকারেই পেরিয়ে আসবার কথা। কাজেই গাড়ি যে লেট চলছে তাতে সন্দেহ নেই।

রেলের লোক বলে মনে হল এমন একজনকে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ট্রেন কত লেট যাচ্ছে ?

লোকটি কোন দিকে না তাকিয়েই বলে গেল : এক ঘণ্টা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটা। এ ট্রেন কলকাতায় সাড়ে আটটার আগে পৌঁছবে না।

স্বাতিও বোধহয় এই কথা ভেবেছিল, বলল : চা খাবে ?

বললুম : ব্যাণ্ডেলে খাব।

স্বাতি ভ্রূ কুঁচকে বলল : ব্যাণ্ডেলের চা একেবারে বিস্বাদ। ওরা দুধ চিনির খরচটাও বাঁচায়।

হেসে বললুম : তোমার দুর্ভাগ্য যে ঐ রকম চা তোমার কপালে জুটেছিল। লোকাল ট্রেনের যাত্রীকে ওরকম চা দিলে তারা রক্ষা পাবে না।

স্বাতি বলল : আমরা দিল্লী থেকে আসছিলাম। ভোর বেলায় জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ঐ চা নিয়ে খেতে পারি নি।

নিশ্চয়ই আগের দিনের বাসি চায়ে গরম জল ঢেলে চালিয়েছে।

স্বাতি হেসে বলল : চায়ে গরম জল ঢালে না, চা গরম করে। তার পরেই জিজ্ঞাসা করল : তুমি নবদ্বীপ দেখেছ ?

বললুম : না।

দেখ নি !

হেসে বললুম : নবদ্বীপ কেন, বাঙলার অনেক জায়গাই দেখি নি।

স্বাতি আশ্চর্য হল আমার কথা শুনে। তাই দেখে বললুম : কলকাতার মানুষ কলকাতাই দেখে না ভাল করে। বাইরে যাবার অবসর তার কোথায় !

স্বাতি প্রতিবাদ করে বলল : অবসরের কথা বোলো না।

কেন ?

কিছু দিন আগেও বাঙালীরা সাঁওতাল পরগণার দেওঘর মধুপুর গিরিডি প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে পূজোর ছুটি কাটাত। এখন যাচ্ছে দার্জিলিঙ মসুরি নৈনিতাল। দু মাসের বদলে দু সপ্তাহের জন্যে যাচ্ছে। অবসর কমেছে, কিন্তু ফুরিয়ে যায় নি।

কথাটা আমাকে মেনে নিতে হল। বললুম: তাহলে আগ্রহের অভাব বলতে হবে।

স্বাতি বলল: এ কথাও মানব না।

কেন?

প্রচুর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও লোকে দেখতে পাচ্ছে না, এমন নজির আমার কাছে আছে।

তার পরেই বলল: আমার এক বন্ধুর কথা তোমাকে বলছি। তারা পাটনায় থাকে। ওয়ালটেয়ারে বেড়াতে গিয়েছিল। ফেরার পথে ভেবেছিল ডায়মণ্ড হারবার কাকদ্বীপ দেখবে। বাঙলার টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা করতে পারে নি। পরিচিত একজনের কাছে টাকা পাঠিয়ে টিকিট কিনেছিল। ওয়ালটেয়ার থেকে ফিরে রাত কাটিয়েছিল হাওড়া স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে, ভোর বেলায় উঠে কোন রকমে ব্রেকফাস্ট করে টুরিস্ট অফিসের দরজায় এসে দেখল যে দরজা বন্ধ। এক রবিবারের কথা, দোকান-পাঠও সব বন্ধ। তারা রাস্তায় পায়চারি করতে লাগল।

আমি বললুম: প্রতি রবিবারে তো কলকাতা দেখাবার ব্যবস্থা আছে। কাজেই দরজা বন্ধ থাকার কোন কারণ নেই।

স্বাতি বলল: ঠিক সেই জন্যেই দরজা খোলা হয়েছিল। কলকাতা শহর দেখাবার জন্যে একখানা ডি-লাক্স বাসও এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যে লোকটা দরজা খুলেছিল, সে ডায়মণ্ড হারবার কাকদ্বীপের কোন খবর রাখে না। এমন কোন লোকও এল না যে সে খবর দিতে পারে।

তারপর?

তারপর আর কী! কলকাতা দেখার জন্যে বিদেশী ও অবাঙালীতে ঘর ভরে গেল। কিন্তু কাকদ্বীপের একজন যাত্রীও এল না। কলকাতার বাস ছাড়বার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার পরে হন্তদন্ত হয়ে এল একজন গাইড। আমার বন্ধু তাকেই চেপে ধরল, বলল যে কাকদ্বীপের ব্যবস্থা করে না দিলে তাকে ছেড়ে দেবে না। সে ভদ্রলোক টেলিফোনে একটা নম্বর ডায়াল করে বলল, এই নিন, কথা বলুন। বলে যাত্রীদের নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। টেলিফোনে কী উত্তর পেল জানো ?

বল।

গ্যারেজ থেকে এক ভদ্রলোক জানাল যে ট্রিপ ক্যানসেল হয়ে গেছে।

কেন ?

যাত্রী বেশি হয় নি। কাজেই যাঁদের টেলিফোন নম্বর ছিল, তাঁদের খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা টাকা ফেরৎ নিয়ে গেছেন। ওদের টাকাও ফেরৎ দেওয়া হবে।

স্বাতি খানিকক্ষণ থেমে বলল: এ রকম অব্যবস্থার কথা তুমি ভাবতে পার! আমরা তো সারা ভারতবর্ষ ঘুরে এলাম, এমনটি কি কোথাও দেখেছি! হয়তো টিকিট পাই নি কোন জায়গায়; কিন্তু টিকিট পাবার পরে যেতে পারি নি, এমন কি কোথাও হয়েছে!

বললুম: মনে পড়ছে না।

স্বাতি বলল: এমন ঘটলে নিশ্চয়ই মনে পড়ত।

আমাদের ট্রেন নবদ্বীপে বোধহয় পাঁচ ছয় মিনিট দাঁড়িয়েছিল। এইবারে আবার চলতে শুরু করল।

বাহিরের অন্ধকার তখন স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। স্বাতি সেই দিকে একবার তাকাল। তারপরে মুখ ফিরিয়ে বলল: তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে কি না জানি না। সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে দেখবার পরে আমার মনে হচ্ছে যে

আমরা বাঙালীরা শুধু কথায় এগোচ্ছি, কাজে একটুও এগোতে পারি নি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছি।

আরও স্পষ্ট ভাবে তার মতামত জানবার জন্যে আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না। স্বাতি বলল : এই টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টের কথাই ধর। কিছু দিন আগে বাঙলার সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা আমি করেছিলাম। সাইক্লোস্টাইল করা দু-চারখানি কাগজ পেয়েছিলাম, কিন্তু কোন বই পাই নি। সম্প্রতি দিল্লীতে একখানি বই পেলাম— তার নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাণ্ড উড়িষ্যা, ভারত সরকার প্রকাশ করেছে বিদেশীদের জন্যে। বাঙলার কোথায় কী দেখবার আছে, বাঙালীদের সে কথা জানবার উপায় নেই। পশ্চিম বাঙলার ওপর একখানি ভাল গাইড বই পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজও প্রকাশ করে নি।

আমি বললুম : ভারতবর্ষের সব রাজ্য তো এ কাজ করে নি!

মানি সে কথা। কিন্তু করেছেও অনেকে। গুজরাত মহারাষ্ট্র করেছে। প্রতিবেশী রাজ্য বিহার উড়িষ্যা আসামও করেছে। আর তা করেছে বলেই সে সব রাজ্যের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখবার জন্য আমাদের আগ্রহ জেগেছে। বাঙলায় কী দেখবার আছে, সেই কথাই কি আমরা ভাল করে জানি!

সহসা আমি কোন প্রতিবাদ করতে পারলুম না। বাঙলার অনেক দর্শনীয় স্থানের নাম আমি জানি, কিন্তু সে সবের সঠিক অবস্থান আমার জানা নেই। কোন্ রেলওয়ে স্টেশনে নেমে কত দূর কী ভাবে যেতে হবে, থাকবার জায়গা কী আছে, এই সব প্রয়োজনীয় সংবাদ একত্র গ্রথিত হয়ে কোন গাইড বই আজও বেরোয় নি।

স্বাতির অভিযোগ আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, বলল : দার্জিলিঙে সরকারী উদ্যম দেখেছ! অমন সুন্দর জায়গা, আশে পাশে কত কি দেখবার আছে। এক দিকে সন্দকফু ফালুট, অন্য দিকে

কালিম্পঙ গ্যাংটক। কাছাকাছির মধ্যে টাইগার হিল ঘুম সিঞ্চল লেক লেবং রেস্‌কোর্স চা-বাগান। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় তুমি এ সব দেখতে পাবে না। দল বেঁধে গেলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হবে, কিন্তু একা গেলে নিরুপায়। গৌড় পাণ্ডুয়াও তো আমাদের নিজেদের ব্যবস্থায় দেখতে হল!

বললুম: কলকাতার আশে পাশে কিছু দেখবার জন্যে টুরিস্ট বাস আছে।

স্বাতি যে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, তা বুঝলুম তার উত্তর শুনে। বলল: ছাই আছে।

আমি হাসলুম তার উষ্মা দেখে।

স্বাতি বলল: ঠিকই বলছি। সে সব জায়গায় যেতে হলে রোজ খবরের কাগজ দেখ, না হয় টুরিস্ট অফিসে ছুটোছুটি কর। তাদের মর্জি মতো প্রোগ্রাম। বাইরে থেকে কেউ এলে কি তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে! না কলকাতার লোকই ছুটি পেলে ঐ প্রোগ্রামের অপেক্ষায় বসে থাকবে!

তারপরেই বলল: অথচ অন্যত্র একটা নিয়ম আছে। জনপ্রিয় জায়গাগুলিতে রোজ যাওয়া যায়, আর অন্যখানে শনি রবিবারে। বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালেই বাস পাবে, আর যাত্রী না হলেও সে বাস ক্যানসেল হবে না।

আমি বললুম: তোমার মেজাজ আজ এমন রুক্ষ কেন?

তোমার জন্যেই।

মানে!

তোমার কথাই ভাবছিলাম।

আমি সকৌতুকে তার মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু স্বাতি তা দেখতে পেল না। বলল: হ্যাঁ, তোমার কথাই। তুমি কদিন কলকাতায় থাকবে তা তো জানি নে। এই সুযোগে বাঙলার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া যাবে।

আমি বললুম ঃ কলকাতার সম্বন্ধেও আমাদের ভাল ধারণা নেই। এই শহরটাও আমরা কোন দিন চিনবার চেষ্টা করি নি।

সে খুবই স্বাভাবিক।

কেন ?

কবির কথা তোমার মনে নেই ?

কোন্ কথা ?

স্বাতি হেসে বলল ঃ যেটা আমাদের বেলায় খুব ভাল খাটে !

বলে আস্তে আস্তে আবৃত্তি করল—

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

স্বাতি থামতেই আমি বললুম ঃ জীবনের এ একটি পরম সত্য। নিজের দেশকে আমরা চিনি না, কাছের মানুষকেও না। নিজেদের জন্মভূমি যেমন আমাদের কাছে অপরিচিত, তেমনি গাঁয়ের যোগীও ভিখ পায় না। বাঙলাকে জানবার চেষ্টা, বাঙালীকে চেনবার চেষ্টা আজ আমাদের নেই। আজ আমরা বাঙলা ও বাঙালীর বিচার করছি খবরের কাগজ পড়ে।

গভীর আগ্রহে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম ঃ সত্যিই তাই। খবরের কাগজে বেরিয়েছে, অমুকে বলেছে বাঙালী ছেলেরা বকে গেছে। আমরা বিনা যুক্তিতে মেনে নিচ্ছি সেই কথা। কিন্তু কেউ খোঁজ নিচ্ছি না, দোষটা বাঙালী ছেলের, না অন্য কেউ নিজেদের দোষ তাদের ঘাড়ের উপরে চাপিয়ে

দিচ্ছে! দেশ গড়ার বর্তমান দায়িত্ব তো ছেলেদের উপর নয়, যাদের উপরে সে দায়িত্ব, তারা কী করছে! ছেলেদের মধ্যে বিক্ষোভ কেন বাড়ছে এ কথার জবাব কে দেবে!

স্বাতি বলল: তবে কি তুমি এই বিক্ষোভ সমর্থন কর?

সমর্থনের কথা নয়। আমি সহানুভূতির অভাবের কথা ভাবছি। একালের ছেলেমেয়েদের কথা কি কর্তারা ভাববে না! বিনা বিচারে তাদের দোষী সাব্যস্ত করে কি চিরকাল তাদের সাজা দেবে! এই সহানুভূতির অভাব দেশের সংস্কৃতি নষ্ট করবে, সবুজ বিপ্লবকে রক্তাক্ত বিপ্লবে পরিণত করবে। এমন পরিবেশের সৃষ্টি আমরা করতে পারছি না যে ছেলেমেয়েরা দেশকে জেনে দেশের সংস্কৃতিও জানবে, তাকে ধারণ করবে, পোষণ করবে, আর সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে উন্নতির দিকে।

স্বাতি চুপ করে ছিল। কিন্তু আমি নীরবে থাকতে পারলুম না। বললুম: বিদেশীরা যখন এ দেশের রাজা ছিল, তখন তারা বাঙালীদের শ্রদ্ধা করত। বলত, বাঙালীরা আজ যা ভাবছে, ভারতবাসী কাল তা ভাববে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের ভারতবাসীরা বলছে উল্টো কথা। আর দুঃখ এই যে বাঙালীরাও সেই কথা মেনে নিচ্ছে। কথাটা কি সত্য, না মিথ্যা প্রচার করে বাঙালীকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা চলছে!

আস্তে আস্তে স্বাতি বলল: আমরা তার অনুসন্ধান করছি না কেন?

আমরা!

কেন, এ কাজ কি আমরা পারব না?

এ কথার উত্তর আমার জানা ছিল না। বললুম: তার আগে বাঙলাকে আবিষ্কার করতে হবে আমাদের, নতুন করে জানতে হবে বাঙালীকে। কিন্তু—

বল।

এ বড় কঠিন কাজ। বাঙলার অতীতটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এমন বিদ্যে আমার জানা নেই যে সেই অতীতের ওপর খানিকটা আলো ফেলতে পারি।

কিন্তু স্বাতির দৃষ্টিতে আমি হতাশা দেখতে পেলুম না। অনেক আশায় তার দু চোখ এখন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। বলল ঃ দেখ না চেষ্টা করে।

আমাদের ট্রেন তখন একটা স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছিল। এ স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াবে না। অনাদৃত স্টেশন। কিন্তু তার নামটা আমি পড়ে ফেললুম। সমুদ্রগড়। আশ্চর্য ! সমুদ্রগড়ের আজ এই অবস্থা !

৪

স্বাতি যে আমাকে লক্ষ্য করছিল, আমি তা বুঝতে পারি নি। সমুদ্রগড় স্টেশন পেরিয়ে যেতেই সে প্রশ্ন করল: হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে কেন বল তো ?

বললুম: একটা পুরনো কথা মনে পড়ে গেল।

স্বাতি কোন প্রশ্ন না করে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: পণ্ডিতদের একটা অনুমানের কথা। সত্য কিনা, আজ কেউ তা বলতে পারবে না।

এর পরেও স্বাতি কোন প্রশ্ন করল না। শুধু নীরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি তার আগ্রহের কথা জানি। তাই বললুম: কোথায় যেন পড়েছি, সমুদ্রগড় ছিল সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী, আর মহাকবি কালিদাস জন্মেছিলেন এই গ্রামেরই ধারে কাছে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল: তুমি কি বিক্রমাদিত্যের যুগের কথা বলছ ?

প্রাগৈতিহাসিক বিক্রমাদিত্য নয়, ঐতিহাসিক বিক্রমাদিত্যের কথা। খ্রীষ্টের জন্মের আগে যে বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেছেন তাঁর সময় নয়, ইনি চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। সমুদ্রগড়ের পুরনো লোক নাকি দাবী করত যে, গুপ্ত রাজারা ছিলেন বাঙালী। নবদ্বীপ তাঁদের রাজধানী ছিল, আর গড় ছিল সমুদ্রগড়ে। গুপ্ত আর ঘটোৎকচ এই দু পুরুষ বাঙলায় রাজত্ব করবার পর তৃতীয় পুরুষ বেরিয়েছিলেন রাজ্য জয়ে। সমুদ্রগুপ্তের পিতা চন্দ্রগুপ্ত মগধ জয় করে লিচ্ছবি রাজকন্যা বিয়ে করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের জন্ম এই রাজকন্যার গর্ভে।

এ কি ইতিহাসের কথা?

না, ইতিহাসে এ কথা পড়ি নি।

তবে?

কোথায় পড়েছি এখন মনে পড়ছে না। বোধহয় দুর্গাদাস লাহিড়ীর পৃথিবীর ইতিহাসে।

তারপর?

মগধ জয়ের পরে তাঁরা নবদ্বীপ থেকে রাজধানী নিয়ে গেলেন পাটলিপুত্রে। সেখান থেকে অযোধ্যা কিংবা কনৌজে। তারপরে উজ্জয়িনীতে।

স্বাতি বলল: এই মতের প্রতিবাদ কেউ করে নি?

বললুম: বাঙলায় না লিখলে অনেকেই প্রতিবাদ করতেন।

স্বাতি আর কোন কথা বলল না। তাই দেখে আমি বললুম: কালিদাস সম্বন্ধেও এঁরা এই রকমের কথাই বলেছেন। কালিদাসের জন্মও নাকি এই গ্রামেরই ধারে কাছে।

স্বাতি কোন কথা না বলে হাসল।

তার হাসির অর্থ বুঝতে পেরে আমি বললুম: কালিদাসের জন্মস্থান নিয়ে কম করেও গোটা পাঁচেক মত প্রচলিত আছে, আর সে সবের পক্ষে যুক্তিও আছে নানা রকম।

বল।

সবচেয়ে বেশি প্রচলিত মত হল, কালিদাসের জন্ম মালবের রাজধানী উজ্জয়িনীর কাছে। আর তিনি উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় ছিলেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সভায় আরও আটজন তো রত্ন ছিলেন। সকলের জন্মই কি উজ্জয়িনীর কাছে! তা যখন নয়, তখন কালিদাসের বেলাতেই বা আমরা তা মানব কেন!

তারপর?

তারপর ভোজরাজের কথা। ভোজরাজের সভায় এক

কালিদাস ছিলেন বলে লোকের ধারণা যে তাঁর রাজধানী ধারা নগরীর কাছেই কালিদাসের জন্ম। দক্ষিণ ভারতীয়রা বলে যে কালিদাস দক্ষিণ ভারতের লোক, সিংহলে তাঁর সমাধি স্থান আছে। আবার কালিদাসকে অনেকে মিথিলাবাসী বলেও মনে করেন।

স্বাতি বলল : তুমি কি কালিদাসকে বাঙালী ভাব ?

বললুম : অসম্ভব নয়।

কেন ?

যাঁরা কালিদাসকে বাঙালী বলে দাবী করেন, তাঁরা তাঁর লেখার মধ্যে থেকেই কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। যেমন, বাল্মীকির রামায়ণে বাঙলার উল্লেখ নেই। অথচ কালিদাসের রঘুবংশে আছে যে বঙ্গকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করে গঙ্গাপ্রবাহের অন্তর্বর্তী নগরে রঘু তাঁর জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। তাঁর মেঘদূতে যে নদনদী হ্রদ ও পাহাড়ের বর্ণনা, তা যেন বাঙলা দেশেরই। আর শুধু বাঙলার প্রকৃতি নয়, বাঙালীর সমাজও তাঁর কাব্যে রূপ পেয়েছে। তাঁর কাব্যে বাঙলার শালিধানেরও উল্লেখ আছে।

স্বাতি সবিস্ময়ে বলল : এ কি তোমার কথা ?

বললুম : না। সংস্কৃতে এত বিদ্যে আমার নেই।

কিন্তু স্বাতির এ কথা যেন বিশ্বাস হল না। তাই আমার দিকে চেয়ে রইল আরও কিছু শোনবার জন্যে।

বললুম : তবে কালিদাসের কবিতা আমার যেমন ভাল লাগে তেমন আর কারও কবিতা লাগে না। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন বাঙলা পড়ছি। ভাব ভাষা ছন্দ সবই যেন বাঙলার মতন। শুধু শব্দগুলো সংস্কৃত।

তারপরেই আর একটি কথা আমার মনে পড়ে গেল। বীরভূমের এক ভদ্রলোক দাবী করেছিলেন যে কালিদাসের জন্ম হয়েছিল বীরভূম জেলার বেলুধ গ্রামে। সেখানেই ছিল কালিদাসের

সাধনার স্থান। সেই পাহাড় আর সেই পুকুর আছে, শুধু মন্দিরটিই ভেঙে পড়েছে। আজও নাকি ছেলেরা কবি হবার লোভে সেই পুকুরে স্নান করে ভাঙা মন্দিরের পাথরে সিঁদুর লেপছে। এও আমার পড়া কথা, কিন্তু এ কথা আমি স্বাতিকে বললুম না। কালিদাস কোন্ জেলায় জন্মেছিলেন সে কথা বড় নয়। কালিদাস বাঙলায় জন্মেছিলেন কিনা সেটাই জানবার কথা। কেউ কি এ নিয়ে কোন দিন গবেষণা করবে না!

ট্রেন থেকে সমুদ্রগড়ে কোন গড়ের চিহ্ন দেখলুম না। সত্যিই কোন গড় সেখানে অরণ্যে আবৃত হয়ে আছে কিনা, তাও আমার জানা নেই। মাটির নিচে চাপা পড়ে গেছে কিনা, তাও নেই জানবার উপায়। কিন্তু নবদ্বীপ যে একদা বাঙলার রাজধানী ছিল, সে কথা ইতিহাসেই আছে।

স্বাতির বোধহয় ইতিহাসের কথা মনে ছিল না। বলল: নবদ্বীপ কি কখনও বাঙলার রাজধানী ছিল?

বললুম: এ হল ঐতিহাসিকদের অনুমান। বল্লালচরিতে পাওয়া যায় যে বল্লালসেনের তিনটি রাজধানী ছিল—বিক্রমপুর গৌড় ও স্বর্ণগ্রাম। বিক্রমপুর ও গৌড় আমরা জানি, গোলমাল হল স্বর্ণগ্রাম নিয়ে। কিন্তু বাঙলার কুলজী গ্রন্থে পাওয়া যায় যে বল্লালসেন বৃদ্ধ বয়সে তাঁর রাজধানী নবদ্বীপে বাস করতেন।

স্বাতি বলল: তবে কি তুমি স্বর্ণগ্রামকেই নবদ্বীপ বলছ?

অনুমান করছি বলতে পার। লক্ষ্মণসেনও বোধহয় বুড়ো বয়সে নবদ্বীপে বাস করতেন। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিক মীন্হাজুদ্দিন বলেছেন তাঁর রাজধানী ছিল নদীয়ায়।

নদীয়া তো জেলার নাম! নবদ্বীপকেই বোধহয় নদীয়া বলেছে।

তাই হবে। কিন্তু কবি ধোয়ি তাঁর পবনদূত কাব্যে আর এক গোলমালের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাব্যে যে রাজধানীর

বর্ণনা, তার নাম বিজয়পুর। এই শহর ছিল গঙ্গার তীরে ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকটে। কাজেই ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে নদীয়ার পুরনো নামই বিজয়পুর, বিজয়সেনের নামে এই নাম হয়েছিল।

স্বাতি একটু হেসে বলল: সকাল বেলায় ইতিহাসের কথা তেমন ভাল লাগছে না, ভূগোলের কথা বল।

ভূগোলের কথা ?

হ্যাঁ, ভূগোলের কথা। নবদ্বীপ কি কোনও সময়ে নটা দ্বীপের সমষ্টি ছিল ?

হেসে বললুম: নবদ্বীপকে নতুন দ্বীপ কেন ভাবছ না ? নব মানে তো নতুনও হয়।

স্বাতি বলল: তাই তো! আমি নবগ্রহের মতো নবদ্বীপ ভেবেছিলাম।

বললুম: সত্যি কথা যাই হোক, এর থেকে একটা কথা মেনে নিতে হয়।

কী ?

গঙ্গার প্রবাহে এক সময়ে এক বা একাধিক দ্বীপ ছিল। অনেকে তো মনে করেন যে গোটা নদীয়া জেলাটাই নটি দ্বীপের সমষ্টি। আদি নবদ্বীপ ছিল গঙ্গার পূর্বতীরে মায়াপুরে। কিংবা সেই পুরাতন নবদ্বীপ গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হবার পরে বর্তমান নবদ্বীপের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

একটু থেমে বললুম: এইবারে কিংবদন্তীর কথা বলি।

কিংবদন্তীও আছে!

আছে বৈকি। গঙ্গার একটি দ্বীপে এক সন্ন্যাসী বাস করতেন। প্রতিরাতে তিনি নটি দীপ জ্বেলে যোগ সাধনা করতেন। নৌকো বেয়ে যেতে যেতে যাত্রীরা এই নটি দীপ দেখতে পেত। তাই দেখে তারা এই চরটির নাম রেখেছিল নবদীপ।

মাথা নেড়ে স্বাতি বলল : বানানের ভুল হল। দ্বীপ আর দীপ এক নয়।

তাহলে তুমি আগের একটা মত মেনে নাও।

আমাদের ট্রেন কোথাও দাঁড়াচ্ছে, কোথাও দাঁড়াচ্ছে না। গতিও এমন কিছু দ্রুত নয়। এই যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন চলতে পারছে না। এই ভাবেই আমাদের আরও অনেক সময় কাটাতে হবে।

স্বাতি বলল : আজ আমার একটা ভুল ভাঙল।

কী রকম ?

বলে আমি তার দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : আমি শুনেছিলাম যে নবদ্বীপ যেতে হয় শান্তিপুর থেকে।

হেসে বললুম : এখন কি ভাবছ শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ যাওয়া যায় না ?

স্বাতি একটু ইতস্তত করে বলল : হিসেবের ভুল হয়ে গেল বুঝি !

বললুম : না। শান্তিপুর আর নবদ্বীপ হল গঙ্গার এপার আর ওপার।

তারপরে বুঝিয়ে বললুম যে আমরা গঙ্গার পশ্চিম তীর ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছি। ফরাক্কায় গঙ্গা পার হয়েছি বলে আমরা নবদ্বীপ পেলুম এই পারেই। গঙ্গার ওপার দিয়েও রেলপথ আছে—লালগোলাঘাট থেকে শিয়ালদহ। শান্তিপুর ঠিক এই পথে নয়। রাণাঘাট হয়ে কোন ট্রেন কৃষ্ণনগরে যায়, কোনও ট্রেন যায় শান্তিপুর। শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপঘাট শাখা লাইন আছে। সেখান থেকে খেয়ায় গঙ্গা পার হয়ে নবদ্বীপ। সড়ক পথেও নবদ্বীপঘাট পর্যন্ত যাতায়াত করা যায়।

স্বাতি বলল : তবে কিছু ভুল বলি নি।

ভুল বলেছ। তোমার ধারণাটা ভুল ছিল না।

স্বাতি কোন প্রতিবাদ না করে বলল: এ সব জায়গা আমাদের দেখতে হবে। নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর—

মুর্শিদাবাদও।

সে তো ঐতিহাসিক স্থান।

বললুম: কৃষ্ণনগরও আধা ঐতিহাসিক। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়ের জন্যে কৃষ্ণনগরও ঐতিহাসিক।

আর নবদ্বীপ?

নবদ্বীপের কথা মানুষ কোন দিন ভুলবে না।

কেন?

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা কি এ দেশের মানুষ কোন দিন ভুলতে পারবে?

স্বাতি একটু আচ্ছন্ন ভাবে বলল: না।

বললুম: চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলেই নবদ্বীপের খ্যাতি বললে ভুল বলা হবে। তাঁর জন্মের অনেক আগে থেকেই এই স্থান বাঙলার শিক্ষা সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। বৃহৎ বঙ্গের মিথিলার মতো নবদ্বীপও আপন গৌরবে উজ্জ্বল ছিল। দেশদেশান্তর থেকে আসত ছাত্র ও শিক্ষকেরা। ছাত্রেরা সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করত, অধ্যাপনা করতেন শিক্ষকেরা। হিন্দু রাজাদের আনুকূল্যে চলত এই সব শিক্ষাকেন্দ্র।

কয়েকটি নাম আমার মনে পড়ল। লক্ষ্মণসেনের আমলে তাঁরা নবদ্বীপে ছিলেন। হলায়ুধ, পশুপতি, শূলপাণি উদয়নাচার্য, আদ্বিহোধযোগী। এঁরা বোধহয় অন্য স্থান থেকে এসেছিলেন। তার কারণ স্থানীয় লোকদের যে সব নাম আমরা পাই, তা অন্য। তাঁদের মধ্যে আছেন বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন স্মার্ত ভট্টাচার্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। রঘুনাথ ন্যায়ের পণ্ডিত, আর স্মৃতির পণ্ডিত রঘুনন্দন; আগমবাগীশ ছিলেন বিখ্যাত তান্ত্রিক।

নবদ্বীপে জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও চর্চা ছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন নাম আমার মনে পড়ল না।

অনেকক্ষণ আমাকে নীরবে থাকতে দেখে স্বাতি বলল: কী ভাবছ বল তো?

আমি সত্যি কথাই বললুম: নবদ্বীপেরই কথা।

কোনও নতুন কথা?

না। পুরনো কথাই মনে পড়ছে। --

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তথা।
কহিল ব্রহ্মার প্রতি অন্তরের কথা।
এই হেতু অন্তর্দ্বীপ নাম।

অন্তর্দ্বীপ!

ঠাকুর নরহরি সরকার তাঁর 'ভক্তি রত্নাকরে' লিখেছেন, না অন্য কোন বৈষ্ণব সাহিত্যে পড়েছি তা মনে নেই। নবদ্বীপের নটা দ্বীপের নাম বোধহয় এই রকম: অন্তর্দ্বীপ মধ্যদ্বীপ সীমন্তদ্বীপ ঋতুদ্বীপ রুদ্রদ্বীপ কোলদ্বীপ জহ্নুদ্বীপ গোদ্রুমদ্বীপ মোদদ্রুমদ্বীপ।

স্বাতি আমার মুখের দিকে এমন ভাবে তাকাল যে আমি লজ্জা পেয়ে গেলুম। কিন্তু সে ভাব কাটিয়ে উঠে বললুম: গঙ্গা এখানে বেণী মুক্ত করেছিলেন মুহূর্তের জন্যে, নবদ্বীপের সৃষ্টি হবার পরেই যুক্তবেণী হলেন। পুরাকালের সুবর্ণ বিহার যে এখানেই ছিল, তাও জানা যায় এই বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে। -

সুবর্ণ বিহার যার নাম।
তথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার।

ব্রহ্মাণীতলা নামে নাকি এক পীঠস্থান ছিল এই নবদ্বীপে। সরস্বতীরই এখানে ব্রহ্মাণী নাম।

স্বাতি একেবারে অন্য কথায় চলে গেল। বলল: নবদ্বীপে অনেক টোল ছিল শুনেছি। পাঠশালাকে কি টোল-বলত?

বললুম ঃ না। পাঠশালায় অক্ষর পরিচয় হয়, টোলে পরিচয় হয় শাস্ত্রের সঙ্গে। চতুষ্পাঠীর বাঙলা হল টোল।

স্বাতি আরও কিছু শোনবার জন্যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাই দেখে বললুম ঃ বড় বড় পণ্ডিতেরা টোল খুলে শাস্ত্র পড়াতেন। ন্যায়ের পণ্ডিত ন্যায় শাস্ত্র পড়াতেন, স্মৃতির পণ্ডিত স্মৃতি। জমিদারেরা খরচ দিতেন কোন কোন টোল চালাবার, আবার কোন পণ্ডিতকে নানা সামাজিক কাজে দান গ্রহণ করতে হত, কিংবা শাস্ত্রের বিচার সভায় কৃতিত্ব দেখিয়ে পুরস্কার আনতে হত টোল পরিচালনার জন্যে। আবার কোন উপার্জন নেই, এমন টোলও ছিল।

তারপরেই বললুম ঃ বুনো রামনাথের গল্প তোমার মনে আছে ?

ভুলে গেছি।

বলে স্বাতি গল্প শোনবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করল।

বললুম ঃ রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ছিলেন ন্যায়ের পণ্ডিত। অসাধারণ তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, দেশদেশান্তর থেকে তাঁর কাছে ছাত্র আসত। কিন্তু এত দরিদ্র ছিলেন যে তাঁর টোলে ছাত্র প্রতিপালন করতে পারতেন না। আবার অন্যের দান গ্রহণও করবেন না। তাতে অসম্মান আছে বলে মনে করতেন। তাই নবদ্বীপ শহরে না থেকে কুটীর নির্মাণ করেছিলেন শহরের বাহিরে।

স্বাতি বলল ঃ লোকে তাঁকে বুনো রামনাথ কেন বলত ?

বোধহয় বনে বাস করতেন বলে, কিংবা শহরের বিলাস বর্জন করবার জন্যে।

তারপর ?

বললুম ঃ দেশের রাজা তখন কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁরই দানে নবদ্বীপের অনেক টোল চলত। অনেকেই রামনাথকে রাজার সাহায্য নেবার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু পণ্ডিত রাজী হন নি। নিজের খরচেই অনেক ছাত্র তাঁর কাছে পড়াশুনো করত।

স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল : রাজার রাণীর সঙ্গে কী একটা বিবাদ হয়েছিল, তাই না ?

বললুম : বিবাদ নয়। গঙ্গায় স্নান করবার সময় রাণী দেখেছিলেন বুনো রামনাথের ব্রাহ্মণীকে। পরনে একখানি কাপড়, আর হাতে লাল সুতো, কিন্তু রাণীকে সম্মান করেন নি। কী একটা কথার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমার হাতে এই লাল সুতো এখনও আছে, তাই নবদ্বীপের মান এখনও আছে। রাণী অপমানিত হয়ে রাজার কাছে নালিশ করেছিলেন। খোঁজ নিয়ে রাজা এলেন বুনো রামনাথের কুটীরে। সব জানবার পরে বললেন, আপনার কী চাই বলুন। পণ্ডিত যেন আকাশ থেকে পড়লেন, কী চাই! আমার তো কোন অভাব নেই! তারপরে বললেন, আমার ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।

স্বাতির বোধহয় গল্পটা মনে পড়ছিল। আমি থামতেই বলল : বল।

বললুম : রাজার প্রশ্ন শুনে ব্রাহ্মণীও সেই এক কথাই বললেন, আমাদের অভাব কিসের! শোবার মাদুর আছে, ভাত খাবার পাথর আছে, রাঁধবার হাঁড়ি আছে ; আর তেঁতুল গাছে আছে যথেষ্ট পাতা। কর্তা তো তেঁতুল পাতার ঝোল খেতেই ভালবাসেন। রাজা আশ্চর্য হয়ে শুনছিলেন এই কথা। তাই দেখে ব্রাহ্মণী তাঁর হাতের লাল সুতোও দেখিয়ে বলেছিলেন, এই লাল সুতো থাকতে কোনও অভাব আছে কি ভাবতে পারি!

স্বাতির দু চোখে এক রকমের আবেশ দেখলুম। কোন কথা না বললেও বুঝতে পারলুম যে তার বলার কথা আমি বুঝতে পেরেছি।

৫

এক সময় স্বাতি বলেছিল: ব্যাণ্ডেলে পৌঁছবার আগেই আমাদের মুখ হাত ধুয়ে নিতে হবে।

হেসে বলেছিলুম: ব্যাণ্ডেলের চা তো ভাল নয়!

মুখ হাত ধোবার সরঞ্জাম হাতে নিয়ে স্বাতি বলেছিল: এ তো দিল্লী এক্সপ্রেস নয় যে খারাপ চা দিয়ে পরিত্রাণ পাবে!

বলে আমার উত্তরের জন্যে আর অপেক্ষা করে নি। নিজেই আগে বাথরুমে চলে গিয়েছিল।

প্রথমটায় আমি তার কথাই ভেবেছিলুম। মনে হয়েছিল যে জীবনে বোধহয় একটা মস্ত পরিবর্তনের দিন আসছে। কিন্তু সেই পরিবর্তনটা কী রকমের তা ভেবে পাচ্ছিলুম না। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে আমি দার্জিলিঙের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি শুনে স্বাতি যে এমন করে একা চলে আসতে পারে, এ আমার স্বপ্নেরও অতীত। তার চেয়েও বেশি আশ্চর্যের ঘটনা হল মামা-মামীর সম্মতি। তাঁরা এমন দূরের পথে মেয়েকে একা ছেড়ে দিলেন কোন্ সাহসে, সেই কথাটি আজও আমার জানা হয় নি। স্বাতি নিশ্চয়ই জোর করে চলে আসে নি, কিন্তু অনুমতিই বা পেল কেমন করে! কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদারের কথা কি মামী ভুলেই গেলেন! কিন্তু কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর আজ পাওয়া যাবে না। স্বাতিকে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে সে শুধু হাসবে। কিংবা বলবে, কর্ণ সুবর্ণ কোথায় গোপালদা?

কর্ণ সুবর্ণের নাম বোধহয় স্বাতি জানে না। জানলে এতক্ষণ ঠিকই জিজ্ঞাসা করত। ইতিহাসের বই-এ এই স্থানটির সঠিক অবস্থান এখনও লেখা হয় নি। সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়ের রাজধানী

ছিল কর্ণ সুবর্ণ, মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কোন স্থানে এই শহরটি ছিল। প্রথম বাঙালী রাজা শশাঙ্ক এইখান থেকেই বিহার ও উড়িষ্যা জয় করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। হিউএন চাঙ এই জায়গার নাম বলেছেন কিএ-লো-ন-সু-ফ-ল-ন। বুদ্ধদেব নাকি সাত দিন এইখানে থেকে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাই হিউএন চাঙও এই কর্ণ সুবর্ণ নগর ও তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন। অনেক মন্দির বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারাম ছিল এখানে। অশোকের তৈরি স্তূপও ছিল। আর একটি মহাবিহার ছিল। হিউএন চাঙের ভাষায় তার নাম লো-তো-মো-চি, বা লালমাটি বা রক্তমৃত্তিকা।

একালের পণ্ডিতরা অনেক গবেষণার পরে বলেছিলেন যে মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটি নামে একটি স্থান আছে ভাগীরথীর তীরে, কর্ণ সুবর্ণ তারই প্রাচীন নাম। কিন্তু এ অনুমান পালটে গেছে। ১৯৬২ সালে রাজবাড়ি ডাঙার একটি উঁচু টিবি খুঁড়ে রক্ত-মৃত্তিকা বিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভাগীরথীর ওপারে মুর্শিদাবাদ শহর, এ পারে আজিমগঞ্জ কাটোয়া হয়ে আমরা আসছি। খাগড়াঘাট রোডের পরেই চিরুটি স্টেশনের কাছে এই রাজবাড়ি ডাঙা।

বাঙলার প্রথম বাঙালী রাজা শশাঙ্ক এই কর্ণ সুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে তাঁর রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে এই শশাঙ্কর সত্য পরিচয় বোধহয় আমরা পাই নি।

স্বাতি এমন তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে ফিরে আসবে, আমি তা ভাবতে পারি নি। তাই তার কথায় চমকে উঠেছিলুম। স্বাতি বলেছিল : অমন গম্ভীর মুখে কী ভাবছ বল তো ?

একটুখানি সামলে নিয়ে আমি বলেছিলুম : শশাঙ্কর কথা।

কোন বন্ধু বুঝি ?

হেসে বললুম : না।

তবে ?

বাঙলার প্রথম বাঙালী রাজা শশাঙ্ক।

সকৌতুকে স্বাতি বলে উঠল: সত্যিই তো, ইতিহাসের এত রাজা-উজির থাকতে বন্ধুবান্ধবের কথা তুমি ভাববে কেন!

লজ্জা না পাবার ভাণ করে বললুম: আজকের কৃতী মানুষ কাল ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে। আমার সামনে বর্তমান ছিল না বলেই অতীতের কথা ভাবছিলুম ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভয় পাই বলে।

লজ্জায় আমার কথা যে খানিকটা এলোমেলো হল, স্বাতি তা বুঝতে পেরেছিল। বলল: বর্তমানকে তাহলে একটু ভুলেই থাক। শশাঙ্কর গল্পটা সংক্ষেপে বলে তুমিও মুখ হাত ধুয়ে এস।

বললুম: ইতিহাসেও শশাঙ্কর কথা সংক্ষেপে আছে। তার প্রধান কারণ হল যে তাঁর রাজসভায় কোন কবি বা ঐতিহাসিক বোধহয় ছিল না। আর শশাঙ্ক নিজেও ইতিহাস রচনায় মন দেন নি। কোথা থেকে কী ভাবে তিনি রাজা হয়ে বসলেন, তা জানা যায় না। কিন্তু তাঁর বীরত্বের কথা জানা যায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা হর্ষবর্ধনের সঙ্গে চিরবিরোধের জন্যে।

স্বাতি বলল: হর্ষবর্ধনের নাম জানি।

তা তো জানবেই। হর্ষবর্ধন শুধু সম্রাট নন, কবি ছিলেন। তিনখানি নাটক লিখেছিলেন তিনি। তাঁর সভায় ছিল সে কালের শ্রেষ্ঠ কবি বাণভট্ট। বাণভট্ট শুধু কাদম্বরী লেখেন নি, লিখেছিলেন হর্ষচরিতও। আর চীন দেশের পরিব্রাজক হিউএন চাঙ এই হর্ষবর্ধনের পরম বন্ধু হিসেবে তাঁর গুণকীর্তন করে গেছেন নিজের ভ্রমণ-কাহিনীতে। কাজেই এই হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শত্রুতা করে শশাঙ্ক খুব ভুল করেছিলেন, বাণভট্ট ও হিউএন চাঙের বিবরণে তিনি খুব হেয় হয়ে আছেন। কিন্তু হিউএন চাঙের লেখা থেকেই প্রমাণ হয় যে শশাঙ্ককে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেন নি।

তোমার ভূমিকাটি ভাল লাগল।

বলে স্বাতি হাসল। এ তার কৌতুকের হাসি। কিন্তু আমি তা উপেক্ষা করেই বললুম: স্কুলের ইতিহাসে আমরা যা পড়েছি, তা নিশ্চয়ই সত্য। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কর বিরোধের একটা কারণ আছে। মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে শশাঙ্ক কান্যকুব্জ আক্রমণ করেছিলেন। কান্যকুব্জের রাজা নিহত ও তাঁর রাণী রাজ্যশ্রী বন্দী হয়েছিলেন। এই রাজ্যশ্রী ছিলেন হর্ষবর্ধনের ভগিনী, আর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন তখনই দেবগুপ্ত ও শশাঙ্কর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। যুদ্ধে দেবগুপ্তকে পরাজিত করে কান্যকুব্জ জয় করেছিলেন রাজ্যবর্ধন, কিন্তু ফেরার পথে শশাঙ্কর সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। এর পরে হর্ষবর্ধন রাজা হয়েছিলেন, আর শশাঙ্ককে শায়েস্তা করবার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি।

স্বাতি বলল: রাজ্যশ্রীর কথা বললে না?

বললুম: শশাঙ্কই বোধহয় রাজ্যশ্রীকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর দীর্ঘকাল পরে হর্ষবর্ধন তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্য অঞ্চলে। এর পরে হর্ষবর্ধন কনৌজে পত্তন করেছিলেন তাঁর রাজধানী, আর সারা ভারত জুড়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

তিনি কি বাঙলাও অধিকার করেছিলেন?

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম: না। মৃত্যুকাল পর্যন্ত শশাঙ্ক যে বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি ছিলেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই। উড়িষ্যায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে, আর মগধের উপর তাঁর আধিপত্যও অক্ষুণ্ণ ছিল।

এর প্রমাণ আছে?

আছে বলতে পার।

কী রকম?

ইতিহাসে আছে যে দক্ষিণ ভারতের রাজা পুলকেশীর হাতে হর্ষবর্ধন পরাজিত হন। কিন্তু শশাঙ্কর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কোন প্রসঙ্গ নেই। অথচ হর্ষচরিতে কবি বাণভট্ট লিখেছেন যে রাজ্যবর্ধনের হত্যার সংবাদ পেয়ে হর্ষবর্ধন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি পৃথিবী গৌড়শূন্য করবেন, তা না পারলে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করবেন। হর্ষবর্ধন এ সত্য পালন করে থাকলে কবি সাড়ম্বরে সেই কথা লিখতেন তাঁর কাব্যে।

স্বাতি বলল: এ তো প্রমাণের কথা নয়, এ অনুমানের কথা।

অনুমান বলতে পার। কিন্তু আর একটি ঘটনার জন্যে আমি এই কথা সত্য বলে বিশ্বাস করি।

বল।

বলে স্বাতি আবার আমার দিকে তাকাল।

বললুম: হর্ষবর্ধনের প্রিয় বন্ধু হিউএন চাঙও অনেক নিন্দা করেছেন শশাঙ্কর। শশাঙ্কর বৌদ্ধ বিদ্বেষ সম্বন্ধে অনেক গল্প লিখেছেন। কিন্তু তাঁর মনে ছিল না যে কর্ণসুবর্ণের বর্ণনায় তিনি যে সব বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপের কথা লিখেছেন, তাতে শশাঙ্কর বৌদ্ধ বিদ্বেষ প্রমাণ হয় না। নিজে শৈব হলেও তাঁর রাজ্যে বৌদ্ধরা প্রতিপত্তিশালী ছিল।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: এ কোন প্রমাণ হল না।

বললুম: প্রমাণের কথা এখনও বলি নি। সে হল শশাঙ্ক সম্বন্ধে হিউএন চাঙের শেষ গল্প। শশাঙ্ক নাকি বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর মন্দির থেকে বুদ্ধমূর্তি সরিয়ে ফেলবার আদেশ। এই পাপে শশাঙ্কর দেহের মাংস পচে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

স্বাতি শিহরে উঠে বলল: বল কি!

হেসে বললুম: শশাঙ্ক যে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যান নি, বা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান নি, এই অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ থেকেই

এ কথার প্রমাণ হচ্ছে। শশাঙ্কর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মগধের অধিপতি ছিলেন। মগধ রাজ্যেই তো বুদ্ধগয়া, তা শশাঙ্করই রাজ্য ছিল। আর পরম বৌদ্ধ হর্ষবর্ধন তা অনেক দিনের চেষ্টাতেও অধিকার করতে পারেন নি।

স্বাতি বলল: তোমার এ যুক্তি ভাল।

কিন্তু এ মন-গড়া যুক্তি নয়। ঐতিহাসিকেরাও এ কথা মেনে নিয়েছেন।

গাড়ির গতি কমছিল। বোধহয় কোন স্টেশনে এসে থামবে। কোন্ স্টেশন তা আমরা জানি না। তাই স্বাতি ব্যস্ত হয়ে বলল: নাও, এইবারে ওঠ। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে এস। ব্যাণ্ডেলে আমাদের চা খেতেই হবে।

আমি কোন আপত্তি না করে উঠে পড়লুম।

একটা কথা আমাদের অসম্পূর্ণ থেকে গেল। বেচারা শশাঙ্কর ভাগ্যের কথা। প্রথম বাঙালী দেখেছিলেন সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন। এর আগে গুপ্ত রাজারা বাঙালী ছিলেন, এ কথা ঐতিহাসিকেরা মেনে নেবেন না। কিন্তু এই মতকে বিচার করে দেখতে হবে। শশাঙ্ক যে পুরোপুরি বাঙালী ছিলেন, তা সবাইকেই মেনে নিতে হয়েছে। হর্ষবর্ধনের সভাসদরা তাঁর মাথায় অনেক কলঙ্ক চাপিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোন সভাসদ তাঁর প্রাপ্য সম্মানেরও ব্যবস্থা করেন নি। তাঁর যে তিনখানি শিলালিপি পাওয়া গেছে, তার থেকেই জানা যায় যে তিনি উত্তর প্রদেশের মৌখরি রাজাকে পরাজিত করেন, কনৌজ জয় করেন মালবরাজের সঙ্গে, আর প্রবল প্রতাপে শাসন করেন গৌড় মগধ দণ্ডভুক্তি উৎকল ও কোঙ্গো। তাঁর সভায় একজন কহ্লন বা বাণভট্ট থাকলে নিজের দেশে আজ তিনি অজ্ঞাতকুলশীল থাকতেন না, বেচারা শশাঙ্কর জন্যে আমার সত্যিই দুঃখ হয়।

৬

ট্রেন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। অল্পক্ষণ পরেই আবার চলতে শুরু করেছিল। বাথরুমের ভিতর থেকে বুঝতে পারি নি, এ কোন্ স্টেশন। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলুম যে এ ব্যাণ্ডেল নয়। ব্যাণ্ডেল হলে ট্রেন আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াত, চা-ওলার হাঁক-ডাক শুনতে পেতুম। তাই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করি নি।

কিন্তু মনে যে একটা খট্‌কা লেগেছিল, তা প্রকাশ হয়ে পড়ল স্বাতির কাছে ফিরে এসে। কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করে ফেললুম: ব্যাণ্ডেল পেরিয়ে যাই নি তো?

স্বাতি হেসে বলল: না।

একটা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল বলে মনে হয়েছিল।

ত্রিবেণীতে।

ত্রিবেণী!

স্বাতি তেমনি হাসি মুখেই বলল: এলাহাবাদের ত্রিবেণী নয়, এ আমাদের বাঙলার ত্রিবেণী। কিন্তু ত্রিবেণীতে কোন্ তিন নদী বল তো?

বললুম: গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: যমুনা আর সরস্বতী কোথায়?

সে কথা বলতে গেলে যুক্তবেণী আর মুক্তবেণীর কথা বলতে হবে।

বল।

বলে স্বাতি আমার দিকে ফিরে বসল।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বললুম: এলাহাবাদে যুক্তবেণী, মানে

গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মিলন হয়েছে সেখানে। এই পর্যন্ত এক সঙ্গে প্রবাহিত হবার পরে তারা আবার মুক্ত হয়ে তিন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

স্বাতি সংক্ষেপে মন্তব্য করল : আশ্চর্য কথা।

বললুম : এলাহাবাদের ত্রিবেণীতে এখন গঙ্গা যমুনা আছে, কিন্তু সরস্বতী নেই। আর এই ত্রিবেণীতে এখন শুধু গঙ্গাই আছে। যমুনা তো নেই-ই, সরস্বতীর খাতও বুজে গেছে।

সরস্বতী ছিল ?

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কেন ?

সরস্বতীর তীরে ছিল সপ্তগ্রাম। চার-পাঁচ শো বছর আগেও যে সরস্বতীর প্রশস্ত প্রবাহ বেয়ে নানা দেশের জাহাজ এসে সপ্তগ্রামে ভিড়ত, তার কথা নানা জায়গায় পাওয়া যায়। ইউরোপের লেখকেরা এই নদীর নাম দিয়েছিল সাত গাঁ রিভার। মনে হয় যে গঙ্গার একটি ধারা ত্রিবেণীর নিকট থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে কলকাতার বটানিকাল গার্ডেনের কাছে আবার গঙ্গায় এসে মিলত। কতকটা কালীঘাটের আদি গঙ্গার মতো। সে গঙ্গায় কিছু জল আছে টলি সাহেব তার সংস্কার করেছিলেন বলে। কিন্তু সরস্বতীর খাত একেবারে বুঁজে গেছে। সেই খাতের মাটি খুঁড়ে এখন জাহাজের মাস্তুল আর নৌকোর তক্তা পাওয়া যায়।

স্বাতি বলল : তিন নদী না থাকলেও ত্রিবেণী বলবে ?

হেসে বললুম : বিপদ দেখলে বলব, নদী এখানে গুপ্তভাবে প্রবাহিত।

আমার কথায় স্বাতি হাসল। আর কোন প্রশ্ন করল না।

বললুম : ত্রিবেণী যে একটি প্রাচীন তীর্থ তাতে কোন সন্দেহ নেই। পুরাণেও এর উল্লেখ আছে। রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে

আছে, প্রদ্যুম্ন নগরের দক্ষিণে ও সরস্বতী নদীর উত্তরে হল দক্ষিণ প্রয়াগ। গঙ্গা থেকে যমুনা এখানে চলে গেছেন।

স্বাতি বাধা দিয়ে বলল : প্রদ্যুম্ন নগর আবার কোথায় ?

বললুম : এর বর্তমান নাম হল পাণ্ডুয়া।

আর সরস্বতী এখান থেকে কোথায় চলে গেছেন ?

তা তিনি লেখেন নি।

স্বাতি হেসে বলল : তারপর বল।

বললুম : একালের বিচারে ত্রিবেণী হল দক্ষিণ প্রয়াগ, আর এই প্রয়াগে স্নান করেও আসল প্রয়াগে স্নান করার পুণ্য।

স্বাতি বলল : সংস্কৃত শ্লোকটাও বোধহয় মনে আছে ?

এ তার কৌতুকের কথা। তাই উত্তরটা ঘুরিয়ে দিলুম, বললুম : বাঙলা কবিতাও মনে আছে। কোনও হাতের লেখা কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।
আশ্রম করিয়া তথি দান করে ধনপতি
তরী পুরে নানা ধন কিনি॥

কবিকঙ্কনের চণ্ডীতেও ত্রিবেণীর সুন্দর বর্ণনা আছে—

বাম দিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান॥

স্বাতি হাসছিল।

বললুম : হাসছ কেন ?

এত কথা মনে রাখ কী করে, তাই ভাবি।

মনের কাছে অনুরোধ করলেই মন মনে রাখে।

স্বাতি সবিস্ময়ে তাকাল আমার মুখের দিকে।

বললুম : সত্যি কথা। মনের সঙ্গে কোন চালাকি চলে

না। হার মানো মনের কাছে, মন তোমাকে হার মানতে দেবে না।

এ আবেগের কথা, যুক্তির কথা নয়।

বললুম: তাহলে তোমাকে ত্রিবেণীর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননের কথা বলতে হয়।

তিনি আবার কে?

বললুম: অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙলার অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন তিনি। ত্রিবেণীতে জন্ম, ত্রিবেণীতেই মৃত্যু হয়েছে একশো তেরো বছর বয়সে। শঙ্করাচার্যের মতো জাতিস্মর ছিলেন না, কিন্তু তাঁর স্মৃতি-শক্তির একটা গল্প প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

স্বাতি কোন প্রশ্ন না করে গল্পটি শোনবার আগ্রহ দৃষ্টিতে প্রকাশ করল।

বললুম: এক দিনের একটা ঘটনা। জগন্নাথ পণ্ডিত গঙ্গায় স্নান করে ঘাটে বসে সন্ধ্যা আহ্নিক করছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন যে সামনে এক নৌকোয় দুজন গোরা সাহেব তর্কাতর্কি করছে। দেখতে দেখতেই তাদের ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মারামারি। সাহেবরা মামলা আনল আদালতে, সাক্ষী মানল জগন্নাথ পণ্ডিতকে।

স্বাতি বলল: জগন্নাথ কি ইংরেজী জানতেন?

এক বর্ণও না।

তবে সাক্ষী দিলেন কেমন করে?

শ্রুতিধর ছিলেন জগন্নাথ পণ্ডিত। দুজনের মধ্যে যে সব কথা হয়েছিল তা তিনি গড়গড় করে বলে দিলেন। মানে বোঝেন নি, কিন্তু মনে রেখেছিলেন শব্দ।

স্বাতি বলল: অসম্ভব কথা।

হতে পারে অসম্ভব। তাঁর জীবনীতে এ কথা পড়ি নি। কিন্তু শুনেছি ত্রিবেণীর লোকের মুখে।

ট্রেন আমাদের আর একটি স্টেশনে দাঁড়াল। স্বাতি মুখ বাড়িয়ে দেখে বলল ঃ বংশ বাটি।

আমি বললুম ঃ বাঁশবেড়ে। এর পরেই ব্যাণ্ডেল।

খুশী হয়ে স্বাতি বলল ঃ তাই বুঝি!

বললুম ঃ এধারে বাঁশবেড়ের পর ব্যাণ্ডেল, আর ওধারে আদি সপ্তগ্রামের পর।

স্বাতি বলল ঃ বাঁশবেড়েতে একটা বিখ্যাত মন্দির আছে না?

বললুম ঃ হংসেশ্বরীর মন্দির। কিন্তু এর বেশি আমার জানা নেই। তবে সপ্তগ্রামের ইতিহাস যদি শুনতে চাও তো বলতে পারি।

আবার ইতিহাস!

বলে স্বাতি সকৌতুকে আমার দিকে তাকাল।

বললুম ঃ থাক তবে।

স্বাতি বলল ঃ থাকবে কেন! ইতিহাস শোনাবার এমন সুযোগ আর বোধহয় পাবে না।

কেন?

কলকাতায় তো বাবা নেই, কে শুনতে চাইবে!

খুব সত্যি কথা। এবারে ওঁদের অভাবটাই বেশি করে মনে হবে।

স্বাতি তৎপর ভাবে প্রসঙ্গ পালটে দিল। বলল ঃ ব্যাণ্ডেলে পৌঁছবার আগে সপ্তগ্রামের কথাটা শেষ করে ফেল।

আমি জানতুম যে সপ্তগ্রামের কথা আমাকে বলতেই হবে। সপ্তগ্রামের কথা না বললে বাঙলার কথাই বলা হবে না। আর স্বাতিও সে কথা না শুনে আমাকে অব্যাহতি দেবে না। ইতিহাসে বিরাগের কথা তার নিজের কথা নয়। এ বিরাগ অন্যের। সাধারণ মানুষ ইতিহাস ভালবাসে না। নিরস বিষয় বলে ভয় পায় অনেকে। ইতিহাসকে সরস করে বলা শক্ত কাজ। তাই

সে চেষ্টা না করে বললুম ঃ সপ্তগ্রাম নাম কী করে হল তাই বলি।' কান্যকুব্জের রাজা প্রিয়বস্তুর সাত ছেলেই ঋষি হয়েছিলেন। তাঁরা এই ত্রিবেণীর কাছে সাতটি গ্রামে থেকে তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের তপস্যার জন্যেই এই স্থান সপ্তগ্রাম নামে পরিচিত হয়। 'মুসলমান আমলের পূর্বে বঙ্গে তিনটি উপবিভাগ ছিল। তাদের নাম লক্ষ্মণাবতী সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রাম। মুসলমান আমলেও আমরা সরকার সাতগাঁও নাম পাই। কিন্তু এখন এই সপ্তগ্রামকে ইতিহাসের পাতায় খুঁজতে হয়।

সে ইতিহাস আজকের নয়, তাকে প্রাগৈতিহাসিক কাল বললেও চলে। প্লিনির সময়েও নাকি সপ্তগ্রাম একটি রাজকীয় বন্দর ছিল। পর্তুগীজেরা যখন বাঙলায় আসে, তখনও তার সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক ডি বারো বলে গেছেন—চট্টগ্রামের বন্দর বেশ সুবিধাজনক হতে পারে, কিন্তু সপ্তগ্রাম বন্দর যেমন বড়, শহরও তেমনি।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ এ তো বেশি দিনের পুরনো কথা নয়!

বললুম ঃ এ সব এ কালেরই কথা। বাঙলার কবিকঙ্কণ তাঁর চণ্ডীতে লিখেছেন—

সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথা নাহি যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপাম।
সপ্ত ঋষি শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম॥

বিপ্রদাসের মনসার গীত বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতেও সপ্তগ্রামের বর্ণনা আছে। না দেখে তাঁরা নিশ্চয়ই সে সব বর্ণনা দেন নি। কৃষ্ণ রায় তাঁর ষষ্ঠীমঙ্গলে লিখেছেন—

সপ্তগ্রাম ধরণী যে নাহি তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীর কূল॥

নিরবধি যজ্ঞ দান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাহি নাহি দুঃখ শোক॥

স্বাতি বলল: কিন্তু এই সপ্তগ্রাম আজ গেল কোথায়?

বললুম: সরস্বতী মজে যাবার পরে—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: সরস্বতী কেন মজে গেল?

বললুম: গঙ্গাও যে মজে যাচ্ছে, সে কথা শুনতে পাচ্ছ না! বালিতে ভরে উঠছে গঙ্গার বুক। এই বালি সরাবার ব্যবস্থা না করলে গঙ্গাও মরে যাবে। কোন্ এক পুরাণে আছে যে পাঁচ শো বছর পরে গঙ্গা আর মর্ত্যে থাকবেন না। তখন কলকাতার অবস্থাও হবে সপ্তগ্রামের মতো।

সবিস্ময়ে স্বাতি বলল: সত্যি!

কোন্‌টা সত্যি জানতে চাইছ? আমার অনুমানের কথা, না পুরাণের কথা?

স্বাতি বলল: পুরাণের কথাটা বানিয়ে বললে কিনা জানতে চাইছি।

তার মানে একটা সংস্কৃত শ্লোক বলতে হবে, এই তো!

স্বাতি কোন উত্তর না দিয়ে হাসল।

বললুম: দেবী ভাগবতের মতে গঙ্গা ও সরস্বতী হলেন লক্ষ্মীর সপত্নী। বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে এই তিন স্ত্রীর সঙ্গে বাস করেন। এক দিন গঙ্গা বিষ্ণুকে কয়েক বার কটাক্ষ করেছিলেন। তাই দেখে বিষ্ণু হেসেছিলেন, আর সরস্বতী গিয়েছিলেন চটে। তারপরে বিষ্ণু সেখান থেকে সরে যেতেই দুই স্ত্রীতে কলহ বেধেছিল। শেষ পর্যন্ত দুজনেই দুজনকে শাপ দিয়েছিলেন—নদী হয়ে পৃথিবীতে প্রবাহিত হও।

একটু থেমে বললুম: ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে গল্পটা একটু অন্য রকম। গঙ্গার প্রতি বিষ্ণুর একটু বেশি আসক্তি দেখেই সরস্বতী ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। আর এই নিয়েই কলহ। তারপরে শাপ। এই পুরাণেই আমরা দেখতে পাই যে সরস্বতীর শাপে গঙ্গা যখন

পৃথিবীতে আসছেন,—তখন তাঁর দু চোখে জলের ধারা। তাই দেখে বিষ্ণু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, অন্থ প্রভৃতি—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: সংস্কৃত থাক, তুমি বাঙলাতেই বল।

হেসে বললুম: সরস্বতীর শাপে ভারতবর্ষে তোমায় কলির পাঁচ হাজার বছর থাকতে হবে। তারপরে তুমি আমার নিকটে ফিরে আসবে। এইবারে হিসেব কর।

কিসের হিসেব?

কলি যুগের। এই ধরনের কথা অনেক পুরাণেই আছে। মোটা-মুটি ভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে কলির সাড়ে চার হাজার বছর কেটে গেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেই তো কলি যুগের শুরু। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয় হয়েছে সাড়ে চার হাজার বছর আগে। তার মানে খৃষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে। কাজেই পুরাণের হিসেবে আর পাঁচ শো বছর পরেই গঙ্গা অন্তর্ধান হবেন। পৃথিবী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ। এ যে কলির অন্তিম তাতে কি তোমার সন্দেহ আছে?

স্বাতি কোন উত্তর দিল না।

আমিই বললুম: থাকা উচিত নয়। যে ভাবে আমরা এগোচ্ছি, তাতে একটা ভয়ানক পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি বলেই মনে হয়। আর গঙ্গার অন্তর্ধান হবার কথাটাও বৈজ্ঞানিকরা প্রায় স্বীকার করে নিয়েছেন। সবটা অন্তর্ধান না হলেও কলকাতার গঙ্গার এখন শেষ অবস্থা। সরস্বতী তো বৈকুণ্ঠে ফিরেই গেছেন, গঙ্গারও নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছে। তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সরকারও বোধহয় সচেষ্ট।

বোধহয় বলছ কেন?

দু একটা এলোমেলো খবর ছাড়া কাজের কথা বিশেষ কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

তবে সপ্তগ্রামের কথাই শেষ কর।

বললুম : সপ্তগ্রামের পুরনো ইতিহাস পড়তে পড়তে একটা কথা আমার মনে হয়েছে। কাশ্মীরে যেমন হাউস বোটে বসবাসের ব্যবস্থা আছে, সপ্তগ্রামেও সেই ধরনের কিছু ছিল। মানে ঝিলম নদীর মতো সরস্বতী নদীতেও জাহাজে বা বড় বড় নৌকোতেও লোকে বাস করত।

তাই নাকি !

বললুম : এ কথা কেন মনে হয়েছে তাই বলি। ইউরোপ আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা দেশ থেকে নানা রকমের পণ্য নিয়ে বড় বড় জাহাজ সপ্তগ্রামে আসত। সপ্তগ্রাম থেকেও অনেক জাহাজ ভারতের পণ্য নিয়ে যেত বিদেশে। তখনকার দিনের জাহাজ তো কলে চলত না, সমুদ্রগামী বড় বড় নৌকোকেই জাহাজ বলত। অনেক লোকজন অনেক দিন ধরে চলত সমুদ্রে। তারা সপ্তগ্রামে এসে জাহাজ থেকে নামত না, জাহাজেই থাকত। দেশেও অনেক বড় বড় নৌকোয় লোকজন থাকত সপ্তগ্রামের দক্ষিণে সরস্বতী নদীর বুকে। সরস্বতীর এই ধারা নিশ্চয়ই দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়ত। কিংবা কলকাতার দক্ষিণে আবার এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হত।

১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিজার ফ্রেডরিক নামে একজন বিদেশী সপ্তগ্রামে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনিও সপ্তগ্রামকে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র বলে গেছেন। কিন্তু তখন যে সপ্তগ্রামের শেষ অবস্থা সে কথা আমরা অন্য লোকের লেখায় পাই। পর্তুগীজরা এ দিকে যাতায়াত শুরু করে ১৫৩০ সাল থেকে। তার বছর দশেক পর থেকেই সরস্বতীর বুক শুকিয়ে উঠতে থাকে। জল তো শুকোয় না, পলি আর বালি ভরে উঠেই স্রোত বন্ধ হয়ে যায়। যতদূর জানা গেছে তাতে সপ্তগ্রামের টাঁকশালে শেষবারের মতো টাকা তৈরি হয়েছিল ১৫৫০ সালে। দিল্লীর দরবারে তখন আকবর বাদশাহ, তিনিই পর্তুগীজদের হুগলিতে একটি বন্দর নির্মাণের অনুমতি দেন।

এই বন্দর-শহর গড়ে উঠতে না উঠতেই সপ্তগ্রামের বাণিজ্য হুগলিতে উঠে গেল। জনশূন্য হয়ে গেল সপ্তগ্রাম। এই ঘটনার কিছুদিন আগেই ফ্রেডরিক সপ্তগ্রামে এসেছিলেন একটা বাণিজ্য মেলা দেখতে। তখনও তিনি বুঝতে পারেন নি যে সপ্তগ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু হুগলি কোনদিন সপ্তগ্রামের মতো জমজমাট হয়ে উঠল না। সপ্তগ্রামের বাণিজ্য ছড়িয়ে গেল নানা জায়গায়—চন্দননগর ও চুঁচুড়ায়, শ্রীরামপুর ও কলকাতায়। কলকাতার মৃত্যুর ভয়ে এখন আমরা হলদিয়ায় বন্দর স্থাপন করছি।

কিন্তু স্বাতি এ কথায় মন না দিয়ে বলল: সত্যিই কি সপ্তগ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? সেখানে কি আজ কিছুই দেখবার নেই?

বললুম: এ কথার নির্ভুল উত্তর দিতে পারব কিনা জানি না।

কেন?

আমি তো সে অঞ্চলে যাই নি, কারও কাছে কিছু শুনিও নি। পুরনো বইএ পড়া কথা পর্যন্ত আমার দৌড়। সে কথা সত্য কিনা তোমাকে দেখে যাচাই করতে হবে।

স্বাতি বলল: যাচাই কিছুই করব না। যা জানো তাই বল।

বললুম: যাচাই করে ভুল দেখলেও দোষ দিতে পারবে না, এমন কথাই আগে বলি। গত শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝি ডি মনি নামে এক বিদেশী ভদ্রলোক এ দেশে বেড়াতে এসে সপ্তগ্রাম দেখেছিলেন। তিনি জাফর খাঁ গাজীর দরগাটি ভাল করে দেখে বলেছিলেন যে কোন সময় সেখানেই একটি হিন্দু মন্দির ছিল। দেওয়ালের গায়ে অনেক সংস্কৃত লিপি আছে, আর অনেক দেবদেবীর মূর্তিও আছে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। সপ্তগ্রামে যে এক সময়ে মুসলমান অধিকার ছিল, এ তারই প্রমাণ। গৌড়ের নবাবকে নাকি বছরে বারো লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে হত।

স্বাতি বলল: এই দরগা ছাড়া আর কিছু নেই?

আছে শুনেছি। জামালউদ্দীনের সমাধির কাছে পরম বৈষ্ণব উদ্ধারণ দত্তের মন্দির। সোনার বেনেরা নাকি প্রতিবছর এখানে উৎসব করতে আসেন। তাই মন্দিরটিকে সংস্কার করে রাখা হয়েছে। এর মাইল খানেক দূর দিয়ে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হত। তার তীরে আছে রঘুনাথ গোস্বামীর স্মৃতিমন্দির।

এসব কি আজকাল কেউ দেখতে যায়?

বোধহয় যায় না। আর গিয়ে করবেই বা কী! অরণ্যময় পরিবেশে ভাঙা ইঁটের স্তূপ দেখে বলতে হবে, এটা সপ্তগ্রামের দুর্গ। আর ভাঙা ইঁটের সিঁড়ি দেখে বলতে হবে, এ হল সরস্বতী নদীর ঘাট। আর কোথাও কাঠের টুকরো বা লোহার শিকল দেখে বলতে হবে, নৌকোর কাঠ বা জাহাজের শেকল, তার জন্যে পরিশ্রম করা এ কালের যুক্তিবিরুদ্ধ।

সহাস্যে স্বাতি বলল : এসব গল্প এখন শোনাও যুক্তিবিরুদ্ধ।

বলে তার পাশের জানালার কাচ তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পারল না। বলল : এ সব পুরনো গাড়ির জানালা—

বললুম : সরো, আমি তুলে দিচ্ছি।

স্বাতি বলল : পাগল নাকি! তোমার ভাঙা হাত নিয়ে—

বলতে বলতেই জানালাটা তুলে ফেলল।

দেখলুম যে আমরা ব্যাণ্ডেল স্টেশনে এসে পৌঁছে গেছি। ট্রেন থামতে আর দেরি নেই। ব্যাণ্ডেলেই আমরা সকালের চা খাব।

৭

ব্যাণ্ডেলে কোন ট্রেনই বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। আমাদের ট্রেনও বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়েই আমরা চায়ের ভাঁড় সংগ্রহ করলুম। কিন্তু পছন্দ মতো খাবার জিনিস কিছু পাওয়া গেল না। স্বাতি বলল : বর্ধমান হলে তোমাকে মিহিদানা আর সীতাভোগ খাওয়াতাম।

আমি বললুম : দক্ষিণ ভারত হলে ইডলি বড়া আর কফি।

স্বাতি বলে উঠল : হাওড়া স্টেশনের কফি কর্ণারে ডোসা পাওয়া যায় শুনেছি।

বললুম : তা হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু তার আস্বাদ ঠিক দক্ষিণ ভারতের মতো নিশ্চয়ই নয়।

স্বাতি হেসে বলল : ভয় নেই, হাওড়া স্টেশনে তোমাকে ডোসা খেতে বলব না।

হাওড়ার কথায় আমার উত্তরপাড়ার কথা মনে পড়ে গেল। আমার সেই ভাড়াটে ঘরের কথা। কত দিন এই ছোট ঘরখানি বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে মনে পড়ছে না। এই একখানি ঘরের মধ্যেই আমার সংসার। এর চেয়ে বড় ঘর আমার দরকার হয় নি। বেশি ঘরের প্রয়োজনও হয় নি কোন দিন। হারানিধির হোটেল থেকে আমার সকালের চা আসত, দুপুরের খাবার খেতুম অফিসের ক্যান্টিনে। আর রাতের আহার যত্র তত্র। কোন দিন কলকাতায়, কোন দিন হাওড়া স্টেশনে, কোন দিন বা হারানিধির হোটেলেই। আলস্যের জন্যে কোন দিন বা না খেয়েই রাত কাটাতে হত।

তার পরেই একটা গভীর উদ্বেগে মন আমার ভরে গেল। কলকাতায় আজ আমরা কোথায় উঠব! সেখানে তো আমার কোন

বাসস্থান নেই! তবে কি উত্তরপাড়াতেই নেমে পড়ব! এই ট্রেন কি উত্তরপাড়ায় দাঁড়ায়! যদি না দাঁড়ায়, তাহলে আমরা কী করব! ফিরে আসব হাওড়া থেকে!

কিন্তু একখানি ছোট ঘরের মধ্যে দুজনে থাকব কী করে! ছোট একখানি তক্তাপোশে তো কোন রকমে একজনই থাকতে পারে! স্বাতি ভয় পাবে না তো একা থাকতে!

ট্রেন ব্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়েছিল। স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়েই চমকে উঠল। বলল: তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?

বললুম: না তো!

উঁহু। সত্যি কথা বলছ না।

বলে সে আমার কপালে হাত দিয়ে দেখল। বলল: এ কি, হঠাৎ এমন ঘেমে উঠলে কেন!

কেন জানি না, স্বাতির কাছে আমি আমার উদ্বেগ লুকোতে পারলুম না। বললুম: এ গাড়ি উতোরপাড়ায় দাঁড়ায় কিনা জেনে নেওয়া হল না।

খিল খিল করে স্বাতি হেসে উঠল, বলল: উতোরপাড়ায় দাঁড়ালে কি তুমি সেখানে নেমে পড়বে?

তার এই পরিহাসে আমি আজ লজ্জা পেলুম। কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসল না। বলল: এখন তোমাকে কোন কথাই ভাবতে হবে না। আগে ভাল হয়ে গলার বাঁধন খোল, তারপরে নিজের সংসারের কথা ভেবো।

এবারে তার কথায় আর পরিহাসের সুর নেই। মনে হল, কোন বুড়ো মা তার অসুস্থ ছেলেকে এই কথা বলছে। কতকটা অভিভূত ভাবে আমি তার মুখের দিকে তাকাতেই স্বাতি হেসে ফেলল, বলল: ব্যাণ্ডেলেরও তো একটা ইতিহাস আছে শুনেছি। কই, সে কথা তো বললে না?

স্বাতি যে আমাকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে, তা বুঝতে আমার একটুও সময় লাগল না। আমাকে সে ছেলেমানুষ ভাবছে বলেই হাসি পেল।

ধমক দেবার মতো সুরে স্বাতি বলল: এতে হাসবার কী আছে! এই সব অঞ্চলে তো বিদেশীরা এক সময় লুটপাট করে খেত। তার কোন ইতিহাস নেই?

আমি বুঝতে পারলুম যে আর কোন উপায় নেই, ইতিহাসের গল্পই আমাকে বলতে হবে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথাটা সে সন্তর্পণে এড়িয়ে গেল। আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে তার কাছে, নিতান্ত অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ। কিন্তু তার জন্যে কোন অপমানবোধ যাতে আমার মনে না জাগে, সেইজন্যেও সে খুব সতর্ক আছে। আর এইজন্যেই বোধহয় এমন ভাবে কথা বলেছিল যে নিজের মায়ের কথা আমার মনে পড়ে গেছে। মায়ের কাছে তো কোন অপমানের কথা ওঠে না, মায়ের কাছে আত্মসমর্পণে সন্তানের গৌরবই বাড়ে।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে স্বাতি বলে উঠল: এ কি, চুপ করে রইলে যে!

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম: বিদেশীদের উপদ্রবের ইতিহাস আমার ভাল জানা নেই।

স্বাতি বলল: যা জানো, তাই আমার কাছে যথেষ্ট।

বললুম: এ দেশে পর্তুগীজেরাই লুটেরা নামে পরিচিত। বাঙলায় তাদের বলত জলদস্যু। ব্যাণ্ডেল আর হুগলিতে তাদেরই আধিপত্য ছিল। ইংরেজরাও ছিল হুগলিতে। দিনেমাররা ছিল শ্রীরামপুরে, তখন এই জায়গার নাম ছিল ফ্রেডরিক নগর। চন্দননগরে ফরাসীদের অধিকার কিছুদিন আগেও বহাল ছিল। ফরাসডাঙার কাপড় এই ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর ওলন্দাজদের আড্ডা ছিল চুঁচড়োয়, গ্রীকরা রিষড়ায়, আর জর্মন ও অস্ট্রিয়ানরা ছিল

ভদ্রেশ্বরে। হুগলি ও কলকাতার ইংরেজরাই শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিল।

স্বাতি বলল ঃ আগে তুমি ব্যাণ্ডেলের গল্প বল।

তার কথা শুনে আমি জানালা দিয়ে বাহিরে তাকালুম। ট্রেন তখন স্টেশন ছাড়িয়ে এসেছে। বাম দিকে একটা লাইন গঙ্গার উপরে হুগলিঘাটের দিকে গেছে। গঙ্গার উপরে জুবিলি পুল পেরিয়ে নৈহাটি মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। কলকাতার পূর্বে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে যে প্রধান লাইন উত্তরে গেছে পূর্ববঙ্গের দিকে, তারই উপরে নৈহাটি স্টেশন। কিন্তু আমরা সোজা দক্ষিণে হাওড়া স্টেশনের দিকে চলেছি।

স্বাতি বলল ঃ অমন মনোযোগ দিয়ে কী দেখছ বল তো?

বললুম ঃ ব্যাণ্ডেলের গির্জা দেখা যায় কিনা তাই দেখছি।

দেখতে পাচ্ছ নাকি?

বলে স্বাতিও বাহিরের দিকে তাকাল।

বললুম ঃ না, দেখতে পাই নি, স্থির হয়ে বোসো। এই গির্জার গল্প আমি না দেখেই বলব।

বল।

বলে স্বাতি আমার দিকে ফিরে বসল।

বললুম ঃ এই গির্জাটি পর্তুগীজদের তৈরি। ধর্মের ব্যাপারে ওরা যে ভারি গোঁড়া ছিল, তা বোধহয় জানো। এক সময় মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করে তাদের ধর্মান্তরিত করত, পর্তুগীজরাও কতকটা তেমনি করে হিন্দু ও মুসলমানকে খ্রীষ্টান করত। তাদের ক্রীতদাসের ব্যবসা ছিল, আর অনাথ ছেলে-মেয়েদেরও ধরে নিয়ে গিয়ে তারা খ্রীষ্টান করত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে গির্জা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তারা খুব বেশি উৎসাহী ছিল। ব্যাণ্ডেলের এই গির্জাটি তারা ১৫৫৯ সালে নির্মাণ করে। তারপরে কয়েকবার এর সংস্কার করতে হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহ ও আগুনে

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেকবার। সে সব কথার পিছনে একটা ইতিহাস আছে।

স্বাতি বলল ঃ সংক্ষেপে বল।

বললুম ঃ তা ছাড়া উপায় নেই। স্কুলের ইতিহাসে যা পড়েছি, তারই কিছু মনে আছে।

একটুখানি ভেবে নিয়ে বললুম ঃ পর্তুগীজরাই এদেশে এসেছিল সকলের আগে। ভাস্কো-ডা-গামাই আমেরিকা খুঁজতে বেরিয়ে ভারতবর্ষের কালিকটে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তারপরে ইংরেজ ওলন্দাজ ফরাসী দিনেমার একে একে সবাই এসেছে বাণিজ্য করতে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে পর্তুগীজদের মতো প্রতিপত্তি বিস্তার করতে আর কেউ পারে নি। শেষ পর্যন্ত দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কোপদৃষ্টিতে পড়ল তারা। কোঙ্কণ উপকূলে গোয়া বেসিন ও সলসেটি অধিকার করে বেশ লুঠতরাজ করে যাচ্ছিল। বিজাপুরের কয়েকটি বন্দরও পুড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরে হুগলি ও চট্টগ্রামে এসেও জাঁকিয়ে বসেছিল। দস্যুবৃত্তি ও পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষের জন্যে তারা জনসাধারণের খুবই বিরাগভাজন হয়ে উঠল। ঠিক, এই সময়ে মুসলমান তীর্থযাত্রীদের চারখানি জাহাজ অধিকার করবার জন্যে জাহাঙ্গীর বাদশা ক্ষেপে গিয়ে রাজ্যের সমস্ত পর্তুগীজকে বন্দী করে কারারুদ্ধ করবার আদেশ দিলেন, আর বাণিজ্যে তাদের প্রতিপত্তি ধ্বংস করবার জন্যে ওলন্দাজদের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

কিন্তু জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাদের শায়েস্তা করতে পারেন নি। শায়েস্তা করেছিলেন বাদশাহ শাহজাহান। মমতাজ মহলের বেগমের দুজন বাঁদীকে আটক করেই তারা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনল। পর্তুগীজদের ধ্বংস করবার জন্যে বাদশাহ কাশিম খাঁকে বাঙলার সুবেদার নিযুক্ত করে পাঠালেন। ১৬৩২ সালের কথা। কাশিম খাঁ এসেই হুগলি অবরোধ করে বসলেন। তিন মাসের চেষ্টায় হুগলি

দখল করে পর্তুগীজদের ঘাঁটি বিধ্বস্ত করে ফেললেন, আর হাজার চারেক পর্তুগীজকে বন্দী করে আগ্রায় বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

স্বাতি বলল: ব্যাণ্ডেলের কথা শেষ না করেই তুমি হুগলির কথায় চলে এলে?

বললুম: ব্যাণ্ডেলের কথা বলতে হলে গির্জার কথাই বলতে হয়, আর কয়েকটা অলৌকিক গল্প।

স্বাতি খুশী হয়ে বলল: ইতিহাস অনেক শুনেছি, এইবারে গল্পই বল।

বললুম: যে পাদ্রিরা ব্যাণ্ডেলের গির্জা তৈরি করেছিল, তারা অগাস্টিনিয়ান। আওয়ার লেডি অব দি রোজারির নামে উৎসর্গ করা গির্জা। শাহজাহানের আমলে এই গির্জাটি ধ্বংস হয়ে যাবার পর জন গোমেজ ডি শেটো এটি নতুন করে নির্মাণ করে।

না না, ইতিহাস আর নয়। এবারে তুমি গল্প বল।

বলে স্বাতি আমাকে বাধা দিল।

বললুম: জাহাঙ্গীর বাদশাহ পর্তুগীজদের ওপরে রেগে গিয়েও কেন পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে একটা গল্প পড়েছিলুম অনেক আগে। ডি ক্রুজ নামে ব্যাণ্ডেলের একজন পাদ্রীকে নাকি তাঁর সামনে হাজির করা হয়েছিল। বাদশাহ তাঁকে একটি হাতির পায়ের নিচে ফেলতে বলেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে সেই মস্ত হাতিটা পাদ্রীকে পিষে না ফেলে শুঁড় দিয়ে আদর করতে থাকে। তাই দেখে বাদশাহ তাঁকে ছেড়ে দেন। ব্যাণ্ডেলের এই গির্জাটি সংস্কার করে তার খরচ চালাবার জন্যে কিছু নিষ্কর জমিও দেন। এই ঘটনাকে স্মরণ করেই ব্যাণ্ডেলের গির্জায় এখন প্রতি বৎসর ডোমিংগো ডি ক্রুজ উৎসব হয়।

স্বাতি বলল: এ নিশ্চয়ই তৈরি গল্প।

বললুম: এই রকম গল্প আরও একটি আছে।

বল।

বলে সে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : মোগলরা যখন গির্জা আক্রমণ করেছিল, তখন পাদ্রীর একজন বন্ধু নাকি মেরি মায়ের মূর্তি নিয়ে গঙ্গার জলে লাফিয়ে পড়ে। পরে সেই মূর্তিটি আবার পাওয়া যায়।

কেমন করে?

অনেক দিন পরে এক জ্যোৎস্না রাতে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে পাদ্রী সাহেব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে নদীর জলে এক জায়গায় আলোড়ন হচ্ছে। পরদিন সকালে সেইখানে খুঁজেই মূর্তিটি পাওয়া যায়। গির্জায় এখন সেই পুরনো মূর্তিটিই প্রতিষ্ঠিত আছে।

স্বাতি বলল : তুমি এই গির্জা দেখেছ?

বললুম : না। তবে শুনেছি যে গোয়ার গির্জার মতোই দেখতে। এক পাশে একটা চার পাঁচ তলা বাড়ি, দেখলে মনে হবে যে গোয়ার কোন গির্জা দেখছি।

সত্যি!

কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কেন?

পর্তুগীজরা প্রায় একই সময়ে এই সব গির্জা তৈরি করেছিল

আর একটি অলৌকিক গল্প আমার মনে পড়ে গেল। বললুম : আমার এক বন্ধুর কাছে আর একটি অলৌকিক গল্প শুনেছি।

বল।

এই গির্জায় নাকি একটি মাস্তুল আছে। তার গল্প কেরালার উপকূলে বর্কলার মন্দিরের ঘণ্টার মতো। কোন জাহাজের ক্যাপ্টেন অকূল সমুদ্রে ঝড়ের দাপট থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এই মাস্তুল গির্জায় দেবার মানত করেছিল। তারপর রক্ষা পেয়ে এই পাদ্রীকে এটি উপহার দিয়ে যায়।

দেখতে না দেখতেই আমরা হুগলি স্টেশনে এসে গেলুম। কিন্তু

ট্রেন থামল না। তাই দেখে স্বাতি বলে উঠল: আমাদের গাড়ি এখন কেমন ছুটেছে দেখছ!

বললুম: এবারে বোধহয় হাওড়া পৌঁছেই থামবে।

সত্যি!

হেসে বললুম: এ যে লোকাল ট্রেন নয়, তা প্রমাণ করতে হবে তো!

স্বাতি বেশ আরাম করে বসে বলল: এ বেশ ভালই হল। ঘণ্টাখানেক নিশ্চিন্তে বসা যাবে।

তারপরেই বলল: এবারে হুগলির গল্প বল।

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম: হুগলির নামে আমার নবাব খাঞ্জা খান আর গৌরী সেনের কথা মনে পড়ছে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

তাই দেখে আমি বললুম: এদের নাম শোন নি!

শোনা নাম বলেই তো মনে হচ্ছে।

অত্যন্ত অলস ও বিলাসীকে আমরা নবাব খাঞ্জা খান বলি না! সেই বিখ্যাত খাঞ্জা খান প্রায় দেড় শো বছর আগে হুগলির ফৌজদার ছিলেন। আর গৌরী সেন! কথায় বলে, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। সেই গৌরী সেনও ছিলেন হুগলির মানুষ।

সত্যি নাকি!

বললুম: খাঞ্জা খানের আসল নাম হল খানজাদ খান। আসলে তিনি হুগলির ফৌজদার ছিলেন, না কোটশিমূল নামে এক জায়গার তহশিলদার, তা বলতে পারব না। তাঁকে নবাব উপাধি দিয়েছিলেন জাহাঙ্গীর বাদশাহ। আর তারপরে গ্রামে যখন বেড়াতে বেরোতেন, তখন তাঁর সমারোহের অন্ত থাকত না। তাইতেই এখন কারও আড়ম্বর দেখলে আমরা উপহাস করে বলি নবাব খাঞ্জা খান।

স্বাতি হেসে বলল: গৌরী সেনও এই রকম নাকি!

বললুম: না। তিনি সত্যিই টাকার মানুষ ছিলেন। জাতে

সোনার বেনে, ব্যবসা করে টাকা করেছিলেন। কেউ বলেন, তিনি বহরমপুরের লোক, কিন্তু হুগলি জেলার বালিগ্রামে তাঁর জন্ম বলেই মেনে নেওয়া হয়। কলকাতার আহিরীটোলায় তাঁর বাড়ি ছিল। তাঁর দানের সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। তিনি জানতে পারলে দেনার দায়ে কেউ জেল খাটত না, অন্যায় ভাবে কেউ সাজাও পেত না আদালতে। আর হুগলির লোকেরা নাকি গৌরী সেনের নামে দোকানে ধার পেত। সেই ধারের টাকা গৌরী সেনই দিতেন।

মনে হল যে আমরা আর একটি স্টেশনের কাছাকাছি এসে গেছি। তাই দেখে স্বাতি বলল: হুগলিতে এখন কী দেখবার আছে, তাই বল।

বললুম: ইমামবাড়া।

এই শব্দটার মানে বল।

ইমাম মানে ইসলাম ধর্মের নেতা বা গুরু। ইমামবাড়ায় মহরমের অনুষ্ঠান হয়। মস্ত বড় বাড়ি, বাঙলায় এ রকম ইমামবাড়া বোধহয় আর নেই। লক্ষ্ণৌএ আছে দুটো।

স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল: এই দেখ, চুঁচুড়া পার হয়ে যাচ্ছি।

বললুম: তারপর চন্দননগর ভদ্রেশ্বর।

স্বাতি বলল: বল বল, এ সব স্টেশনের কথাও বল।

বললুম: এ সব জায়গায় শুধু বিদেশীদের কথা। এ দেশে ব্যবসা করতে এসে এক এক দেশের লোক এক একটা জায়গায় ঘাঁটি করেছিল। সরস্বতীর জল যখন ভাগীরথী দিয়ে বইল, তখন পর্তুগীজরাই প্রথম সপ্তগ্রাম ছেড়ে হুগলিতে এল। ইংরেজরা এল পরে। ইংরেজ ডাক্তার ব্রাউটন সাহেব শাজাহান বাদশাহর এক মেয়েকে রোগমুক্ত করে বাদশাহর কাছে বাণিজ্যের ফর্মান পেলেন। হুগলিতে বসল ইংরেজরাও। তারপর বাদশাহর সঙ্গে পর্তুগীজদের বিবাদ হল। শোনা যায় যে বাদশাহ হবার আগে শাজাহান যখন

বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, পর্তুগীজরা তখন নাকি তাঁকে আশ্রয় দেয় নি। সেইটেই হল আসল রাগ। তারপরে মমতাজমহলের দুজন বাঁদীকে আটকাবার জন্যে সবাইকেই ধরে নিয়ে গেলেন আগ্রায়। ইংরেজ নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। ভাগীরথীর নাম হুগলি বোধহয় তারাই রেখেছিল। তারপরে কলকাতার সুতানুটিতে দুর্গ নির্মাণের অধিকার পেল।

একটু থেমে বললুম: এইবারে মনে করে দেখ। চুঁচড়ো বা চিনসুরায় ওলন্দাজ, চন্দননগরে ফরাসী, ভদ্রেশ্বরে জর্মন ও অস্ট্রিয়ান। বৈদ্যবাটি শেওড়াফুলি ছাড়িয়ে শ্রীরামপুরে দিনেমার, আর রিষড়ায় গ্রীক। বিদেশীদের ব্যবসায় এই অঞ্চল তখন জমজমাট ছিল।

স্বাতি বলল: এ সব অঞ্চলে এখন কিছু দেখবার আছে কিনা বল।

বললুম: সেই এক কথাই আমাকে বলতে হবে।

কী কথা?

নিজের চোখে উতোরপাড়ার লাইব্রেরি দেখেছি, আর কিছু নয়।

তবে যা শুনেছ, বা পড়েছ, তাই বল।

সে ভারি লজ্জার কথা হবে।

কেন?

বললুম: কলকাতার মানুষ আমরা সারা ভারতবর্ষ দেখে এলুম। দেখলুম না শুধু 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া—'

বুঝেছি। কিন্তু সে লজ্জা তো সবারই। কজন আর এ সব দেখেছে বল?

চুঁচড়োয় শুনেছি ডাচ সোলজার্স ব্যারাক এখনও আছে, তারই ভেতর হুগলির কোর্টকাছারি। পুরনো গির্জাও আছে। চন্দননগরেও অনেক গির্জা আর স্কুল আছে। মন্দির আছে নন্দদুলাল আর ভুবনেশ্বরীর। এই ছোট জায়গাটি ভারত সরকারের অধীন হয়েছে ১৯৫৪ সালে। শ্রীরামপুরে ছিল দিনেমার গভর্ণরের বাড়ি। তারই

মধ্যে এখন শ্রীরামপুরের কোর্ট বসছে। গৌরাঙ্গ মন্দির বা শীতলা মন্দিরের কথা না জানলেও মাহেশের মন্দির নিশ্চয়ই জানো ?

স্বাতি বলল : মাহেশের রথের কথা শুনেছি।

আর তার বর্ণনার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী পড়।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : তুমি শ্রীরামপুরের কথাই বল।

তার আগে একটি মন্দিরের কথা বলি। পরে হয়তো মনে থাকবে না।

বল।

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম : চন্দননগর ও চুঁচড়োর মাঝে গোস্বামী ঘাটে নাকি একটি পুরনো ভাঙা মন্দির আছে। বিরাট মন্দির, তার নাম কনে বউএর মন্দির। কালীর মন্দির ছিল, এখন কোন বিগ্রহ নেই।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : কালীর নাম কনে বউ !

হেসে বললুম : না। দেবী সরকারের ছোট ভাইএর বউ ছিল সরকার পরিবারের কনে বউ। লোকে বলে যে দেবী সরকারই এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তার নাম দেয় কনে বউএর মন্দির।

আশ্চর্য !

আরও কয়েকটি স্টেশন আমরা পেরিয়ে এসেছিলুম। তাই বললুম : শ্রীরামপুরের কথা এইবারে সংক্ষেপে শেষ করি। বাঙলা সাহিত্যের কথা জানতে হলে শ্রীরামপুরের কথা জানতেই হবে। প্রথম বাঙলা ছাপাখানা হয়েছিল এইখানে। প্রথম বাঙলা সংবাদ-পত্র সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হত এইখান থেকে। আর বাঙলা অক্ষরে ভারতের মানচিত্র প্রথম এইখানেই মুদ্রিত হয়। তার কারণ কেরী সাহেবের বাস ছিল এই শহরে, আর তাঁর দুজন যোগ্য সহকর্মী ছিলেন মার্শম্যান আর ওয়ার্ড।

হঠাৎ মনে হল যে ট্রেন বোধহয় সামনের স্টেশনে থামবে।

আমার সঙ্গে স্বাতিও বাহিরের দিকে তাকাল। গাড়ির গতি এখন কমে এসেছে। অনেক যাত্রী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনের অপেক্ষায়। কিন্তু না, ট্রেন দাঁড়াল না। শেওড়াফুলি জংশন আমরা ধীরে ধীরে পার হয়ে গেলুম।

তাই দেখে স্বাতি বলল: শেওড়াফুলি থেকেই তো তারকেশ্বর যেতে হয়?

বললুম: হ্যাঁ, হাওড়া থেকে তারকেশ্বরের ট্রেন শেওড়াফুলি হয়েই যায়।

স্বাতি ছেলেমানুষের মতো বলে উঠল: একদিন আমরা তারকেশ্বরে যাব।

আমি উত্তর দিলুম হেসে: নিশ্চয়ই যাব।

স্বাতি আমার হাসি দেখে যেন রেগে গেল, বলল: তারপরে বল।

এর পরের স্টেশন হল শ্রীরামপুর। দিনেমাররা এর নাম রেখেছিল ফ্রেড্রিক্স নগর। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এ জায়গা ছেড়ে দিয়ে তারা চলে যাবার পর নামটাও আবার বদলে গেছে। গঙ্গার এপারে শ্রীরামপুর, ওপারে ব্যারাকপুর। গঙ্গার ধারে শ্রীরামপুর কলেজ দেড় শো বছরের পুরনো। সেইখানে দাঁড়িয়েই ওপারে লাট সাহেবের বাগান দেখতে পাওয়া যায়।

স্বাতি বলল: কেরি সাহেবদের কথা কিছু বলবে না?

বললুম: সে কথা বলতে গেলে হাওড়া পৌঁছবার আগে শেষ হবে না।

কেন?

ঐ তিনজন ব্যাপ্‌টিস্ট্‌ মিশনারী অসাধ্য সাধন করেছিলেন। শুধু বাঙলায় নয়, চৌত্রিশটি প্রাচ্য ভাষায় তাঁরা বাইবেলের অনুবাদ করেছিলেন। শ্রীরামপুরের কলেজ কেরি সাহেবই প্রতিষ্ঠা করেন, আর যুব আন্দোলনও হয়েছে তাঁদের জন্যে। তারই

ফলে এদেশে ওয়াই. এম. সি. এ. গড়ে উঠেছে এক শো বছরেরও বেশি আগে।

কথা বলতে বলতেই আমরা শ্রীরামপুরও পেরিয়ে গেলুম। এর পরেই রিষড়া। এক সময়ে এখানে রিষড়া হাউস ছিল। সেখানে ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন বছর চারেক।

আমি বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। তাই কোন্নগর কখন পেরিয়ে গেছি বুঝতে পারি নি। স্বাতি হঠাৎ হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। চমকে উঠে আমি বললুম ঃ কী হল ?

তোমার সাধের উত্তরপাড়া পেরিয়ে গেলাম।

উতোরপাড়া !

কেন, চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামতে নাকি ?

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না।

ডান দিক থেকে বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইন এসে মিলে গেল, ডানকুনি থেকে শিয়ালদহর লাইন চলে গেল মাথার উপর দিয়ে। গঙ্গার এপারে বালি স্টেশন, ওপারে দক্ষিণেশ্বর। বালির পরেই বেলুড়। বেলুড় মঠ আর দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির—দুইই শান্তির জায়গা। লিলুয়ার রেল কারখানা ছাড়িয়ে ঘুসরির ভোটবাজার মন্দিরও শান্তির জায়গা। প্রায় দু শো বছর আগে ওয়ারেন হেস্টিংস তিব্বতের তাশি লামার অনুরোধে এই গোম্ফাটি নির্মাণ করেছিলেন।

কিন্তু একি ! এবারে যে ট্রেন সত্যিই থামছে ! লিলুয়ার প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। সব স্টেশনেই অসংখ্য যাত্রী লোকাল ট্রেনের অপেক্ষা করছে। যাত্রীদের দিকে চেয়েই স্বাতি চেঁচিয়ে উঠল ঃ আরে, হালদার মশাই যে ! উঠে আসুন এই গাড়িতে।

আশ্চর্য হয়ে আমি দেখলুম, কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার হাতে একটা পুঁটুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্বাতির চিৎকারে মুখ ফিরিয়েই আমাদের দেখতে পেলেন। বললেন ঃ কী ব্যাপার বলুন তো !

বলেই ছুটে এলেন গাড়ির দরজার দিকে।

৮

ট্রেন আচমকা দাঁড়িয়েছিল, ছেড়ে ছিলও আচমকা। কিন্তু হালদার মশাই কায়দা করে ঠিক উঠে পড়লেন এবং আমাদের পাশে এসে ধপাস করে বসে পড়লেন।

স্বাতি যে কখন বিছানাপত্র গুটিয়ে বেঁধে ফেলেছিল, আমি তা লক্ষ্য করি নি। কিন্তু হালদার মশায়ের দৃষ্টি প্রথমে সেদিকেই পড়ল। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোথা থেকে আসছেন ?

স্বাতিই এ প্রশ্নের উত্তর দিল। বলল ঃ গঙ্গার ওপার থেকে।

হালদার মশাই খুবই আশ্চর্য হলেন। একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন, তারপরে স্বাতির মাথার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করবার পরে বললেন ঃ তাই বুঝি !

বুঝতে পারলুম যে ভদ্রলোক এর পরে কী বলবেন তা বুঝতে পারছেন না। সত্যিই তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল।

হালদার মশায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে যাবার সময়। গোদাবরী নদীতে তীর্থ সেরে তিনি ট্রেনে উঠেছিলেন। ট্রেনের কামরায় তাঁর সঙ্গে আলাপ। তারপরে দেখা হয় রামেশ্বরের ধর্মশালায়, সে এক নাটকীয় ঘটনা। হালদার মশাইকে মামা আগে থেকেই চিনতেন। কুৎসা রটানোর স্বভাবের জন্যে ভয়ও পেতেন তাঁকে। আর মামী সেই ভয়েই আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, ভাল করে কথা বলেন নি অনেক দিন। যে ভয় তিনি পেয়েছিলেন, যে কারণেই হোক তা সত্যে পরিণত হয়েছিল। অগ্রহায়ণে স্বাতির বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল।

তারপরে হালদার মশায়ের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে পুষ্করে,

দ্বারকায় ও সোমনাথের পথে। জো রায়ের সঙ্গে স্বাতির নতুন সম্বন্ধের সূচনাও তিনি জেনেছিলেন। দু পক্ষই ভয় পেয়েছিলেন। স্বামী সতর্ক হয়েছিলেন, আর জো রায় ঘুষ দিয়েছিল হালদার মশাইকে। কিন্তু এই ভদ্রলোককে আমার খারাপ লাগে নি। বরং তাঁকে ভাল লেগেছিল পুরীর সমুদ্রবেলায়। মনে হয়েছিল যে তিনি আমার ভাল করতে চেয়েছিলেন আমারই অজ্ঞাতসারে।

তবু আমি স্বাতির আজকের আচরণে আশ্চর্য হলুম। বেশ খানিকটা সরে হালদার মশাইকে বসবার জায়গা দিয়ে বলল: সাত-সকালে কোথায় এসেছিলেন হালদার মশাই ?

হালদার মশাই তখন তার মাথার সিঁথির দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। চোখ নামিয়ে বললেন: কাল রাতে এক যজমানের বাড়ি সত্যনারায়ণ পূজো করতে এসেছিলুম।

কাল রাতে!

বলে স্বাতি হালদার মশায়ের দিকে তাকাল।

ভদ্রলোক বললেনঃ হ্যাঁ। কিন্তু রাতে আর ফিরবার সাহস হল না। যা অবস্থা হয়েছে কলকাতার! কখন যে কোথায় কী বিপদ হয়—

বলে তিনি সমর্থনের জন্যে আমার দিকে তাকালেন।

বললুমঃ তা তো ঠিকই।

উৎসাহ পেয়ে ভদ্রলোক বললেনঃ যজমানও তেমনি। ভেবেছিল যে মিষ্টি কথায় বাড়ি থেকে বার করে দেবে। শোবার ঘর নেই, বিছানা নেই। একখানা মাদুরও নাকি নেই। কিন্তু কালীকেষ্ট হালদারকে তো চেনে না। গলাধাক্কা দিয়েও যে বার করতে পারবে না, সে কথা পরে বুঝল। বারান্দায় মেঝের উপরেই শুয়ে পড়ছি দেখে সবই বার করল।

তারপরেই তাঁর নোংরা দাঁত আকর্ণ বিস্তার করে বললেনঃ আপনার মামা আমাকে গোড়া থেকেই চেনেন।

তাঁর কথা শুনে আমিও একটু হাসবার চেষ্টা করলুম।

কিন্তু হালদার মশাই এ দিক সে দিক চেয়ে বললেনঃ তাঁরা কোথায়?

আমি এর উত্তর কী দেব ভেবে পাচ্ছিলুম না। কিন্তু স্বাতি তৎপর ভাবে বললঃ এ যাত্রায় আমরাই দুজন। ওঁরা দিল্লীতে আছেন।

হালদার মশায়ের এ কথা যেন বিশ্বাস হল না। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন স্বাতির মুখের দিকে।

স্বাতি অপ্রতিভ বোধ করল না। বললঃ দেখছেন না ওকে! দার্জিলিঙের পথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। খবর পেয়ে আমি ওকে দার্জিলিঙের হাসপাতাল থেকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি।

এবারে যেন হালদার মশাই অপ্রতিভ বোধ করলেন। আমার হাতের দিকে চেয়ে বললেনঃ এ কি, হাতটা যে আপনার বাঁধা দেখছি!

স্বাতি বললঃ আপনাকে যখন পেয়েছি, তখন আজ চট করে ছেড়ে দেব না।

ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন স্বাতির মুখের দিকে।

স্বাতি বললঃ ওকেও উতোরপাড়ায় নামতে দিই নি, আপনাকেও এ বেলায় কালীঘাটে যেতে দেব না। দুপুরে আমাদের বাড়ি খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে বিকেলে ফিরবেন।

খাওয়াদাওয়ার নামে হালদার মশাই বেশ উৎসাহ বোধ করলেন। বললেনঃ আপনাদের বাড়িতে এখন—

বাধা দিয়ে স্বাতি বললঃ আপনি নয়, আমাকে তুমিই বলবেন।

হেঁ-হেঁ করে হাসলেন হালদার মশাই। বললেনঃ তাতে একটু সুবিধে হবে বৈকি। ছোট থেকেই তো দেখছি!

কেন জানি না, স্বাতির এই প্রগল্‌ভতায় ভারি বিরক্ত বোধ করছিলুম আমি। কেন যে সে এই মানুষটার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার

চেষ্টা করছে, তা বুঝতে পারছিলুম না। এ ঘটনা জানতে পারলে মামা মামী খুবই অসন্তুষ্ট হবেন। আর সত্যি কথা বলতে কি, লিলুয়ার প্ল্যাটফর্মে স্বাতি তাঁকে না ডাকলে তিনি আমাদের দেখতেই পেতেন না। স্বাতি সাধ করে একটা বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েছে।

তা আপনাদের অসুবিধা হবে না তো?

বলে হালদার মশাই আমার মুখের দিকে তাকালেন।

সুবিধা অসুবিধার কথা আমি জানি নে। তবু বলতে হল: অসুবিধা কিসের!

আর স্বাতি বলে উঠল: আপনি তো আমাদের পর নন! আপনি সঙ্গে থাকলেই আমাদের সুবিধে।

কৃতজ্ঞতায় হালদার মশাই যেন গলে গেলেন। হেঁ-হেঁ করে হেসে বললেন: সবাই এ জিনিসটা ঠিক বোঝে না। অন্য বাড়ির মানুষকে আপন ভাবতে কিছুতেই পারে না।

তারপরেই বললেন: মানুষকে আপন ভাবা একটা গুণের কথা। যত বড় মানুষ, তত বেশি লোককে আপন ভাবতে পারে।

খুব সত্যি কথা। নিজের অজ্ঞাতসারেই মানুষ এমনি এক একটি সত্যি কথা বলে। আমি কোন উত্তর দিলুম না। কিন্তু স্বাতি বলল: আপনি একটু বাড়িয়ে বলছেন। মানুষকে আপন না ভাবাই দোষের কথা।

লিলুয়া ছাড়বার পরে ট্রেন একটু ধীরে ধীরেই চলছিল। সেই পরিচিত দৃশ্য। এই দৃশ্য আমি যাতায়াতের পথে প্রতি দিন দেখি। আজ অনেক দিন পরে এই পথে যেতে যেতে মন এক রকমের অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠল।

এই তো সন্ট গোলা। ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল এইখানে। থ্রু ট্রেন এখানে একটু দাঁড়াবেই। লোকাল ট্রেনে যেতে যেতে থ্রু ট্রেনকে এখানে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। এখানে একটুখানি না দাঁড়ালে থ্রু ট্রেনের জাত যেন থাকে না।

হালদার মশাই কিন্তু এ সবে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বললেন : গোঁসাইজী কি তাহলে দিল্লীতেই রয়ে গেলেন, না কলকাতায় এসে আবার বসবাস করবেন ?

স্বাতি বলল : কত দিন আর থাকবেন !

তা অনেক দিন তো হল ! এবারে ফেরাই দরকার।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে। এবারে বোধহয় আর কোথাও দাঁড়াবে না। সোজা গিয়ে প্ল্যাটফর্মে থামবে। না, বাঁ ধার ঘেঁষে লোকাল ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে যাবে না এই ট্রেন। এ ট্রেন ক্যাব্ রোডের ধারে কোনও প্ল্যাটফর্মেও দাঁড়াবে না। হাওড়া স্টেশনের ভিতরে প্রাইভেট গাড়ি চলাচলের জন্যে যে সুন্দর প্রশস্ত রাস্তাটি আছে, তারই ছু ধার থেকে ছাড়ে দূরগামী মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন। সেই সব ট্রেনই এসে থামে সেখানে। নিজেদের গাড়িতে আত্মীয় বন্ধুরা যাত্রীদের তুলে দিতে আসে, নিতেও আসে। ক্যাব্ রোডের ছু ধারে গাড়ি রাখে তারা। স্টেশনের ভিতরে ঢোকবার জন্যে গেটের বাইরে টিকিট কাটতে হয়। কিছু দিন আগে গাড়ির জন্যে টিকিট ছিল আট আনার। এখন এক টাকা থেকে ছু টাকা হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় গাড়ির সংখ্যা তবু কমে নি। আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি গাড়ি দাঁড় করাবার জায়গা পাওয়া ভার।

একটা একটা করে ছুটো পুলের নিচে দিয়ে আমরা চলে এলুম। বালি স্টেশনের ধারেও আমরা একটি পুলের নিচে দিয়ে এসেছি। সেটা রেলের পুল। ওপর দিয়ে ট্রেন ডানকুনি থেকে দক্ষিণেশ্বর হয়ে শিয়ালদহে যায়। এখানে গাড়ি ঘোড়া চলবার জন্যে সড়কের পুল। তারপরেই প্ল্যাটফর্ম।

শুধু ইস্টার্ন রেলের ট্রেন নয়। খড়্গপুরের দিক থেকে আসে সাউথ ইস্টার্ন রেলের ট্রেন। খালি ট্রেনগুলো সাঁতরাগাছিতে ফিরে যায়। ওসব ট্রেন যাতায়াত করে স্টেশনের ডান ধার থেকে।

খানিকটা তফাতে ছোট লাইনের স্টেশন হাওড়া ময়দান। একটু নজর রাখলে সে স্টেশনটিও দেখতে পাওয়া যায়। হাওড়া থেকে আমতা বা শিয়াখালা যায় সেই ট্রেন। সে ট্রেনে যাত্রার অভিজ্ঞতা বিভূতিবাবুর বইএ পড়েছি।

এইবারে আমাদের ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াচ্ছে। বড় নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে স্বাতিকে। হালদার মশায়ের মুখেও কোন ভাবনার চিহ্ন নেই। না থাকবারই কথা। তাঁর নিজের বাড়ি আছে কালীঘাটে। স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে। তিনি বাড়ি ফিরছেন। কিন্তু স্বাতি আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে! কোথায় থাকবে আমাকে নিয়ে! কলকাতার সমাজে কি তার কোন ভাবনা নেই! ছুজনকে এক জায়গায় দেখে কেউ কি কোন মন্তব্য করবে না! কোন সন্দেহ! কোন নিন্দা! কেউ কোন কলঙ্ক আরোপ করবে না!

হালদার মশাই যেন এই কথাই ভাবছিলেন। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় উঠবেন আপনি?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর ভেবে পাবার আগেই স্বাতি বলল: আমাদের বাড়িতেই এখন থাকবে।

হালদার মশাই বোধহয় এমনটি ভাবতে পারেন নি। একটু থমকে গেলেন। তারপরেই বললেন: ঠিকই তো। অত বড় বাড়ি থাকতে অন্যত্র যাবার দরকার কী!

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসল। ভারি অর্থপূর্ণ এই হাসি। আমার মনে হল যে এই হাসি দিয়ে একটি পরম সত্য সে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল।—হালদার মশাইকে ভয় পাবার দরকার কী! বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেবেন তিনি! কার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাঙবেন! তাতে কি কোন ক্ষতি হবে আমাদের!

কিন্তু আর কিছু ভাববার আমি সময় পেলুম না। ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে। আর জানালা দিয়ে এক ভদ্রলোককে দেখতে পেয়েই স্বাতি বলে উঠল: আমরা এই গাড়িতে সুবলদা।

শীর্ণ দেহের অধিকারী এই বুড়ো ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর বেশ সচল। হাত জুড়ে নমস্কার করে বললেনঃ স্টেশনের ভেতরেই গাড়ি রেখেছি দিদি।

স্বাতির ব্যবস্থা দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। কখন কোথা থেকে সে এই ব্যবস্থা করেছে, তা জানতেও পারি নি।'

হালদার মশাইও খুশী হয়ে বললেনঃ তাহলে তো আমাকেও আর ট্রামে বাসে উঠতে হবে না।

সহাস্যে স্বাতি বলল ঃ বলেছি তো, আজ দুপুরে আপনাকে না খাইয়ে ছাড়ব না।

একে একে আমরা নেমে পড়লুম।

৯

ক্যাব্ রোডে মামার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। পুরনো অস্টিন গাড়ি। জমিদারী যাবার আগে তিনি এই গাড়ি নতুন কিনেছিলেন। তাই এখনও বেশি পুরনো হয় নি। বিদেশী গাড়ি বলে খানিকটা আভিজাত্যও আছে। মালপত্র পিছনে তুলে নিয়ে আমরা গাড়িতে উঠে বসলুম। হালদার মশাই আমাদের সঙ্গে পিছনের সীটে বসলেন। সুবলবাবু বসলেন সামনে ড্রাইভারের পাশে।

আজ কেমন একটু নূতনত্ব বোধ হল। মামা মামীর সঙ্গে ভারত পরিক্রমায় ড্রাইভারের সঙ্গে ঐ সীটটি আমার জন্যেই নির্ধারিত ছিল। মামা মামী স্বাতিকে নিয়ে পিছনে বসতেন। আজ তাঁরা উপস্থিত নেই বলেই আমি স্বাতির পাশে বসবার অধিকার পেয়েছি। বসেছি মাঝখানে। আমার অন্য পাশে বসেছেন হালদার মশাই। স্বাতিই কৌশলে আমাকে মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে গাড়ি পুলের উপরে উঠল। তারপরে ডান দিকে ফিরে খানিকটা এগিয়েই আবার ডান দিকে মোড় নিয়ে পুলের উপর থেকে নেমে এল। এ হল হাওড়া জেলার প্রধান শহর হাওড়া। এর পর হাওড়ার বিরাট পুল পেরিয়ে কলকাতা চব্বিশ পরগণা জেলার প্রধান শহর। এই দুই জেলার মধ্যে গঙ্গা সগৌরবে প্রবাহিত হচ্ছে। শুধু এই জেলার মাঝখান দিয়ে নয়, দুই বিভাগের মধ্য দিয়ে—বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ। উত্তরের দিকে গঙ্গা মুর্শিদাবাদ জেলাকে দু ভাগে বিভক্ত করেছে।

দেখতে না দেখতেই আমাদের গাড়ি হাওড়ার পুলের উপরে উঠে পড়ল। বিরাট প্রশস্ত পুল। দু ধার দিয়ে অসংখ্য গাড়ি চলছে, মাঝখানে ট্রাম লাইন।

এই পুলের উপরের দিকে চেয়ে আমি চিরকালই আশ্চর্য হই। এত উঁচু লোহার ফ্রেমের কী দরকার ছিল ভেবে পাই না। নদীর মাঝখানে কোন থাম নেই। স্বচ্ছন্দে জাহাজ চলাচলের জন্যে এই পুল অনেক উঁচুতে। এর ভার ধারণের জন্যেই লোহার ফ্রেম বোধহয় আরও উঁচু করা হয়েছে।

আমার দৃষ্টি বোধহয় পুলের দিকে আবদ্ধ হয়েছিল। তাই দেখে স্বাতি বলল: মনোযোগ দিয়ে দেখছ তো! তাই দেখ।

তার এই মন্তব্য শুনে আমি আশ্চর্য হলুম। আর হালদার মশাই বললেন: এই পুল তো গোপালবাবু নিত্যি তিরিশ দিন দুবার করে দেখছেন!

স্বাতি বলল: সে তো দেখব বলে দেখা নয়! ওকে এখন নতুন চোখে কলকাতাকে দেখতে হবে—যে চোখে সারা ভারতবর্ষ দেখেছে, সেই চোখে।

হালদার মশাই কিছু আশ্চর্য হয়ে স্বাতির মুখের দিকে তাকালেন।

তাই দেখে স্বাতি বলল: কলকাতার সম্বন্ধে কিছু লিখতে হলে কলকাতাবাসীর চোখে দেখলে চলবে না, দেখতে হবে বিদেশীর চোখে। তবেই তো কলকাতার মাহাত্ম্য ধরা পড়বে। ঠিক বলছি না?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি হেসে বললুম: বিদেশীর চোখেই তো হাওড়ার পুলটা আজ দেখছি। আর আশ্চর্য হচ্ছি এর গড়ন দেখে।

ঘট ঘট ঘড়াং করে আমরা হাওড়া পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছিলুম। স্বাতি বলল: শুনেছি এটা ক্যান্টিলিভার ব্রিজ।

এই নামটি শুনেই আমার একটি পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। লছমনঝুলার পুলের কথা বলতে গিয়ে একজন সাহিত্যিক তাকে ক্যান্টিলিভার ব্রিজ বলেছিলেন। তাঁর পাঠকেরাই প্রতিবাদ করে জানিয়েছিল যে পাহাড়ের গা থেকে ঝোলানো পুলকে ক্যান্টিলিভার

ব্রিজ বলে না। ক্যান্টিলিভার ব্রিজের উদাহরণ হল হাওড়ার এই পুল। নদীর দু ধারে শক্ত মাটিতে দুটো মজবুত স্তম্ভ তৈরি করে দুটো লোহার হাত নদীর দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে। পুলের মাঝখানের অংশ সেই হাত দুটো ধরে থাকবে। এই হাত দুটোকে বলে ক্যান্টিলিভার আর্ম।

বয়োবৃদ্ধরা এখনও বলেন যে এ পুল তো এই সেদিন তৈরি হয়েছে। এর আগে ছিল পন্‌টুন পুল। সেই পুরনো পুল দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। এই নতুন পুলই আমাদের কাছে পুরনো হয়ে গেছে। নতুন পুল বলতে আমরা বুঝি, যে পুল তৈরির উদ্যোগের কথা খবরের কাগজে এখন সাড়ম্বরে বেরোচ্ছে।

হালদার মশাই তখন স্বাতির কথার উত্তর দিচ্ছিলেন: পুলের জাত ধর্ম তো বুঝি না, বয়সটা বুঝি। কলকাতার উপরে জাপানীরা বোমা ফেলেছিল কবে ?

বলে তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

স্বাতি হেসে বলল: সে আমাদের কাছে ইতিহাসের কথা। বোধহয় ১৯৪১-৪২ সালের শীতকালে। কিংবা তার কিছু পরে।

হালদার মশাই এ নিয়ে মাথা ঘামালেন না। বললেন: সে বছরও আমরা নৌকোর পুলের ওপর দিয়েই গঙ্গা পার হয়েছি। সে পুল জলের উপর ভাসত।

এ পুল তৈরির কথা আমি জানি। ছ বছর ধরে তৈরি হয়েছিল আড়াই কোটি পাউণ্ড খরচে। ১৯৪৩ সাল থেকে এই পুলের উপর দিয়ে গাড়িঘোড়া চলছে। এর মাপজোখের কথাও আমি বইএ পড়েছি। গঙ্গা এখানে প্রায় দেড় হাজার ফুট প্রশস্ত। পুরনো পুলটা এত বড়ই ছিল। নতুন পুলের মাপও প্রায় তাই। দুটো হাত আর মাঝখানের অংশ প্রায় সমান সমান। কিন্তু শক্ত মাটির উপরে যে অংশ আছে, তা নিয়ে গোটা পুলের মাপ দু হাজার দেড় শো ফুট।

কিন্তু এ সব কথা আমি বললুম না। স্বাতি হয়তো হাসত আমার কথা শুনে। আর হালদার মশাইও আমাকে কিছু বলবার সুযোগ দিলেন না। বললেন: কলকাতাকে নতুন চোখে দেখতে হলে এক দিন রাতে আপনি হাওড়া স্টেশনে এসে থাকুন।

কেন বলুন তো?

পরম কৌতুকে হালদার মশাই বললেন: হাওড়া স্টেশনকে আপনি চিনতে পারবেন না।

বলে রহস্যময় চোখে আমার দিকে তাকালেন।

কিন্তু আমি কোন প্রশ্ন করলুম না দেখে বললেন: ট্রেনে ওঠা-নামার জন্যে বছরের তিন শো পঁয়ষট্টি দিন যা দেখছেন, প্রতি রাত্রে ঠিক তার উল্টোটি দেখবেন। রাত এগারোটার পর থেকে ভোর প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত এমন ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে যে মনে হবে স্টেশনটা যেন মরে গেছে। জনমানব নেই, সাড়াশব্দ নেই—সত্যি বলতে কি, আমার তো রীতিমতো গা ছমছম করেছিল।

তারপরে একটি গল্প আমাদের শোনালেন। একদিন এক যজমানের বাড়ি থেকে ফিরতে তাঁর দেরি হয়ে গিয়েছিল। ট্রেন আটকে গিয়েছিল কোথাও। হাওড়া থেকে কালীঘাটে ফেরবার ট্রাম বাস আর পান নি। কলকাতার অন্ধকার রাস্তায় পায়ে হেঁটে পথ চলা তখন নিরাপদ নয় ভেবে স্টেশনেই রাত কাটিয়ে-ছিলেন। তাঁর সেই রাতের অভিজ্ঞতার কথা।

তখন আমরা কলকাতার পথ ধরেছি। এখনও সকালের আলস্য পুরোপুরি ত্যাগ করে ব্যস্ততায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে নি এই মহানগরী। আর কিছুক্ষণ পরেই এই সব পথঘাটের রূপ একেবারে অন্য রকম হয়ে যাবে।

সুবলবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল স্বাতিদের বাড়ির পথে। মামার জমিদারীর ইনি পুরনো গোমস্তা। সরকারী আইনে জমিদারী বিলোপের সময় নিজের জায়গায় ছেলের নাম লিখেছিলেন

কর্মচারীদের নামের খাতায়। নিজের বদলে ছেলের সরকারী চাকরি হল। তিনি আশ্রয় নিলেন মামার বসতবাড়ির একাংশে। পেনসন ভোগ করবেন, আর বাড়ির দেখাশোনা করবেন। গত কয়েক বছর তাঁর এই ভাবেই চলছে। মামাও তাঁর উপরে কলকাতার সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দিল্লীতে বসবাস করছেন। কলকাতায় এলে খবর দিয়ে আসেন। স্বাতিও খবর দিয়েছে 'তার' করে। সেই 'তার' পেয়েই সুবলবাবু হাওড়া স্টেশনে এসেছেন গাড়ি নিয়ে।

এর আগে সুবলবাবুকে আমি দেখি নি। দেখবার সুযোগ হয় নি। মামার সঙ্গে দেখা করতে আমি একবারই তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলুম। তাঁর সঙ্গে দেখা করেই ফিরে এসেছি। আত্ম-সম্মানে আঘাত লেগেছিল ভেবে আর কখনও ওদিকে যাই নি। সে কয়েক বছর আগের ঘটনা। তারপরে দেখা হয়েছে হাওড়া স্টেশনে। সুবলবাবু সেদিন হাওড়া স্টেশনে ছিলেন না, সঙ্গে এসেছিল রামখেলাওন। সেও ভিড়ের ভিতর হারিয়ে গিয়েছিল। আর সেই অসহায় অবস্থায় মামা আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। সেদিন আমার ভাগ্যের আকাশে কোন্ গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ ঘটেছিল আমি জানি না। স্বাতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল সেই দিন। তারপর সারা ভারতবর্ষ দেখলুম তার সঙ্গে। আজ আবার তার সঙ্গেই তাদের বাড়ি যাচ্ছি।

আমাদের এই পরিচয় কত দিনের পুরনো তা ভাবতে ইচ্ছা হল। না, এ হিসেব করা খুব কঠিন কাজ নয়। এক দুই তিন, তিনটে পূজো আমরা দেখলুম। তার মানে দু বছরের কিছু বেশি আগে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। প্রথমবারের পূজো আমাদের দক্ষিণ ভারতে কেটেছে। সেই সময়েই শুনেছিলুম যে স্বাতির বিয়ে হবে সামনের অগ্রহায়ণে। মামী তার জন্যে তৈরি হতে চাইছিলেন, কিন্তু মামার খুব বেশি উৎসাহ ছিল না। আর স্বাতির বীতরাগের

কথা তো আমি তার মুখেই শুনেছি। সে বলেছিল, আট বছর বিলেতে কাটিয়ে লোকটা সাহেবীআনা এনেছে সঙ্গে করে, সহধর্মিণীর চেয়ে বান্ধবীর প্রয়োজন তার বেশি।

এ বিয়েটা কেন হল না, আমি তা জানতে পারি নি। মামী বোধহয় হালদার মশাইকেই সন্দেহ করেছিলেন যে তিনিই ভাংচি দিয়েছেন রামেশ্বরের সেই ঘটনা নিয়ে। কিন্তু আমি জানি যে এ বিয়ে ভেঙে না গেলে স্বাতি নিজেই তা ভেঙে দিত। মামা নিজেই আপত্তি করেছেন শুনলেও আমি আশ্চর্য হব না।

এর পরের বসন্তকালে আমি দিল্লী এসেছিলুম। এলাহাবাদ থেকে আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন হয়ে দিল্লী। সেখানে আমি ভারত সরকারের তরুণ অফিসার রাণাকে দেখেছিলুম নায়কের ভূমিকায়। স্বাতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টাও দেখে এসেছিলুম।

পূজোর সময় আমার ডাক পড়েছিল রাজস্থান ভ্রমণের জন্যে। দিল্লী থেকে চিঠি লিখে আমাকে ডাকেন নি, ডেকেছিলেন জয়পুর থেকে টেলিগ্রাম করে। কোন বিপদ ঘটেছে ভেবে আমি ছুটে গিয়েছিলুম। তারপরে সব নিরাপদ দেখে তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলুম মামার আগ্রহে। রাজস্থান ছাড়বার আগেই বুঝতে পেরেছিলুম যে রাণার সঙ্গে স্বাতির সম্বন্ধটা পাকা হবে না। রাণার বোন মিত্রাই এ কথা বুঝতে দিয়েছিল যে পিতার বাধ্য পুত্র হিসেবেই রাণা পিছিয়ে গেছে। এই বিয়ে ভাঙার ব্যাপারে হালদার মশায়ের কোন হাতই ছিল না।

রাজস্থান থেকে আমরা সৌরাষ্ট্রে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে বম্বে। নতুন নায়ক জো রায়ের সঙ্গেও পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। হালদার মশাই নিজের চোখে এই সব দেখেছিলেন। জো রায়ের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবও আমি জানতে পেরেছিলুম। কিন্তু এই বিয়ের সম্বন্ধটা পাকা হয়েও কেন ভেঙে গেল, তা তিনি আমাকে বলেন নি। দিল্লী থেকে মামা জানিয়েছিলেন যে জো রায়ের

সঙ্গেই স্বাতির বিয়ে হচ্ছে। আমার সাহায্য চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আমি তাঁর চিঠি পেয়েই পুরীতে পালিয়ে গিয়েছিলুম। একটা অদ্ভুত মানসিক যন্ত্রণায় আমার দিন কাটছিল। সেই যন্ত্রণা থেকে হালদার মশাই আমাকে রক্ষা করেছিলেন। বলেছিলেন, স্বাতির এ সম্বন্ধটাও ভেঙে গেল। এই ব্যাপারে যে তাঁর হাত ছিল, তা তাঁর হাসি দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু স্বাতি তাঁর সাহায্য নিয়েছিল কিনা, আমি তা আজও বুঝতে পারি নি। হালদার মশায়ের সঙ্গে আজ তার ঘনিষ্ঠতা দেখে আজ আবার নতুন করে আমার সন্দেহ জাগল।

এবারের পূজো তো এই সেদিন হল। এবারে আমি ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম বন্ধু মনোরঞ্জনের সঙ্গে। আমার বিয়ে দেবার জন্যে কৌশল করেছিল মনোরঞ্জন। সে কথা বুঝতে পেরে আমি পাটনায় নেমে পড়েছিলুম। তারপরে গয়া হয়ে গিয়েছিলুম বেনারসে। সেখানে আবার ধরা পড়ে গিয়েছিলুম তার জালে। তারপরে একসঙ্গে যেতে হয়েছিল হরিদ্বারে।

কিন্তু বিধির লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। একটা অলৌকিক আকর্ষণে আমাকে মসুরি যেতে হয়েছিল। সেখানেই দেখা হয়েছিল মিত্রার সঙ্গে। চাওলা নামের পাঞ্জাবী বন্ধুকে বিয়ে করে সে পাহাড়ে বেড়াতে এসেছিল। তারাই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল দিল্লীতে।

দিল্লীতে আবার স্বাতিদের সঙ্গে দেখা। তারা হিমাচল ও কাশ্মীর ভ্রমণে যাচ্ছিল। ঘটনাচক্রে আমিও তাদের সঙ্গী হয়ে গেলুম।

কিন্তু আকস্মিক ভাবে আমাকে কাশ্মীর থেকে বিদায় নিতে হল। চাওলার চেষ্টায় চাকরি পেয়ে গেলুম আসামে। সেই চাকরির সূত্রেই আসছিলুম দার্জিলিঙে। পথে দুর্ঘটনা ঘটল। হাসপাতালের ডাক্তারের 'তারে' খবর পেয়ে দিল্লী থেকে স্বাতি এল ছুটে। মামা মামী এলেন না। মামার শরীর খারাপ, হৃদ্‌রোগের সূচনা হয়েছে।

শরীরের চেয়ে মনটাই নাকি বেশি তুর্বল হয়েছে। তাইতেই বোধহয় স্বাতিকে একা ছেড়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। মামী কেমন করে রাজী হলেন, সে কথা স্বাতি আমাকে বলে নি। এই সংবাদের উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ যে নির্ভর করছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্বাতিদের বাড়ি পর্যন্ত পথ আমরা প্রায় নিঃশব্দেই এলুম। বাড়ির কাছাকাছি এসে হালদার মশাই বললেন: এখন আমার বাড়ি গেলেই চলত।

স্বাতি বলল: আপনার চলত, কিন্তু আমার চলত না।

কেন ?

নিজেদের স্বার্থে।

পরম বিস্ময়ে হালদার মশাই স্বাতির মুখের দিকে তাকালেন। আর তাই দেখে সকৌতুকে বলল: ব্রাহ্মণভোজনের পর সব বলব।

হালদার মশাই এর উত্তর দেবার সময় পেলেন না। গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম।

সুবলবাবু যে ঘরদোর ঝেড়ে পুঁছে রাখিয়েছিলেন তা বুঝতে সময় লাগল না। একজন চাকর এগিয়ে এসে মালপত্র নামিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল।

বসবার ঘরে আমাদের বসিয়ে স্বাতি বলল: আমি সব ব্যবস্থা করে এখুনি আসছি। আসুন সুবলদা।

বলে ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

সুবলবাবুকে আমি লক্ষ্য করেছিলুম। ভারি অসহায় দেখাচ্ছিল তাঁকে। কী একটা কথা বলতে পারছিলেন না বলে বোধহয় আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। এইবারে কতকটা আশ্বস্ত হয়ে আমাদের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচলেন।

কিন্তু মিনিট তুয়েক পরেই মহা পুলকে ফিরে এলেন। আমার

দিকে চেয়ে বললেন : আমাকে একটু ছুটি দিতে হবে। গাড়িটা নিয়ে আমি এখুনি ঘুরে আসছি।

বলে তৎপর ভাবে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে ডেকে বললুম : কী ব্যাপার বলুন তো ?

ভদ্রলোক সরল মানুষ। বললেন : রাঁধুনি বামুন নেই বলে বড় ভাবনায় পড়েছিলুম। দিদি বললেন, নিজেই রাঁধবেন। তাই মাছ তবকারি আনতে যাচ্ছি।

বলে আর অপেক্ষা না করেই বেবিয়ে গেলেন।

গম্ভীর ভাবে হালদার মশাই বললেন : এর জন্যেই বলে মায়ের জাত। এঁরা ঘরে থাকলে আর কোন ভাবনা নেই।

এব পরেই বাড়ির চাকর এসে উপস্থিত হল। বলল : নিচের তলায় আপনার ঘর ঠিক কবে দিয়েছি। দিদি ওপর থেকে এখুনি নামবেন।

আমি বললুম : আচ্ছা।

লোকটি চলে যেতেই হালদাব মশাই ফিসফিস করে বললেন : এঁরা ওপর তলায় থাকেন। বাইরের লোক এলে থাকে নিচের তলায়।

ভদ্রলোকের কথা বলার ধরনে আমি হাসলুম। তাঁর গলার আওয়াজ যে উপর তলাতেও পৌঁছবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বললুম : এ ব্যবস্থা তো ভালই। বাইরের লোককে নিজেদের কাছে রাখা ঠিক নয়।

আপনি কি বাইরের লোক ?

বলে ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

আমি কতকটা নির্ভয়ে বললুম : সম্বন্ধটা তো পাতানো, তাই আমাকে বাইরের লোক ভাবাই ভাল।

হয়েছে। আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। অন্তত আমার কাছে এ সব বলবেন না। আমার কি জানতে কিছু বাকি আছে।

বলে হঠাৎ দাঁত বার করে হাসলেন। দৃষ্টি তাঁর সহসা এমন প্রসন্ন হয়ে উঠল যে আমি লজ্জা পেয়ে গেলুম।

অল্পক্ষণ পরেই স্বাতি উপর থেকে নেমে এল। স্নান করে লালপাড় গরদের শাড়ি পরে নেমেছে। ভিজে চুল ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠের উপরে। মামীকে আমি এই বেশে দেখেছি। আজ স্বাতিকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

স্বাতি বলল: হালদার মশাইকে আজ একটু কষ্ট দেব।

কিছু বুঝতে না পেরে তিনি তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল: সকালে শুধু একটুখানি চা খেয়েছি। আপনি রাজী হলে কালীঘাটে মায়ের পূজো দিয়ে এসে আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করব।

হালদার মশাই লাফিয়ে উঠলেন, বললেন: এ তো উত্তম প্রস্তাব। আমার পুঁটুলিটা তাহলে বাড়িতেই নামিয়ে দিয়ে আসব।

তুমিও চল।

বলে স্বাতি আমাকেও সঙ্গে ডেকে নিল।

সুবলবাবু গাড়ির কাছেই অপেক্ষা করছিলেন। বাজারের দু-তিনটি থলে তাঁর হাতে। আমরা কাছে আসতেই বললেন: আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। ফেরার পথে আবার তুলে নেবেন।

আমরা গাড়িতে উঠে বসতেই ড্রাইভার কালীঘাটের দিকে চলল। কলকাতার রাজপথে সকালের রৌদ্র তখন তীব্র হতে শুরু করেছে।

১০

খানিকটা পথ এগিয়েই হালদার মশাই একটা অদ্ভুত আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠলেন। বললেন: দুনিয়ায় মানুষ চেনাই সবচেয়ে শক্ত কাজ।

কেন হালদার মশাই ?

বলে স্বাতি তখনি তার কৌতূহল প্রকাশ করল।

হালদার মশাই বললেন: বয়স তো অনেক হল! এই কালীঘাটের কল্যাণে মানুষও কম দেখলুম না। কিন্তু ঠিক এমনটি কখনও দেখি নি।

এইবারে বুঝতে পারলুম যে তিনি আমাদের কথাই বলছেন। স্বাতিও তা বুঝতে পেরেছিল। তাই আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে একটু হাসল।

হালদার মশাই তা দেখতে পেলেন না। বললেন: ধর্মভাব দেখছি বুড়োদের একচেটে নয়। আর দুঃখের দিনেও যে মানুষ দেবতাকে স্মরণ করে, সে কথাও ঠিক নয়। মানুষের মনটাই হল আসল তীর্থস্থান।

স্বাতি এইবারে হেসে বলল: আজ আপনি ঠিক দার্শনিকের মতো কথা বলছেন দেখছি।

হালদার মশাই গম্ভীর ভাবে বললেন: দেখে দেখেই দার্শনিক হচ্ছি। ঠিক বলছি না গোপালবাবু?

বলে আমার দিকে তাকালেন।

বললুম: ভণ্ডামি নয় কিনা, সেটা যাচাই করে নিশ্চিন্ত হবেন।

আমার এই মন্তব্যে হালদার মশাই রেগে উঠলেন, বললেন: আমার কি এটুকুও বুদ্ধি নেই ভাবেন!

বললুম : তা নয়। বেশি ধর্মজ্ঞান দেখলে আমার মনেই খটকা লাগে।

স্বাতি আমার কথা শুনে হাসল, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করল না।

বাজারের সামনে গাড়ি থামিয়ে সুবলবাবু নেমে গেলেন। ড্রাইভারকে বললেন : দেখো বাপু, আমি ঠিক এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। আমাকে তুলে নিতে ভুলে যেও না যেন।

কালীঘাটের কাছে এসে স্বাতি বলল : আপনার পুঁটুলিটা আগে বাড়িতে নামিয়ে দেবেন নাকি ?

তাহলেই ভাল হয়। সেই সঙ্গে কাপড় গামছাও নিয়ে নেব। অনেক দিন গঙ্গাস্নান করি নি।

হালদার মশাই নিজেই পথ দেখিয়ে গাড়ি এক জায়গায় দাঁড় করালেন। তারপরে নেমে একটা গলির ভিতরে ঢুকে গেলেন। ফিরে এলেন অল্পক্ষণ পরেই। বললেন : গিন্নীকে ব্যাপারটা খুব সংক্ষেপে বলে এলুম।

স্বাতি বলল : কোন্ ব্যাপারটা ?

এই আপনাদের, মানে তোমাদের ব্যাপারটা। শুনে তিনি খুব খুশী। মানে একালের হয়েও ঠিক একালের মতো নয় কিনা।

এবারেও স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল। কিন্তু হালদার মশাই তা দেখতে পেলেন না। তিনি তখন গাড়ির পথ দেখাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একবার বলছিলেন, এই ধারে ; আর একবার, ওই ধারে। তারপর পরিচিত পথে গাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন : এমন জায়গায় গাড়ি রাখো, যেখানে পুলিশের তাড়া খাবে না।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা নেমে পড়লুম।

হালদার মশাই বললেন : তুমি তো মা স্নান করেই বেরিয়েছো, আমি চট করে ছুটো ডুব দিয়ে আসি।

বলে ছুটে গঙ্গার ধারে যাচ্ছিলেন।

স্বাতি বলল: ছুটছেন কেন, আমরাও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

বলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে চলল।

আমি স্নান করব না, স্নানের জন্যে কাপড় গামছা নিয়ে বার হই নি। আর গঙ্গায় স্নান করতে চাইলেও স্বাতি রাজী হত না। আমার হাতের সম্বন্ধে সে খুবই সজ্ঞান। আমি তাদের অনুসরণ করছি দেখে জিজ্ঞাসা করল: ভিড়ের মধ্যে তোমার কষ্ট হবে না তো?

পিছন ফিরে হালদার মশাই বললেন: আমি সামলে্ নিয়ে যাব।

গঙ্গাব ধারে ভিড় ছিল না। আমরা ঘাটের উপরে দাঁড়িয়ে রইলুম, আব হালদার মশাই নেমে গেলেন নিচে। অগভীর জল বেশ নোংরা দেখাচ্ছে। সামান্য স্রোতে ভাসছে নানা জিনিস। যাঁবা স্নান কবছেন, তাঁরা নোংরা জিনিসের ব্যাপারে বেশ সতর্ক আছেন দেখলুম। নিজেদের চারি ধারের জল হাত দিয়ে বারে বারে সরিয়ে ডুব দিচ্ছেন, আর তখনি উঠে পড়ছেন, কোমরে গামছা বেঁধে হালদার মশাইও জলে নেমে পড়লেন।

স্বাতি আমাব মুখের দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে আমি একটা প্রশ্ন দেখতে পেলুম। কিন্তু কোন কথা বললুম না।

আমাকে চিনেছে স্বাতি। তাই একটু হেসে বলল: এইটেই আদি গঙ্গা, তাই না?

বললুম: হ্যাঁ।

গঙ্গা তো আগে এই খাতেই বইতো?

ঠিক কথা।

তারপর?

গঙ্গা অন্য খাতে বইল, যে খাতে এখন বইছে।

স্বাতি আরও কিছু শোনবার জন্যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এবারে আমিও হেসে বললুম : সাহেবরা একে আদি গঙ্গা বলে না, বলে টলিজ নালা, টলি সাহেবের নালা। দু শো বছর আগে মেজর টলি নতুন করে খাল কেটে গঙ্গার জল এনেছিলেন। তাঁরই নামে টালির নালা। টালিগঞ্জ নামও তাঁরই নামে হয়েছে।

গঙ্গা যখন এই খাতে বইত, তখন অরণ্যসঙ্কুল ছিল এই অঞ্চল। সাগরযাত্রী বণিকেরা ঘাটে নৌকো বেঁধে কালী পূজা করে যেত। তাই এই ঘাটের নাম হয়েছিল কালীর ঘাট। সেই কালীর ঘাট নাম এখন কালীঘাট হয়েছে।

জলে ডুব দিয়েই হালদার মশাই উঠে এলেন না। গামছাখানা ভাঁজ করে মাথার উপরে রেখে আহ্নিক করতে লাগলেন। এই অবসরে স্বাতি প্রশ্ন করল : কালীঘাট কি খুব প্রাচীন তীর্থ?

বললুম : তা মনে হয় না। কালীঘাট পীঠস্থান সন্দেহ নেই। সতীর বাম হাতের আঙুল এখানে পড়েছিল। কিন্তু প্রাচীন তীর্থস্থান হলে রামায়ণ বা মহাভারতে এর উল্লেখ থাকত। ভবিষ্যপুরাণে অবশ্য উল্লেখ আছে—গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী সুরধুনী তটে। গোবিন্দপুর হল বর্তমান কলকাতা। তার প্রান্তে গঙ্গাতীরে এই কালী। কালীঘট্ট নাম পাওয়া যায় বৃহন্নীল ও শিবার্চন তন্ত্রে। আর নিগমকল্পের পীঠমালায় এর সীমা নির্দেশ করা আছে। কিন্তু এ সব খুব প্রাচীন গ্রন্থ নয়।

একটু থেমে বললুম : কালীঘাটকে খুব আধুনিক তীর্থও বলব না। আকবর বাদশাহর আমলে যে কালীঘাটের খ্যাতি ছিল তার প্রমাণ আছে। মানসিংহ বাঙলায় আসবার আগেই কবিরাম তাঁর দিগ্বিজয় প্রকাশে এই তীর্থের বর্ণনা করেছিলেন। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে নাকি কালীকোটার উল্লেখ আছে। এই কালীকোটাই বোধহয় কালীঘাট। আর এ কথা মেনে নিলে বলা

যায় যে ইংরেজের দেওয়া ক্যালকাটা নামও হয়েছে কালীকোটা বা কালীঘাট থেকে।

স্বাতি হেসে বলল : এ বোধহয় তোমার মনগড়া কথা।

বললুম : সত্যি কথা তো কারও জানা নেই, সবাই আজকাল মনগড়া কথাই বলছে। আর এই সব মনগড়া কথার মধ্যে একটা কথা সবাই মেনে নিয়েছে যে বৌদ্ধ যুগের অবসানের সময় তন্ত্রমত যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন এই কালীঘাটের অরণ্যে তান্ত্রিক ও কাপালিকরা বসবাস করতেন। তাঁরা এই পীঠস্থান আবিষ্কার করে গুপ্ত ভাবে কালীপুজা করতেন। এই জন্যেই বৃহন্নীল তন্ত্রে গুহ্য কালী বলা হয়েছে।

আরও একটি অনুমান করা হয় যে এই অঞ্চল যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের অধিকারে ছিল। এবং তাঁর কাকা বসন্ত রায় ছিলেন কালীর সেবায়েৎ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য। কালীর জন্যে একটি ছোট মন্দির বোধহয় বসন্ত রায়ই প্রথম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তার পর থেকেই কালীঘাটের খ্যাতি ব্যাপ্ত হতে থাকে।

ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন অপুত্রক। তাঁর দৌহিত্ররাই এখন হালদার নামে পরিচিত।

আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছেন বুঝি ?

বলে হাসিতে আকর্ণ বিস্তার করে হালদার মশাই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলেন। আমি লজ্জা পেয়েছিলুম খুবই, কিন্তু স্বাতি খুব সহজ ভাবে বলল : ওর স্বভাব তো জানেন, সুযোগ পেলেই ইতিহাসের গল্প শুরু করে দেয়।

হালদার মশাই এ কথার প্রতিবাদ করে বললেন : শুধু শুধু গোপালবাবুর দোষ দিচ্ছ কেন মা ! তোমরা শুনতে ভালবাস বলেই তো গোপালবাবু এ সব গল্প বলেন।

স্বাতি যে এবারে লজ্জা পেল, আমি তার মুখের দিকে চেয়েই তা বুঝতে পারলুম।

হালদার মশাই কিন্তু সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না, নিজের ভিজে কাপড়খানা পায়ের উপরে নিংড়ে গামছায় জড়িয়ে রাখলেন। তারপরে বললেন: কালীঘাটের ইতিহাস আমিই বলতে পারব।

তারপরে ভদ্রলোক আমাদের এমন অনেক খবর দিলেন যা কোন ইতিহাসের বইএ নেই। এই গঙ্গার ঘাট নাকি ছু শো বছর আগে হুজুরিমল নির্মাণ করে দিয়েছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাকি এই হুজুরিমলকে কালীঘাটের দেবত্র জমির বারো বিঘে দান করেছিল। আর সেই জন্যেই তিনি এই ঘাট আর একটি শিবমন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। শ্মশানের বড় বিশ্রামের ঘর ও শিবমন্দির তৈরি করিয়ে দেন হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক শশিভূষণ বসু। আর ঐ শ্মশানের ঘাট, যাতায়াতের পথ আর বিশ্রামের একটি ঘর প্রাণকৃষ্ণ হালদারের মা বিশ্বময়ী দেবীর টাকায় তৈরি।

তারপরে মন্দিরের দিকে পা বাড়িয়ে হালদার মশাই বললেন: গঙ্গার এই ঘাট থেকে মন্দিরে যাতায়াতের পথ প্রথমে তৈরি করে দিয়েছেন জোড়াসাঁকোর রামচন্দ্র পাল ও পরে গোবর্ধনদাস আগরওয়ালের টাকায় তৈরি হয়েছে। এ সবই প্রায় এক শো বছর আগের ঘটনা।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে সহাস্যে বলল: হালদার মশাই যে তোমাকে হারিয়ে দিলেন দেখছি!

কিন্তু আমি এর উত্তর দেবার আগেই হালদার মশাই বললেন: এখনি কী হয়েছে! আরও অনেক নাম বলব।

সত্যিই অনেক নাম বললেন। আমি জানতুম যে বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীরা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। কিন্তু হালদার মশাই বললেন সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায়ের তখন দক্ষিণ কলকাতায় প্রবল প্রতিপত্তি। কিন্তু কালীঘাটের মন্দিরের খুবই জীর্ণ দশা। হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্ত সেই সময়ে কলকাতার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে পঁচিশ হাজার টাকা বিদায়

দিলেন। ঐ টাকাতেই সন্তোষ রায় নতুন মন্দির তৈরি আরম্ভ করেন। কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি। তাঁর ছেলে রামনাথ রায় ও ভাইপো রাজীবলোচন রায় পাঁচ ছ বছর পর ১৮০৯ সালে মন্দির তৈরি শেষ করেন।

তারপরেই আমাকে বললেন: দুঃখের কথা কি জানেন! সবাই বলে এই মন্দির সাবর্ণ চৌধুরী সন্তোষ রায়ের তৈরি; কিন্তু যে কালীপ্রসাদ দত্ত সেদিন পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছিল, তার নাম কেউ করে না।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আর আমি বললুম: এ খবর আমার জানা ছিল না।

হালদার মশাই সগৌরবে বললেন: কালীঘাটের কথায় এ কথাটা লিখে দেবেন। আর আমার নামটাও করবেন সেখানে। কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি প্রমাণ দেব। সন্তোষ রায়ের ভয়ে ব্রাহ্মণরা সেদিন কালীপ্রসাদ দত্তর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে যেতে সাহস পায় নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুমতি নিয়েই গিয়েছিল। কাজেই বুঝতেই পারেন, কার টাকায় মন্দির হল, আর নাম হল কার।

আমি বললুম: সন্তোষ রায়ের টাকাই বোধ হয় বেশি ছিল!

ছাই।

বলে হালদার মশাই আরও সব নাম বলতে লাগলেন: এই কালীপুরীর তোরণদ্বার নহবৎখানা আর দুটো ভোগের ঘর তৈরি হয়েছে গোরক্ষপুরের টীকা রায়ের টাকায়, নাটমন্দির তৈরি করে দিয়েছেন আন্দুলের জমিদার রাজা কালীনাথ রায়।

আরও কয়েকটি ভোগের ঘর কার কার টাকায় তৈরি হয়েছে সে সব নামও বললেন।

কথায় কথায় আমরা মন্দিরের কাছেই পৌঁছে গিয়েছিলুম, এবং তা লক্ষ্য করেই হালদার মশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। স্বাতি বলল: তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি পুজোটা দিয়ে আসি।

বলে হালদার মশায়ের সঙ্গে স্বাতি পূজোর উপকরণ সংগ্রহে এগিয়ে গেল।

স্বাতি যখন পূজো দিয়ে ফিরল, তখন তুজনেরই মুখ আনন্দে উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। হালদার মশাই বললেন: মায়ের দর্শন হয়েছে, না একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন?

তারপরেই বললেন: বুঝেছি। আসুন আমার সঙ্গে।

বলে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিচে থেকেই দর্শনের ব্যবস্থা করে দিলেন। নিচে দাঁড়িয়েই আমি মা কালীকে প্রণাম করলুম। মুখ তুলতেই হালদার মশাই বললেন: মাকে দেখলেন তো?

বললুম: দেখলুম।

হালদার মশাই বললেন: আপনার দেখা হল না।

কেন?

ভদ্রলোক কৌতুকের হাসি হেসে বললেন: ঐ যে মায়ের মুখ দেখছেন ও মুখ ব্রহ্মার সৃষ্টি। মাথার সোনার মুকুট দিয়েছেন বেলেঘাটার রামনারায়ণ সরকার। মাথার উপরে রূপোর ছাতা দিয়েছেন নেপালের সেনাপতি জং বাহাতুর রাণা। গায়ের অলঙ্কারগুলি কে কে দিয়েছেন তাও শুনুন। খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল প্রথমে চারটি রূপোর হাত দিয়েছিলেন, পরে সোনার হাত তৈরি করে দিয়েছেন কালীচরণ মল্লিক। ঐ হাতে সোনার কঙ্কণ পরিয়ে দিয়েছেন চড়কডাঙার রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। মায়ের সোনার জিভ দেখতে পাচ্ছেন তো?

বললুম: পাচ্ছি।

ঐ জিভ দিয়েছেন পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। মায়ের সোনার ভ্রূ, হাতে অসুরের মুণ্ড, আরও অনেক অলঙ্কার নানা জনে দিয়েছেন।

বললুম: মায়ের পুরনো অলঙ্কার নাকি সব চুরি হয়ে গিয়েছে?

হালদার মশাই বললেনঃ সে প্রায় এক শো বছর আগে। তারপরে ধনী লোকেরা আবার সব গড়িয়ে দিয়েছে।

বলে আমাদের মন্দিরের পশ্চিম ধারে শ্যামরায়ের মন্দিরের সামনে নিয়ে এলেন। বললেনঃ শ্যামরায়ের এই বিগ্রহ হল আমাদেরই পূর্বপুরুষ ভবানীদাসের। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব, মায়ের মন্দিরের ভিতরেই ছিল এই বিগ্রহ। আড়াই শো বছর আগে মুর্শিদাবাদের এক কানুনগো কালী মন্দিরে শ্যামরায়কে দেখে শ্যামরায়ের জন্যে আলাদা একটি ঘর তৈরি করে দেন। ১৮৪৩ সালে বর্তমান মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন বাওয়ালির জমিদার উদয়নারায়ণ মণ্ডল। আর এই যে দোলমঞ্চ দেখছেন, এটা শাহনগরের মদন কোলের তৈরি।

এর পরে হালদার মশাই গোবিন্দরায়ের বিগ্রহও দেখালেন। বললেনঃ ইনি হলেন পুরনো গোবিন্দপুরের দেবতা। গোবিন্দপুরের শেঠ ও বসাকরা এঁর পূজো করতেন। আর এঁরই নামে গ্রামের নাম হয়েছিল গোবিন্দপুর। ১৭০০ সালে ইংরেজরা যখন এই গ্রাম কিনে নিল, তখন গোবিন্দরায়কে এনে শ্যামরায়ের নিকটে প্রতিষ্ঠা করা হল।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: দেখলে তো, হালদার মশাই সঙ্গে ছিলেন বলেই এত পুরনো কথা জানতে পারলে!

কিন্তু হালদার মশাই প্রতিবাদ করে বললেনঃ কিন্তু গোপালবাবুর পেটে বোধহয় আরও অনেক পুরনো কথা আছে। তাই না?

বলে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুমঃ কালীঘাট তো আপনাদেরই সম্পত্তি, এর কথা আপনিই সব জানেন।

উঁহু, এ আপনার বিনয়ের কথা।

বলে আমাদের নকুলেশ্বর শিবের মন্দিরের দিকে নিয়ে চললেন। চলতে চলতেই আবার গল্প শুরু করলেন। বললেনঃ নকুলেশ্বর

হলেন পীঠস্থানের ভৈরব। জানেন তো, যেখানেই সতীর অঙ্গ পড়েছে, সেইখানেই শিবের স্বয়ম্ভু লিঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু শিবের এই মন্দির তৈরি হয়েছে অনেক দিন পরে। ১৮৫৪ সালে পাঞ্জাবের এক ব্যবসায়ী তারা সিং এই মন্দির তৈরি করে দেন। পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় এসে কেন এই মন্দির তৈরি করে দেন তারও একটা গল্প আছে।

বলে সেই গল্প আমাদের শোনালেন: একবার ব্যবসায়ে তাঁর খুব লাভ হল। ভাবলেন যে কাশীতে সন্ন্যাসীদের জন্যে একটি মঠ তৈরি করে দেবেন। আর সেই জন্যে জিনিসপত্র নৌকোয় তুলে কাশী যাত্রা করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কাশীতে তারা সিং কিছুতেই নৌকো বাঁধতে পারলেন না। সেই নৌকো এসে কালীঘাটের ঘাটে ভিড়ল। তারা সিং মায়ের মন্দির দেখলেন, আর নকুলেশ্বরকে দেখলেন একটি কুঁড়ে ঘরে। তখনই তিনি মঠ তৈরি করবার পাথর দিয়ে নকুলেশ্বরের মন্দিরটি তৈরি করে দিলেন।

গল্প শেষ হতেই স্বাতি বলল: তবু ভাল যে তারা সিং স্বপ্ন না দেখে শিবের দুরবস্থা দেখেই মন্দির তৈরি করেন।

শিরের মন্দির কিছু উত্তর-পূর্ব দিকে। অল্প সময়েই আমরা সেখানে পৌঁছে গেলুম। আমি প্রণাম করলুম বাহির থেকে। হালদার মশায়ের সঙ্গে স্বাতি ভিতরে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে শিবের পূজো করে এল।

ফেরার পথে হালদার মশাই বললেন: এ অঞ্চলে শিবের মন্দির অনেক আছে। গঙ্গার ঘাটে হুজুরিমলের শিবের মন্দির, অন্যত্র ধনীদের তৈরি। হালদারদের তৈরি শিবমন্দিরও আছে। মায়ের মন্দিরের ভিতরেও দুটি শিবমন্দির আছে।

তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন: সারা ভারত ঘুরে দেখলেন তো, দুর্গা আর কালী হলেন বাঙালীর দেবতা। শিবও

কতকটা তাই। বিষ্ণুকে আমরা শালগ্রাম শিলায় রেখেছি ক্রিয়া-কর্মের জন্যে। কিন্তু অন্য রাজ্যে বিষ্ণুকে নিয়েই মাতামাতি বেশি।

আমি বললুম : শিবেরও আদর আছে।

কিন্তু দুর্গা কালীর কদর নেই। আছে কোথাও?

বলে তিনি স্বাতির মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু স্বাতি কোন উত্তর দিল না।

গাড়িতে বসে স্বাতি বলল : কালীঘাটের মন্দিরের সম্বন্ধে কিছু নতুন কথা শুনতে ইচ্ছা করছে।

হালদার মশাই তখনি বললেন : তাহলে গোপালবাবুকে ধরতে হবে।

বললুম : নতুন কথা তো কিছু জানি না, জানি পুরনো কথা।

তাই শুনি।

বলে হালদার মশাই আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : ওয়ার্ড ও মার্শম্যান সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায় যে শুধু হিন্দুরা নয়, খ্রীষ্টান ও মুসলমানরাও কালীঘাটের মন্দিরে পূজো দিতেন।

সত্যি!

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল। আর হালদার মশায়ের দৃষ্টি দেখে মনে হল যে এ কথা তাঁর ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। বললুম : তাঁরা সত্যি বলেই তা লিখে গেছেন। মার্শম্যান সাহেব লিখেছেন যে এ দেশে ইংরেজের সাফল্য লাভের পরে ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে একটা দল শোভাযাত্রা করে এই কালীমন্দিরে এসে পাঁচ হাজার টাকার পূজো দিয়েছিলেন। এ দেশের কয়েক হাজার লোক ইংরেজের এই পূজো দেখেছিল।

হালদার মশাই বললেন : এ গল্প আমিও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।

বললুম : ওয়ার্ড সাহেব বলেছেন যে সাহেবরা এসেও কালী

পূজো করেছে বলে তিনি শুনেছেন। তাদের এ-দেশী উপপত্নীরা তো আসতই, মেমসাহেবরাও নাকি পাল্কী করে পূজো দিতে আসত। কোম্পানীর এক সাহেব নাকি একটা মামলায় জিতে দু-তিন হাজার টাকার পূজো দিয়েছিল। আর তিনি এ কথাও শুনেছিলেন যে প্রতি মাসে প্রায় চার-পাঁচ শো মুসলমান এসে পূজো দিয়ে যায়।

হালদার মশাই বললেন: কই, এখন তো সে রকম দেখি না!

বললুম: দিনকাল তো অনেক বদলেছে। মানুষের বিশ্বাসও আর আগের মতো নেই।

স্বাতি বলল: হিন্দুকে আমি মুসলমানের দরগায় পূজো দিতে দেখেছি।

হালদার মশাই বললেন: এ ঠিক বিশ্বাসের কথা নয়, দুর্বলতার কথা। বিপদে পড়লে মানুষ সর্বত্র মানত করে।

কেন জানি না, আমি চমকে উঠলুম এই কথা শুনে। আর চকিতে চেয়ে দেখলুম স্বাতিকে। সে গম্ভীর হয়ে গেছে।

কয়েক দিন আগের কথা আমার মনে পড়ল। দার্জিলিঙ পাহাড়ে একটা দুর্ঘটনায় অজ্ঞান হয়ে আমি দার্জিলিঙের হাসপাতালে এসে ভর্তি হয়েছিলুম। স্বাতিকে লেখা একখানা চিঠি আমার পকেটে ছিল, ভুলে তা ডাকে দেওয়া হয় নি। সেই ঠিকানা দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ টেলিগ্রাম করেছিল স্বাতিকে। সে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে নি। উড়োজাহাজে দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছিল, আর কলকাতা থেকে দার্জিলিঙে। তারপরে আমাকে নিয়ে ফিরে এসেছে কলকাতায়। সেও কি মায়ের কাছে মানত করেছিল, আর কলকাতায় পৌঁছেই পূজো দিয়ে তার সংকল্প রক্ষা করল!

স্বাতি আর কোন কথা কইল না, ফিরেও তাকাল না আমার দিকে।

১১

দুপুরে হালদার মশাই যত খেলেন তার চেয়ে বেশি রান্নার গুণ-গান করলেন। এক সময় বলেই বসলেন ঃ এমন মিষ্টি রান্না অনেক দিন খাই নি।

স্বাতির মুখ যে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল, আমি তা দেখতে পেয়েছিলুম। সে প্রতিবাদ করে বলল: এ আপনি বাড়িয়ে বলছেন। রান্না যে আমি জানি নে, এ আমি ভাল করেই জানি।

হালদার মশাই তাঁর হাতের তালুটা একবার চেটে বললেন ঃ গোপালবাবুকেই সাক্ষী মানা যাক।

আমি বললুম ঃ আমার কপালে যা জোটে, তাই আমি অমৃত বলি ভয়ে।

ভয়ে কেন ?

খারাপ বললে আর জুটবে না।

হালদার মশাই হা-হা করে হেসে উঠলেন। সেই পুরনো হাসি। কিন্তু এখন আমাদের এই হাসি আর খারাপ লাগছে না। এ যেন অন্য মানুষ। রামেশ্বরে যে মানুষ দেখে মামা মামী ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, এ যেন সে মানুষ নয়। পুষ্করে ও সোমনাথে যে মানুষ দেখেছি, তার সঙ্গেও এ মানুষের সব কিছু মিলছে না। এর একটু পরেই হালদার মশাই প্রমাণ করে দিলেন যে আজকের এই মানুষকে আমরা আগে কোথাও দেখি নি।

আহারের পর স্বাতি তাঁকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বোধহয় দক্ষিণা দেবার চেষ্টা করেছিল। আমি তাঁর প্রতিবাদ শুনতে পেলুম ঃ তোমার কাছে কি মা আমি দক্ষিণা নেব! আর একে কি দক্ষিণা বলে! এ সব রেখে দাও মা, এ আমি নিতে পারব না।

স্বাতি বোধহয় কিছু অনুনয় বিনয় করেছিল। তার উত্তরে তিনি বললেন ঃ এক পয়সা। না থাকে, সব চেয়ে ছোট মুদ্রা যেটি আছে সেইটি দাও। ব্রাহ্মণের দক্ষিণাও হবে, আমারও পাপ হবে না।

বলেই এ ঘরে চলে এলেন।

আমি চুপ করে ছিলুম। কিন্তু হালদার মশাই চুপ করে থাকতে পারলেন না। বলতে লাগলেন ঃ দিনকাল যে কী হয়েছে বুঝি না। কোন্ দিন হয়তো নিজের মেয়েও বলবে, বাবা, দক্ষিণা নাও।

এই হালদার মশাইকে আমরা বিকেলের দিকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিলুম। সারা দুপুর তিনি আমাদের গল্প শোনালেন। নানা রকমের গল্প। স্বাতি একটি লোভনীয় সংবাদও তাঁর কাছে পেয়ে গেল। তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিয়ে হচ্ছে দিন কয়েক পরে।

হালদার মশাই বললেন ঃ আরে, ও তোমার বন্ধু নাকি! তাহলে তোমাদের খবরটা তো তাকে দিতে হবে!

তারপরেই বললেন ঃ ওদেরও পছন্দের বিয়ে, বুঝলে!

বলে হেঁ-হেঁ করে বেশ রহস্যময় হাসি হেসেছিলেন।

হালদার মশাই গাড়ি থেকে নেমে যাবার পরে স্বাতি বলল ঃ এখন আমাদের অনেক কাজ আছে।

কাজ!

কাজই তো!

কী কাজ তা বুঝতে না পেরে আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু সে আমাকে কিছু না বলে ড্রাইভারকে বলল ঃ পেট্রল একটু বেশি করে নাও, আমাদের অনেক দূরে যেতে হবে।

স্বাতির অভিভাবকত্ব আমাকে মেনে নিতেই হবে। তাই এ বিষয়ে বেশি প্রশ্ন করলে ড্রাইভারের কাছেও তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাই নিজের সম্মান রক্ষার জন্যে আমি নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলুম।

একটা পেট্রল পাম্পে ড্রাইভার পেট্রল নিল। স্বাতি তার ব্যাগ খুলে দিল পয়সা। তারপরে বলল : হাওড়ার দিকে চল।

দেহটা গাড়ির এক ধারে এলিয়ে দিয়ে আমি নিঃশব্দে বসে রইলুম। স্বাতি আড় চোখে আমার মুখের ভাবটা দেখে নিয়ে বলল : তোমার উতোরপাড়ায় যাচ্ছি।

উত্তরপাড়ায়!

বলে আমি সোজা হয়ে বসলুম।

স্বাতি বলল : চমকে উঠলে কেন ?

বললুম : আমার মালপত্র সঙ্গে নিলেই তো ভাল হত। ওগুলো নেবার জন্যে আমাকে আবার আসতে হত না।

স্বাতির দৃষ্টিতে কৌতুক উঠল চকচক করে। বলল : সম্বন্ধটা আজই ঘুচে না যায়, তাই ওগুলো নিজের কাছেই রেখে দিলাম।

সম্বন্ধ !

বলে আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকালুম। ভেবেছিলুম যে সে লজ্জা পাবে। কিন্তু তার বদলে সে আরও সহজ ভাবে বলল : পাতানো সম্বন্ধ কিনা, তাই ভয়। বাবার কাছে শোন নি আমাদের সম্বন্ধের কথা !

শুনেছি।

রামেশ্বর যাবার পথে ট্রেনে মামা আমাদের এই সম্বন্ধের কথা শুনিয়েছেন। আমার মা তাঁর পাতানো বোন ছিলেন, মানে দুজনের মায়ে সখী সম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন। সেই সম্বন্ধই চলে এসেছে। এর পরে আমি কী বলব ভেবে পেলুম না, আর স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসল।

এক সময় বলল : তোমার উতোরপাড়ার ঘরের ভাড়া শুধু শুধু গুনছ কেন ?

বললুম : ছেড়ে দেবার সুযোগ তো পাই নি। এইবারে ছেড়ে চলে যাব।

কোথায় ?

নিজের কর্মক্ষেত্রে।

তুমি কি আসামে ফিরে যাবার কথা ভাবছ ?

বললুম : এখানে আর কত দিন থাকব ! যেতে তো হবেই।

হুঁ।

বলে স্বাতি নীরব হল।

প্রশস্ত রাজপথ ধরে আমরা ছুটে যাচ্ছিলুম। দু ধারের ঘর বাড়ি ছেড়ে এক সময় ময়দানের ভেতর ঢুকে পড়লুম। কলকাতার অন্ধকূপবাসী মানুষ এখানে বুক ভরা নিঃশ্বাস নিতে আসে। কিন্তু আমার মনে হল যে এখানে এখন একটুও বাতাস বইছে না, নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে। অথচ স্বাতির দিকে চেয়ে দেখলুম যে বাতাসে তার চুল উড়ছে, শাড়ির আঁচলখানা চেপে আছে একটা হাত দিয়ে। তবে কি বাতাস এমন ভারি যে তা নিঃশ্বাসের উপযোগী নয় !

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল।

কেন জানি না আমার রাগ হল এই হাসি দেখে। বললুম : অকারণে হাসছ যে !

হাসতে হাসতেই স্বাতি উত্তর দিল : অকারণে নয়, কারণ আছে বলেই হাসছি।

তারপরে বলল : নিজের মনটাকে একটু বুঝতে শেখো, তাহলেই শান্তি পাবে। বাইরে থেকে মনের শান্তি আসে না।

এ তো দার্শনিকের কথা।

দার্শনিকেরাই সত্য কথা বলে। আর সত্য কথা বললেই মনে হয় তা দার্শনিকের কথা।

এ কথার উত্তর দেবার চেষ্টা আমি করলুম না। ময়দানের মিষ্টি বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল, কিন্তু মন জুড়োল না। মনের মধ্যে যে যন্ত্রটা এতক্ষণ বাজছিল, তার একটা তার যেন ছিঁড়ে গেছে। গানটা তাই বেসুরো বাজছে।

স্বাতির কথা মতো ড্রাইভার দ্রুত চলেছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে আমাদের হাওড়া পুলের উপরে নিয়ে এল। পুলের উপরে গাড়ি উঠতেই স্বাতি বলল : আগে বেলুড়ে চল, বেলুড় মঠে। সেখানে গঙ্গার ধারে একটু বিশ্রাম করে উতোরপাড়ায় যাব।

হাওড়া স্টেশন এলাকার খুব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আগে স্টেশনের ধার ঘেঁষে যেতে হত। এখন পুলের উপর থেকেই সোজা নেমে যাচ্ছে পশ্চিমমুখো। তারপরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে উত্তর-মুখো হতে হচ্ছে। এ সময়ে পুলের উপরে ভিড় ছিল না। অফিসের ছুটি এখনও হয় নি। রাতের ট্রেন ছাড়বারও সময় নয়। তখন এমন তাড়তাড়ি পুল পেরোনো সম্ভব হত না। ভিড়ে একবার আটকে পড়লে যে কী রকম দুর্দশা হয়, সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। তখন ভাগ্যবান বলে মনে হয় পদযাত্রীকে। ট্রাম বাস থেকে ঝপ ঝপ করে নেমে কাতারে কাতারে লোক হাঁটতে শুরু করে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কী ভাবছ বল তো ?

বললুম : হাওড়া পুলটা এমন তাড়াতাড়ি পেরিয়ে এলুম বলে আশ্চর্য হচ্ছি।

স্বাতি বলল : এ পথে আর ফিরব না।

তবে ?

বালি থেকে দক্ষিণেশ্বর হয়ে ফিরব।

বললুম : দক্ষিণেশ্বরেও বোধহয় একটু জিরিয়ে নেবে ?

এ কথায় স্বাতি একটু হাসল, কোন উত্তর দিল না।

হাওড়া পেরিয়ে যাবার আগে স্বাতি বলল : এ দিকে আমাদের আর এক দিন আসতে হবে।

কেন ?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : শিবপুরের বটানিকাল গার্ডেন অনেক দিন দেখি নি।

আমি বললুম ঃ ও বাগান দেখে শেষ করা যায় না।

কেন ?

ও বাগান আকারেও যত বড়, দেখবার ও জানবার জিনিসও আছে তত। গাড়ি চেপে ওই বাগানের মধ্যে দিয়ে একবার ঘুরে এলে কোন ধারণাই হয় না।

স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকাল। তার কৌতূহল দেখে বললুম ঃ আমিও একে আগে একটি পিকনিকের জায়গা বলে জানতুম। গঙ্গার ধারে চড়ুইভাতি কর, আর সেই বিরাট বটগাছটি দেখে ফিরে এস। এর বেশি আমার কিছু জানা ছিল না। হঠাৎ একদিন এখানকার এক কর্মী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি এক দিন কষ্ট করে আমাকে কিছু দেখালেন, আর পুরনো অনেক খবর দিলেন। সে সব লিখলে একটা বিরাট বই হতে পারে।

অপ্রশস্ত পথে আমাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। পথচারী ও যানবাহন বেশি নয়, কিন্তু শৃঙ্খলার অভাবের জন্যেই সাবধানে চলতে হচ্ছে। স্বাতি বলল ঃ সংক্ষেপে কিছু বল।

বললুম ঃ গোড়া থেকে বলতে হলে লেফটেনাণ্ট কর্ণেল কীডের কথাই প্রথমে বলতে হয়। বাগানের ভেতরের কথা কিছু মনে আছে ?

স্বাতি বলল ঃ না।

বললুম ঃ একটা প্রধান পথের নাম কীড অ্যাভিনিউ, আর কীড সাহেবের একটা স্মৃতিস্তম্ভও আছে। কিন্তু খুব কম লোকেই এঁর কথা জানতে চায়। এমনি আরও স্মৃতিস্তম্ভ ও সাহেবদের নামে অ্যাভিনিউ আছে। এঁরা প্রথম দিকে এই বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। আর কোন না কোন স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন।

স্বাতি কোন প্রশ্ন করল না। আমিই বলতে লাগলুম ঃ প্রায় দু শো বছর আগের কথা। দেশে তখন কোম্পানীর শাসন। আর কীড সাহেব ছিলেন কলকাতার সেনাদলে। পেশায় সৈন্য হলেও

মেজাজে তিনি অন্য মানুষ ছিলেন। ভালবাসতেন গাছপালা। একটা সরকারী বাগান স্থাপনের ইচ্ছা মনে জাগতেই তিনি কোম্পানীকে সেই পরামর্শ দিলেন। কয়েক বছর আগে দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মরেছিল। কীড সাহেব বললেন, একটা বটানিকাল গার্ডেনে মালয় থেকে সাবুর বীজ, ব্রহ্মদেশ থেকে সেগুন গাছ, সিংহল থেকে দারচিনি, তামাক নীল চন্দন লাক্ষা তুলা ও নানারকম মশলার চাষ করলে শুধু খাদ্যের অভাব নয়, ব্যবসাতেও খুব লাভ হবে।

ওয়ারেন হেস্টিংস তখন দেশে ফিরে গেছেন, কর্নওয়ালিস সাহেবও আসেন নি। গভর্নর-জেনারেলের কাজকর্ম দেখছিলেন জন ম্যাকফার্সন। তিনি কীড সাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করে বটানিকাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠার অনুমতি আনালেন বিলেত থেকে। গঙ্গার এপারে গার্ডেনরীচ আর ওপারে শিবপুরে তিন শো একর জমি সংগ্রহ করে কোম্পানীর বাগানের কাজ শুরু হল। কীড সাহেব হলেন প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। একটা কথা শুনে আশ্চর্য হবে—

কী কথা ?

অন্য গাছপালার জন্যে নয়, এই বাগানে দারচিনির চাষ হবে বলেই কোম্পানী রাজী হয়েছিল। অন্য জিনিসের সঙ্গে দারচিনির নাম উল্লেখ করেছিলেন লাটসাহেব। দারচিনির ব্যবসায়ে তখন নাকি প্রচুর লাভ হত।

বটানিকাল গার্ডেনে দারচিনির চাষ !

হেসে বললুম ঃ কোম্পানী ব্যবসা করতে এসেছে বিদেশে, শখ করতে নয়। পুরনো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরা গাছপালা ভালবাসতেন বলেই কোম্পানীর বাগান এখন এশিয়ার সবচেয়ে বড় বটানিকাল গার্ডেনে পরিণত হয়েছে।

স্বাতি বলল ঃ সত্যি বলতে কি, বটানিকাল গার্ডেনের বটগাছটি ছাড়া আমি আর কিছুই মনে করতে পারছি না।

বটানিকাল গার্ডেনের ঐটিই সবচেয়ে পুরনো গাছ—দি গ্রেট বেনিয়ান ট্রী। কিন্তু বটগাছের নাম বেনিয়ান ট্রী হল কী করে জান?

না।

তিনশো বছর আগে ট্যাভার্নিয়ার এই নাম দিয়েছিলেন। পারস্য উপসাগরের হর্মুজ দ্বীপে ভারতীয় বেনিয়ারা একটা গাছের নিচে মন্দির তৈরি করেছিল। ঐ দ্বীপে আর কোন গাছপালা ছিল না। গাছটা বট, ল্যাটিন ভাষায় ফিকাস ইণ্ডিকা। কিন্তু ট্যাভার্নিয়ার তাকে বেনিয়াদের গাছ বলে নাম দিলেন বেনিয়ান ট্রী। সেই নামই প্রচলিত হয়ে গেল।

আমাদের গাড়ি খুব তাড়াতাড়ি এগোতে পারছিল না। পথঘাট বিশেষ প্রশস্ত নয়, যানবাহন ও পথচারীরা চলছে বিশৃঙ্খল ভাবে। কাজেই আমাদেরও ধীরে ধীরে এগোতে হচ্ছিল।

বললুম: বোধহয় জানো যে ঐ বটগাছের আসল গুঁড়িটাই নেই।

তাই নাকি!

আমাদের জন্মের অনেক আগে, মানে ১৯২৫ সালে, গুঁড়িটা কেটে সরিয়ে দেওয়া হয়। ছাতা ধরেছিল, তারপর ১৯১৯ সালের সাইক্লোনে খুব ক্ষতি হয়। গুঁড়িটা না সরিয়ে উপায় ছিল না। ডালপালা থেকে যে সব শেকড় ঝুলছিল, তারই উপরে ঐ বিরাট গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। এর মাপজোখ জান তো?

স্বাতি বলল: না।

বললুম: উঁচুতে এক শো ফুটের কিছু কম। সাড়ে বারো শো ফুটের বেশি এর পরিধি। যে কাণ্ডটি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, তার পরিধি ছিল পঞ্চাশ ফুটের বেশি। ঐ গাছটির দিকে তাকালে মিল্টনের কয়েক ছত্র কবিতা আমার মনে পড়ে—প্যারাডাইস লস্টের কয়েকটি লাইন:

The bended twigs take root and daughters grow
About the mother tree, a pillar'd shade,
High over-arched and echoing walks between.

মনে হয় এই বটগাছটি দেখেই যেন মিল্টন এই বর্ণনা করেছেন।

স্বাতি কোন কথা বলল না। আমিই আবার বললুম: আশ্চর্য প্রকৃতির গাছ বাগানে আরও আছে। এক রকমের দুটো পাতা হয় না, এই রকম একটা গাছের নাম ম্যাড্ ট্রী। দিনের আলোয় রঙ বদলায়, এমন একটি গাছের নাম ইয়েস্টারডে, টুডে অ্যাণ্ড টুমরো।

ভারি অদ্ভুত নাম তো!

অদ্ভুত গাছ বলেই অদ্ভুত নাম। কিন্তু ফুল পাতার শখ থাকলে অন্য জিনিস দেখতে হবে।

কী?

দুটো নার্সারি আছে। দেড় হাজার জাতের অর্কিড আর অসংখ্য ক্যাক্টাস ও স্যাকুলেন্ট্। বটানির ছাত্র হলে যেতে হবে লাইব্রেরি আর হার্বেরিয়ামে। সেখানে শুকনো পাতার আড়াই লাখ নমুনা সযত্নে সাজানো আছে। এক সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বাঙালী শিল্পীদের দিয়ে রঙীন ফুলপাতার ছবি আঁকিয়েছিলেন প্রায় আড়াই হাজার, পঁয়ত্রিশ খণ্ডে তাও সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

স্বাতি বলল: এ সব কিছুই আমি দেখি নি।

বললুম: খুব কম লোকেই দেখে। ছুটির দিনে বিশেষ করে বড়দিন ও ইংরেজী নববর্ষে এক লাখ না হলেও প্রায় আশি হাজার লোক আসে এই বাগান দেখতে। শুধু বড় লোক নয়, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্ররাও আসে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। বাগানের ভিতরে মাইল দশেক বাঁধানো পথ, অনেকগুলি লেক, অনেক খোলামেলা জায়গা আর মাইল খানেক বাগান তো গঙ্গার ধারেই। কেউ নৌকোয় বেড়ায়, কেউ মাছ ধরে, কেউ রান্নাবান্না করে খায়,

কেউ খাবার নিয়ে এসে মশগুল করে খায়, আর সামান্য কিছু লোক বাগান দেখে। এমন কম খরচে ছুটির দিন কাটাবার জায়গা কলকাতায় বোধহয় আর নেই।

স্বাতি বলল: তোমার সঙ্গে এক দিন বাগানটা ভাল' করে দেখব।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একজনের কথা মনে পড়ল। কলকাতার প্রথম বিশপ মিড্‌ল্‌টন সাহেবের কথা। কলকাতায় তাঁর নামে অভিজাত পথ আছে। কিন্তু খুব কম লোকেই জানে যে দেড় শো বছর আগে তিনি ছিলেন প্রথম বিশপ। বটানিকাল গার্ডেনের এলাকায় তিনি প্রায় চল্লিশ একর জমি চেয়ে নিয়ে একটা কলেজ খুলেছিলেন, তার নাম ছিল বিশপ মিড্‌ল্‌টন ইংলিশ কলেজ। সেই কলেজই এখন শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই কলেজের গেট ছাড়িয়েই বটানিকাল গার্ডেনে যেতে হয়। একটা গেটের নাম কলেজ গেট।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে এই বাগানের কয়েকটা গেট আছে, কিন্তু বাগানটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা নয়। দুশো সত্তর একরের এই বাগান দেওয়াল দিয়ে ঘেরা রীতিমতো ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার।

পৃথিবীতে এত বড় বাগান কত আছে জানি নে। এশিয়ায় নামকরা বাগান আরও দুটি আছে—একটি ইন্দোনেশিয়ার বোগোরে, আর একটি সিংহলের পেরাডেলিয়ায়। সৌন্দর্য ও উৎকর্ষের জন্য বিখ্যাত হলেও আয়তনে তা অনেক ছোট। শিবপুরের বাগান পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শুনলেও আমি আশ্চর্য হব না।

১২

কথা বলতে বলতেই আমরা শালকিয়া পেরিয়ে গিয়েছিলুম। তারপরে লিলুয়া। রাস্তা থেকে রেলের কারখানা দেখা যায়নি, দেখা গিয়েছিল রেলের কলোনি। বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন এলাকা। তারপরেই বেলুড়। ডান হাতে আমরা বেলুড় মঠের পথ ধরলুম। বাসে এলে এই মোড়ে নেমে আমাদের হেঁটে যেতে হত মঠের ভিতরে। গাড়ি থাকলে হাঁটতে হয় না, গাড়ি নিয়েই মঠের এলাকার মধ্যে ঢুকে যাওয়া যায়।

গাড়ি থামতেই স্বাতি নেমে পড়ল। আমি নামলুম তার পরে। ঘুরে তার কাছে এসে বললুম ঃ হঠাৎ এই মঠে আসবার শখ হল কেন ?

স্বাতি সংক্ষেপে বলল ঃ অনেক দিন আসি নি।

তারপরে চলতে চলতে বলল ঃ পথের পাশে মন্দির থাকলে প্রণাম করে যেতে হয়।

খুব সত্যি কথা। কিন্তু সব সময় আমরা এ কথা মানি না। গাড়িতে যাবার সময় গাড়ি থেকে নেমে আমরা প্রণাম করি না, গাড়িতে বসেই হাত জুড়ে চোখ বুজে আমরা এই নিয়ম রক্ষা করি। তাই স্বাতি এমনি করে প্রণাম জানাতে এসেছে বলে আমি একে একটা গতানুগতিক ব্যাপার বলে মেনে নিতে পারলুম না। বললুম ঃ এ তো পথের পাশের মন্দির নয়, এ মন্দির তোমাকে পথ থেকে টেনে এনেছে।

স্বাতি বলল ঃ মন্দির নয়, মন্দিরের দেবতা মানুষকে টানে।

বললুম ঃ মানুষকে নয়, মানুষের মনকে। আর সব মনকেও নয়, যে মন দেবতাকে মানে, সেই মনকে।

স্বাতি বলল : তর্ক করতে এখানে আসি নি, তর্ক করব না। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে যদি কিছু জানো তো বল।

বললুম : ঘরের বেশি কাছে বলে বিশেষ কিছুই জানি না।

আমিও বেশি কিছু জানতে চাই নে, সামান্য কিছু জানতে পারলেই খুশী হব।

বললুম : গঙ্গার ওপারে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস, আর এপারে বেলুড়ে তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ।

এ কি রামকৃষ্ণ মিশন নয় ?

বলে স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : রামকৃষ্ণ মিশন তো বটেই, এটি তার প্রধান কর্মকেন্দ্র। পৃথিবীতে যত রামকৃষ্ণ মিশন আছে, তার পরিচালনার দায়িত্ব বোধহয় বেলুড় মঠের।

তবে এখানে স্বামী বিবেকানন্দের কথা কেন বলছ ?

বলছি এই জন্যে যে রামকৃষ্ণ কোন দিন কোন মিশন বা মঠ স্থাপনের চেষ্টা তো দূরের কথা, ইচ্ছা প্রকাশও করেন নি। তাঁর মৃত্যুর পরে স্বামী বিবেকানন্দ যে দিন এই কথা বললেন, সে দিন একটা দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

স্বাতি জোরে জোরে হাঁটছিল না। বিশাল মন্দিরের সিঁড়ির কাছে পৌঁছেও ভিতরে ঢুকল না। ধীর পায়ে গঙ্গার দিকে এগিয়ে বলল : কেন ?

রামকৃষ্ণ নাকি কাকে বলেছিলেন, আগে ভগবান লাভ কর, তারপর আর সব। পরের উপকার করতে যাওয়া অনধিকার চর্চা।

বলেছিলেন এই কথা ?

বলেছিলেন কিনা জানি না, তবে বিবেকানন্দ কারও কাছে শুনেছিলেন এই কথা। তাই বলেছিলেন, 'ভগবান একটা খেলনা কিনা যে খুঁজলেই মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে!' ধ্যান ভজন করে

যাঁরা ভগবানকে পাবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের বলেছিলেন, 'মনে করেছিস এতেই তোদের মুক্তি আসছে হাতের মুঠোয়? আর শেষের দিনে রামকৃষ্ণ ঠাকুর এসে তোদের হাতে ধরে একেবারে গোলোকে টেনে নিয়ে যাবেন! আর জ্ঞানের চর্চা, লোকশিক্ষা এবং আর্ত অনাথের সেবা, এ সব মায়া—কেন না পরমহংসদেব ওসব করেন নি!' সে দিন একমাত্র বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস? তা হবে না। আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কখনও তাঁর 'পূজা প্রচার করতে বলেন নি। ধ্যান ধারণা আর ধর্মের যে সব উঁচু তত্ত্ব আমাদের শিখিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জগৎকে শিক্ষা দিতে হবে।' বিবেকানন্দের এই আদর্শ থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম।

স্বাতি গঙ্গার ধারেও গেল না। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল: এত বড় একটা কাজ তিনি একা করলেন?

বললুম: একা করেছেন বললে তাঁর সহকর্মীদের অসম্মান করা হবে। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের তিনি জন্ম দিয়েছিলেন, তার আদর্শ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। শুনেছি, তিনি আমেরিকায় যে টাকা পেয়েছিলেন তাই দিয়ে কিনেছিলেন পঁয়তাল্লিশ বিঘে জমি। সে এই জমি কিনা তা বলতে পারব না। তবে এই মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে দুজন আমেরিকান মহিলার প্রচুর দান আছে বলেও শুনেছি। ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠা হয় এই রামকৃষ্ণ মিশনের।

বাহির থেকে স্বাতি মন্দিরটি দেখছিল ভাল করে। বলল: এই মন্দিরের তিনটে অংশ দেখতে পাচ্ছি।

বললুম: একটু লক্ষ্য করে দেখ, তিনটি অংশই মন্দিরের মতো নয়।

মন্দিরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বাতি আমার দিলে তাকাল।

বললুম ঃ অনেকে বলেন যে এই তিনটি অংশ তিনটি ধর্মের প্রতীক—হিন্দুর মন্দির মুসলমানের মসজিদ ও খ্রীষ্টানের গির্জার মতো।

দুজনেই আমরা অনেকক্ষণ ধবে দেখলুম। না, এ কথা সুঠিক বলে মনে হচ্ছে না, আবার মিথ্যা বলেও মেনে নিতে পারছি না। স্বাতি বলল ঃ হিন্দুব মন্দির এত বড় হয় না। এর মধ্যে প্রার্থনার জন্যে বিরাট কক্ষ আছে বলেই বোধহয় মসজিদ বা গির্জার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

বললুম ঃ বাহিবেব স্থাপত্য রীতিতেও বেশ কিছু বৈচিত্র্য আছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সামনেব দিকটা রাজস্থানী শৈলীর বলে বোঝা যাচ্ছে।

স্বাতি বলল ঃ এস, এবারে ভেতবটা দেখে আসি।

মন্দিরেব গৈরিক গায়ে তখন ছায়া পড়েছে। ভিতরে জ্বলেছে আলো। আমরা সামনেব দিকে এসে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলুম।

এক শো ফুটেরও বেশি উঁচু বিশাল মন্দির, অসংখ্য ভক্ত সমাবেশের উপযোগী বিবাট কক্ষ। মন্দিরে এমন প্রশস্ত অভ্যন্তর শুধু বেনারসে দেখেছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় নূতন বিশ্বনাথের মন্দিরে। পুরাকালে মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরে নৃত্যগীত হত। কিন্তু সে নাটমন্দিরও এমন প্রশস্ত হত না। গোয়ার মন্দিরে দোচালার নাটমন্দির দেখেছি, তা মন্দিরের বাহিবে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে নির্মিত। বেলুড়ের এই মন্দিরে আধুনিকতার লক্ষণ বর্তমান। মন্দিরে যাত্রী শুধু দেবদর্শনের জন্যেই আসবে না, ধর্মচর্চার জন্যেও আসবে, আসবে জ্ঞানার্জনের জন্যেও। এত বড় একটা কক্ষ না থাকলে একালের প্রয়োজন সম্পূর্ণ হবে না।

নাটমন্দির পেরিয়ে গর্ভমন্দিরে পাথরের বেদীর উপরে আমরা রামকৃষ্ণদেবের প্রমাণ আকারের সমাধিস্থ মূর্তি দেখলুম। সারদা মা

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের মূর্তি গঙ্গার ধারে স্বতন্ত্র মন্দির। রামকৃষ্ণ মানুষের পূজা চান নি, সারদা মাও না। আর বিবেকানন্দ তো নিজেই মানুষকে পূজা করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁদের মূর্তি পূজায় মন এখনও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি।

স্বাতি বলল ঃ এস, গঙ্গার ধারে গিয়ে একটু বসি।

বললুম ঃ তোমার কি সময় আছে ?

স্বাতি বলল ঃ সময়ের অভাব থাকলেও একটুখানি বসতে হবে।

কেন ?

এ সব জায়গায় এলে সময়ের হিসেব ভুলে যেতে হয়।

বললুম ঃ আজ ভুলে গেলে কি কোন ক্ষতি আছে ?

খুব ক্ষতি।

স্বাতির এই উত্তর শুনে আমি থমকে দাঁড়ালুম।

স্বাতি বলল ঃ আজ রাত সাড়ে আটটায় এক জায়গায় পৌঁছতে হবে। এক মিনিট দেরি হলে চলবে না।

কিন্তু কোথায় যেতে হবে সে কথা বলল না। আমি জানি যে সে এখন বলবে না। তাই কোন প্রশ্ন করে হতাশ হতে চাইলুম না। মন্দির থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারেই এগিয়ে গেলুম নিঃশব্দে।

স্বাতি বলল ঃ এখানে এলে স্বামী বিবেকানন্দের কথা সকলের আগে মনে পড়ে না।

বাধা দিয়ে বললুম ঃ কিন্তু তাঁর আদর্শেই তো এই প্রতিষ্ঠান আজও চলছে। জ্ঞানের চর্চা, লোকশিক্ষা আর অনাথের সেবা। দেখতে পাচ্ছ না, রামকৃষ্ণ মিশন এখন চারি দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয় স্থাপন করে সেই আদর্শকেই সম্মান করে যাচ্ছে !

স্বাতি বলল ঃ অনাথের সেবা বললে কি আমরা হাসপাতাল বুঝি ?

মনে আমার খট্‌কা লাগল। সেই সঙ্গেই মনে পড়ল স্বামীজীর একটি কথা। কলকাতায় তখন প্লেগ দেখা দিয়েছে মহামারী রূপে।

আতঙ্কে মানুষ আধমরা হয়ে গেছে। মঠের কর্মীদের স্বামীজী সেবার কাজে নামতে বলছেন। আর কর্মীরা বলছেন টাকার প্রয়োজনের কথা। মঠের সম্বল তখন পঁয়তাল্লিশ বিঘা জমি। স্বামীজী বললেন, 'প্রয়োজন হলে এখনি মঠের সবটা জমি বিক্রি করে দেব, কাজ চালিয়ে যাব। আমরা ফকির, মুষ্টিভিক্ষা করে আর গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা জমি বিক্রি করলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারি, তবেই তো এ সব সার্থক। নইলে কিসের এই জায়গা, কিসের জমি!'

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল ঃ কী ভাবছ বল তো?

বললুম ঃ স্বামীজীর জীবনের ছোটখাটো ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

বল না!

বলে স্বাতি শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

বললুম ঃ অনাথের সেবা বলতে স্বামীজী কী বুঝতেন, সেই কথাটি বোধহয় আজও রহস্যময় হয়ে আছে। অন্তত আমার কাছে তা রহস্যময়ই থাকবে।

কেন?

এ কথার উত্তর না দিয়ে বললুম ঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম শুনেছ? মহাকবি গিরিশচন্দ্র?

নামটিই শুধু শোনা, আর বিশেষ কিছুই জানি না।

বললুম ঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমসাময়িক ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতার রঙ্গমঞ্চ। অভিনয়কে তিনি পেশা বলে গ্রহণ করেছিলেন, আর বহু নাটক রচনা করেছিলেন রঙ্গমঞ্চের জন্যে। বিখ্যাত অভিনেতা দানীবাবু ছিলেন তাঁর পুত্র।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ স্বামীজীর কথায় তুমি এঁর কথা বলছ কেন?

বললুম ঃ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন

তিনি। আর বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর এক দিনের একটি ঘটনার কথাই আমার মনে পড়ছে।

তারপরে সেই ঘটনাটি আমি সংক্ষেপে স্বাতিকে বললুম।—

বিবেকানন্দ তখন বেদান্ত পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ গিরিশচন্দ্র এসে উপস্থিত। পণ্ডিত বিবেকানন্দ রসিকও খুব। বললেন, 'জি. সি., তুমি তো এ সব কিছুই পড়লে না, শুধু কেষ্টো বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে!'

গিরিশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বললেন, 'স্বামীজী, ও সবে তোমারই বেশি প্রয়োজন। কারণ তোমাকে দিয়েই ঠাকুর লোকশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।'

তারপরে অভিনেতা গিরিশচন্দ্র বললেন, 'আচ্ছা নরেন, তুমি তো বেদবেদান্ত ঢের পড়েছ। কিন্তু তাতে অগণিত দুঃখীর দুঃখ, বুভুক্ষুর আর্তনাদ, আর পাপাচারগুলো নিবারিত হয় কি?'

গিরিশচন্দ্র এখানেই থামলেন না। যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করছেন এমনি ভাবে দেশের দুঃখদারিদ্র্যের এমন এক বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুললেন যে চোখের জল লুকোবার জন্যে বিবেকানন্দ সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। আর গিরিশচন্দ্র তাঁর শিষ্যকে বললেন, 'দেখলি তো তোর গুরুর হৃদয়টা! এই যে পরের দুঃখে এমন অশ্রু-মোচন, এই যে মহাপ্রাণতা—এই জন্যেই আমি তাঁকে বড় বলে মানি, তাঁর বিদ্যেবুদ্ধির জন্য নয়।'

একটু থেমে বললুম: গিরিশচন্দ্র ঠিকই বুঝেছিলেন যে জ্ঞানের পরিধির চেয়ে বড় ছিল বিবেকানন্দের হৃদয়। মানুষের দুঃখমোচনই তিনি মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম বলে মনে করতেন।

স্বাতি বলল: ভারত সেবাশ্রম সংঘ তো এখন এই কাজই করছেন।

বললুম: যে কোন আদর্শবান মানুষ এই সব আদর্শই গ্রহণ করবেন। রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করেছেন গঠনের কাজ, আর দুঃখ-

কষ্ট ও ত্যাগের পথে মানুষের সেবার কাজ বেছে নিয়েছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ।

গঙ্গার ধারে একটুখানি পরিষ্কার জায়গা দেখে দুজনেই বসে পড়েছিলুম। গঙ্গার এপারে বেলুড় মঠ, ওপারে দক্ষিণেশ্বর। যে রামকৃষ্ণ সারদা মায়ের সঙ্গে সাধনা করেছিলেন ওপারের কালী-মন্দিরে, এপারে তাঁরই শিষ্য সম্প্রদায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাঁরই আদর্শ প্রচার করছেন সারা পৃথিবীতে। স্বামী বিবেকানন্দই এ কাজ প্রথম করেছিলেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তাঁর জন্ম, আর মৃত্যু হয়েছে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই চল্লিশ বছর বয়সে। ভারতের অধ্যাত্ম জগতে শঙ্করাচার্যের পরে স্বামী বিবেকানন্দই এত অল্প বয়সে স্থায়ী কীর্তি রেখে যেতে পেরেছেন। একই ভাবে এই দুই মহাপুরুষ হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন করেছেন।

বিবেকানন্দ তাঁর নাম নয়, তাঁর নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। এও তাঁর স্কুলের নাম। তার আগে নাম ছিল বিশ্বেশ্বর। কাশীর বিশ্বনাথের আরাধনায় জন্ম বলে এই নাম হয়েছিল। কলেজে পাশ্চাত্ত্য দর্শন পড়ে তিনি নাস্তিক হতে যাচ্ছিলেন। নেম ঋষির মতো তাঁর প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল, কে দেখেছে ঈশ্বর, কেন আমরা তাঁকে মানব? এক দিন ব্রাহ্ম নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, মশাই, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? আমায়ও কি দর্শন করাতে পারেন?

মহর্ষি এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, বাবা, তোমার চোখ দুটি ঠিক যোগীদের মতো। একনিষ্ঠ হয়ে সাধন কর। তুমি সফলকাম হবে।

শুধু মহর্ষিকে নয়, অনেক সাধু মহাত্মাকে তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে বলেন নি যে ভগবানকে দেখেছি। মিথ্যা কথাও বলেন নি কেউ। তারপর নিজের এক কাকার সঙ্গে

যখন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কাছে গিয়ে এই প্রশ্ন করলেন, তখন ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরলতায় বললেন, সে কি গো? দেখেছি বই কি! এই যেমন তোমাদের দেখছি—এমনি করেই তো রোজ দেখছি! শুধু তাই নয়, তোমাকেও দেখাতে পারি। কিন্তু আমার কথামত চলতে হবে।

রাজী হয়ে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। দীক্ষা নিলেন ঠাকুরের কাছে। নাস্তিক হলেন না, ব্রাহ্মও না। হিন্দুধর্মকেই মেনে নিলেন, আর এই ধর্মপ্রচারেই আত্মনিয়োগ করলেন কায়মনোবাক্যে।

তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা মনে পড়ছে। আটাশ বছর বয়সে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে সে দেশের মন জয় করেছিলেন। তাদেরই আগ্রহে তিনি তিন বছর পরে আমেরিকার সিকাগো শহরে উপস্থিত হলেন বিশ্বের ধর্মসভায় যোগ দিতে—Parliament of Religions. তাঁর বক্তৃতা শুনে মোহিত হয়েছিল সে দেশের লোক। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। ইংলণ্ডেও তাই করেছিলেন। দ্বিতীয় বার ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গিয়েছিলেন ১৮৯৯ সালে, আর তার পরের বছর প্যারিসে Congress of Religionsএ যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি যা করেছিলেন, তার তুলনা নেই কোন দেশের ইতিহাসে।

সহসা স্বাতির কথায় আমি চমকে উঠলুম। স্বাতি বলল: কী ভাবছ বল তো?

বললুম: স্বামী বিবেকানন্দের কথাই ভাবছি।

কী ভাবছ বল।

ভাবছি এক তিরিশ বছরের যুবকের দিগ্বিজয়ের কথা। সামান্য পুঁজি নিয়ে তিনি আমেরিকায় পৌঁছে শুনলেন যে ধর্মসভায় বক্তাদের নাম আগে থেকেই ঠিক হয়ে গেছে। তারপরে কী করে সেই বক্তৃতার মঞ্চে উঠে সকলের চিত্ত জয় করলেন সেই কথা। সমবেত শ্রোতাদের তিনি ভাই বোন বলে সম্বোধন করেছিলেন।

বলেছিলেন, 'পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সংঘের পক্ষ থেকে আমি আজ আপনাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। সর্বধর্মের জননীস্বরূপা সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিরূপে, সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটি কোটি হিন্দুর পক্ষ থেকে আপনারা গ্রহণ করুন আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।' বললেন—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল-নানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

নদী যেমন নানা ধারায় প্রবাহিত হয় সমুদ্রের দিকে, তেমনি, হে প্রভু, বিচিত্র রুচির সরল ও কুটিল মানুষের তুমিই একমাত্র গন্তব্য স্থল। গীতায় আমাদের কৃষ্ণ বলেছেন, যে যেভাবে আমার উপাসনা করবে, আমি সেই ভাবেই তার কাছে প্রকাশিত হই। স্বামীজী এই সভায় দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার মৃত্যুকাল আসন্ন।' স্বামীজীর যে জীবনী লিখেছিলেন রোমা রোলাঁ, তাতে বলেছেন যে এই সভায় সবাই বলেছিলেন নিজ নিজ ভগবানের কথা, একমাত্র বিবেকানন্দই বলেছিলেন সকলের ভগবানের কথা। তাই এই বিশ্বধর্ম সম্মেলন তাঁকেই জানালেন শ্রেষ্ঠ বক্তার অভিনন্দন।

স্বাতি বলল ঃ গান্ধীজী কি তাহলে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা প্রথম করেন নি ?

হেসে বললুম ঃ না। তাঁর অনেক আগেই বিবেকানন্দ লিখেছিলেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বাতি খানিকক্ষণ নিঃশব্দে রইল। তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল ঃ মনে হয়, বাঙলার মানুষ স্বামীজীকে আজও পুরোপুরি সম্মান দিতে পারে নি। পেরেছে দক্ষিণের মানুষ।

তাকে উঠতে দেখে আমিও উঠে দাঁড়ালুম। আর তার কথার

অর্থ বুঝতে না পেরে প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকালুম তার মুখের দিকে।

স্বাতি বলল: কন্যাকুমারীর কথা মনে নেই? সমুদ্রের মধ্যে বিবেকানন্দ পাহাড়ে তারা স্বামীজীর স্মৃতিমন্দির তৈরি করছে দেখে এসেছি। এত দিনে হয়তো তা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙলার মানুষ আজও সে রকম কোন পরিকল্পনা নেয় নি।

বলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

আমি কোন প্রতিবাদ করতে পারলুম না। মনে হল, স্বাতি বোধহয় ঠিকই বলছে।

১৭

গাড়ির কাছে এসে ড্রাইভারকে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: উতোরপাড়ায় কোথায় যাব বুঝতে পেরেছ তো ?

ড্রাইভার তার মাথা নেড়েই বুঝিয়ে দিল যে বুঝতে পেরেছে।

চল।

বলে স্বাতি আমাকে আগে উঠিয়ে দিয়ে পরে নিজে গাড়িতে উঠল।

বেলুড় মঠ থেকে বেরিয়ে বালির উপর দিয়ে আমরা উত্তরপাড়ার দিকে চললুম। কিন্তু কেন সেদিকে যাচ্ছি, সে কথা তখনও স্বাতি আমাকে বলল না। কোন প্রশ্ন করতেও লজ্জাবোধ হল। স্বাতির জন্যে লজ্জা নয়, লজ্জা ড্রাইভারের উপস্থিতির জন্যে। স্বাতি যে আমাকে কিছু না জানিয়েই সেখানে নিয়ে যাচ্ছে, এ কথা আমি ড্রাইভারকে জানতে দিতে চাই নে। তাই নিঃশব্দে আমি বসে রইলুম।

ড্রাইভার যেখানে এসে দাঁড়াল, তাতে স্পষ্টই বুঝতে পারলুম যে আমার ভাড়াটে ঘরের পথ ধরব বলেই সে বুঝে নিয়েছে। এর পরে আর গাড়ি যায় না, এর পরে পায়ে হেঁটে গলির ভিতরে ঢুকতে হয়। গাড়ি থেকে নামবার সময় স্বাতি তার ব্যাগটাও হাতে করে নামল।

অন্ধকার তখনও গভীর হয় নি। কিন্তু গলির ভেতরে অন্ধকার হবে ভেবে স্বাতি তার ব্যাগ থেকে একটা ছোট টর্চ বার করে নিল। বলল: এইবারে চল।

খানিকটা এগোবার পরে আমি বললুম: এদিকে এসে তো কোন লাভ হল না।

কেন ?

দু দণ্ড যে তোমাকে বসতে বলব তার উপায় নেই। ঘরের তালা খুলতে পারব না।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে একটুখানি হাসল। যত মিষ্টি তার চেয়ে কৌতুকে উজ্জ্বল বেশি। তাই লজ্জিত ভাবে বললুম: এদিকে আসবে জানলে তালার চাবিটা সঙ্গে আনতুম।

এ কথারও উত্তর না দিয়ে স্বাতি হাসল। কিন্তু থামল না, ফেরার জন্যে পিছনও ফিরল না।

বললুম: হাসছ যে?

এইবারে সে উত্তর দিল, প্রসন্ন মুখে বলল: তোমার সব ভাবনার ভার কি আমি নিয়ে নিই নি!

আমি চমকে উঠলুম তার কথা শুনে। খানিকটা বিচলিত বোধও করেছিলুম। নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললুম: অকারণে এ দায়িত্ব তুমি কেন নেবে?

অকারণে!

বলে স্বাতি থামল। হাসল আমার মুখের দিকে চেয়ে। তারপরে বলল: টর্চটা ধর।

বলে হাতের টর্চ আমাকে দিয়ে নিজের ব্যাগ খুলে চাবি বার করল একটা। আমি সবিস্ময়ে দেখলুম যে সে আমারই ঘরের চাবি, আর আমার সেই ভাড়াটে ঘরের বন্ধ দরজার সামনেই এসে সে দাঁড়িয়েছে।

কেন জানি না, আমার রোমাঞ্চ হল। আমি তাকে কোন দিন এখানে আনি নি। তবে এই ঠিকানা তার জানা ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি পরিষ্কার বুঝতে পরলুম যে এখানে সে এর আগেও এসেছে। কিন্তু কেন এসেছে, সে কথা সে কোন দিন আমাকে বলে নি।

দরজা খুলে স্বাতি ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল। আমি তার হাতটা টেনে ধরে বললুম: না, অন্ধকার ঘরে ঢুকো না।

কেন ?

বলে স্বাতি চমকে ফিরে তাকাল।

আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম : ঘর অনেক দিন বন্ধ আছে। ভেতরটা নিরাপদ নয়।

এবার স্বাতি আমার হাত টেনে ধরে বলল : তাহলে তোমাকেও তো ঢুকতে দিতে পারি নে।

তারপরেই হেসে বলল : হাতের টর্চটা জ্বালো।

ছোট টর্চ, কিন্তু আলোর বেশ জোর আছে। দরজার সামনেই মেঝের উপরে অনেক চিঠিপত্র ছড়িয়ে আছে দেখলুম। স্থানে স্থানে চুনবালিও খসে পড়েছে। চারি দিক ধুলোয় ভরা বিশৃঙ্খল পরিবেশ। ভেবেছিলুম যে স্বাতি কোন মন্তব্য করবে, কিন্তু তার বদলে নিচু হয়ে সে মেঝের চিঠিগুলো তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিল।

আমি বাতি জ্বালতে গিয়ে দেখলুম যে বাতিটা জ্বলল না। স্বাতি তা লক্ষ্য করে বলল : দরকার নেই। চল ফিরে যাই।

বলে চিঠিগুলি নিজের ব্যাগে পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করে আমি বেরিয়ে আসতেই সে দরজায় তালা দিয়ে ফিরে চলল।

তার পিছনে চলতে চলতে আমি প্রশ্ন করলুম : এ কী হল ?

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে স্বাতি বলল : হাতে সময় থাকলে তোমার ফেরার খবরটাও পাড়ায় জানিয়ে যেতাম।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : কাকে ?

ঐ চায়ের দোকানের মালিককে।

তুমি চেনো হারানিধিকে ?

উত্তর না দিয়ে স্বাতি শুধু হাসল।

গাড়িতে উঠে স্বাতি ড্রাইভারকে বলল : ওপারে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে নামব।

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিল ড্রাইভার। আমরা উঠে বসতেই ফেরার পথ ধরল। কিন্তু বালি থেকে আমাদের নতুন পথ ধরতে হবে। বাঁ দিকে ফিরে গঙ্গার উপরে বিবেকানন্দ পুলের উপরে উঠতে হবে। এই পুলের উপর দিয়ে শুধু গাড়ি ঘোড়া নয়, রেলগাড়িও চলে—হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের উপর ডানকুনি থেকে দক্ষিণেশ্বর হয়ে শিয়ালদহ। বালি স্টেশনের কাছে ছোট্ কালভার্টের উপর দিয়ে গিয়ে নদীর পুলের উপরে ওঠে। দু ধার দিয়ে যাতায়াত করে অন্য যানবাহন। কিন্তু এ পুল কলকাতা থেকে দূরে বলে হাওড়া পুলের উপরে চাপ কমাতে সহায়তা করে না।

সরকার তাই গঙ্গার উপরে নতুন পুল তৈরির পরিকল্পনা করেছেন। গড়ের মাঠের দক্ষিণ দিকে এই পুল হবে। বটানিকাল গার্ডেন যেতে হলে হাওড়ার ভিড়ের মধ্য দিয়ে যাবার আর দরকার হবে না।

দেখতে না দেখতেই আমরা পুলের মুখে পৌঁছে গেলুম। টিকিটের জন্যে একটুখানি দাঁড়িয়েই চলতে লাগলুম পুলের উপর দিয়ে। পাশ দিয়ে পদযাত্রীরাও চলেছে নির্ভাবনায়। সন্ধ্যার বাতাসে শরীর ও মন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

স্বাতি বলল ঃ দক্ষিণেশ্বরের ইতিহাস বলবে না ?

এ তার ঠাট্টা কিনা বোঝবার জন্যে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। যখন মনে হল যে সে সত্যিই কিছু জানতে চাইছে, তখন বললুম ঃ দক্ষিণেশ্বরের ইতিহাস জানবার চেষ্টা করে আমি এক সময় হতাশ হয়েছিলুম।

কেন ?

বললুম ঃ বাইশ খণ্ডের বিশ্বকোষ খুলেই আমি সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছিলুম। দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে তাতে মাত্র চারটি লাইন আছে।—হুগলি নদীর ওপর চব্বিশ পরগণা জেলার একটি গ্রাম। কলকাতার কিছু উত্তরে। এখানে বারুদ তৈরির কারখানা,

সাহেবদের কতিপয় বাড়ি, বারোটি মনোহর শিবমন্দির ও একটি সুন্দর কালীমন্দির আছে।

আমি থামতেই স্বাতি বলল : ব্যস !

বললুম : ১৩০৪ সালে প্রকাশিত এই বইএ সম্পাদক এর বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন মনে করেন নি। বেলুড় মঠের তো কোন উল্লেখ নেই বিশ্বকোষে।

আশ্চর্য !

আশ্চর্য কিছুই নয়। এই থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি তখন বোধহয় জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত ছিল না।

স্বাতি বলল : তা কী করে সম্ভব ! দেবতা কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়, মন্দির চিরকালই জনসাধারণের।

বললুম : সব সময় নয়। রাজা ও জমিদাররা অনেক সময় গৃহ-দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছেন মন্দিরে নিজ প্রাসাদের এলাকার মধ্যে। জনসাধারণের সেখানে প্রবেশের কোন অনুমতি ছিল না।

অন্যায়।

অন্যায় কেন ? নিজের ঠাকুরঘরে কি আমরা সবাইকে ঢুকতে দিই ?

স্বাতি এ কথার প্রতিবাদ করল না। আমরাও গঙ্গার ওপারে পৌঁছে গেলুম। বললুম : এখানে বারুদের কারখানা আর নেই। তার বদলে একটি পেপার মিল ও দেশলায়ের কারখানা চলছে।

সাহেবদের বাড়ি ?

হেস্টিংস সাহেবের কুঠির কথা শুনেছি, আর গাজী পীরের স্থান ও কবরডাঙ্গা। এই সমস্ত নিয়ে ষাট বিঘে জমি কিনেছিলেন জানবাজারের বিধবা রাণী রাসমণি। সে হল বাঙলা ১২৬২ সালের কথা। এই জমির উপরেই কালীবাড়ি তৈরি হয়েছে।

স্বাতি বলল : মন্দির প্রতিষ্ঠারও একটা অলৌকিক গল্প আছে নিশ্চয়ই ?

বললুম : সে গল্প শুনেছি।

তারপরে সংক্ষেপে সেই গল্পটি তাকে বললুম।—

বিধবা হয়ে রাণী রাসমণি তীর্থ দর্শন করে বেড়াচ্ছিলেন। মেজ জামাই মথুরানাথ বিশ্বাস ছিলেন তাঁর খুব অনুগত। তাঁকে বললেন, এইবারে কাশী চল বিশ্বনাথ দর্শনের জন্যে। মথুরবাবু তখনই সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। পঁচিশখানা বজরা নৌকো জিনিস-পত্র ও খাদ্যদ্রব্যে ভরে গেল। অনেক আত্মীয় বন্ধু দাসদাসী সঙ্গে যাবে। কিন্তু যাত্রার আগের রাতে রাণীমা স্বপ্নে দেখলেন কাশীর অন্নপূর্ণাকে। তিনি আদেশ করলেন, কলকাতার কাছেই গঙ্গার ধারে শিবশক্তির প্রতিষ্ঠা কর। ঘুম থেকে উঠে রাণীমা বললেন, কাশী যাব না। ঐ টাকায় এইখানেই মন্দির করব অন্নপূর্ণার।

স্বাতি বলল : কোন পৌরাণিক কাহিনী নেই ?

বললুম : পৌরাণিক কাহিনী না থাকলেও কিংবদন্তী আছে। পুরাকালে দেউলিপোতা নামে একটা জায়গায় ছিল বাণ রাজার বাড়ি। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বর শিব। আর এই শিবের নামেই জায়গার নাম হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর।

গল্প শেষ হবার আগেই আমরা মন্দিরের সামনে পৌঁছে গেলুম, আর নেমে পড়লুম গাড়ি থেকে। স্বাতি বলল : এ তো কালীর মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির তো নয় ?

বললুম : যিনি কালী, তিনিই অন্নপূর্ণা। শিবের শক্তি সতী পিতৃগৃহে যাবার অনুমতির জন্যে স্বামীকে দশটি রূপ দেখিয়ে-ছিলেন—দশমহাবিদ্যার রূপ। তাঁর প্রথম রূপই হল কালী। কালী তারা ছিন্নমস্তার যেমন ভয়ংকর রূপ, তেমনি মোহিনী মূর্তি ষোড়শী ভুবনেশ্বরী কমলার।

স্বাতি বলল : কালীর কথা পরে শুনব। এইবারে মন্দিরটি ভাল করে দেখি।

বলে ভিতরে এগিয়ে গেল।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির আমি আগেও দেখেছি। কিন্তু আজ স্বাতি আমাকে মন্দিরটি ঘুরে ঘুরে দেখাল। মন্দিরের মস্ত চত্বর পেরিয়ে প্রথমে গঙ্গার ঘাটে চলে এলুম। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাঁধানো ঘাট ধাপে ধাপে গঙ্গার জল পর্যন্ত নেমে গেছে। সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে গঙ্গার জলে। ওপারে বেলুড়ের আলোও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর আবছায়া কঙ্কালের মতো দেখা যাচ্ছে হাওড়ার পুল।

স্বাতি বলল ঃ ভারি সুন্দর এই জায়গাটি, তাই না ?

বললুম ঃ ভাল না হলে সেকালের ষাট হাজার টাকা খরচ করে রাণী রাসমণি এই জমি কিনবেন কেন! আর শুনে আশ্চর্য হবে যে গঙ্গার এই ধারটা বেঁধে এই ঘাট তৈবি করতে রাণীমার এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা খরচ লেগেছিল। কলকাতার বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টর ম্যাকিণ্টস অ্যাণ্ড কোম্পানী এই সব তৈরি করেছিল।

শুধু ঘাট নয়, ঘাটের উপরে শিবের দ্বাদশ মন্দির, দ্বাদশ রুদ্র। এক দিকে যজ্ঞেশ্বর জলেশ্বর জগদীশ্বর নাগেশ্বর নন্দীশ্বর ও নরেশ্বর, অন্য দিকে যোগেশ্বর রত্নেশ্বর জটিলেশ্বর নকুলেশ্বর নাকেশ্বর ও নির্জরেশ্বর। এই সব মন্দিরে প্রবেশের পথ মূল প্রাঙ্গণের মধ্যে। এক দিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠলে ছটি শিব দর্শন ও প্রদক্ষিণ করে নেমে আসা যায়।

প্রাঙ্গণের মাঝখানে মূল মন্দির কালীর। নবরত্ন মন্দির। নবরত্ন বললে ঠিক বোঝা যায় না। মন্দির নির্মাণে বাঙলার নিজস্ব একটি স্থাপত্য রীতি আছে। আসল রূপটি হল চার চালা-ঘরের মতো। চারি ধার অর্ধবৃত্তাকার, আর চারটি কোণ নিচের দিকে ঝুঁকে মিলিত হয়েছে। ছোট মন্দিরে একটি শিখর। বড় মন্দিরগুলি পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন। চার কোণায় চারটি ছোট ছোট শিখর থাকলে পঞ্চরত্ন। এ রকমের পঞ্চরত্ন মন্দির বিষ্ণুপুরে অনেক

আছে। আর এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির নবরত্ন। এর শিখরের সংখ্যা নয়।

একটুখানি দূরে দাঁড়িয়ে আমরা এই মন্দিরের স্থাপত্য ভাল করে দেখলুম। প্রথম চারচালার উপরে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি চারচালা। তার উপরেও ছোট ছোট চারটি শিখর। মাঝখানে একটি। নটি শিখরবিশিষ্ট মন্দির বলেই নাম নবরত্ন মন্দির।

স্বাতি বলল: এ রকম মন্দির বোধহয় আর কোথাও নেই।

হেসে বললুম: কলকাতা শহরেই আর একটি আছে। ছবি নিলে কোন্‌টি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, আর কোন্‌টি নয়, তা অনেকেই বুঝবে না।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: এ মন্দির দেখতে হলে দক্ষিণ কলকাতায় যেতে হবে—টালিগঞ্জের নবরত্ন মন্দির। সেও প্রায় এক শো বছরের পুরনো।

টালিগঞ্জে এই রকম মন্দির আছে?

বললুম: পশ্চিম পুঁটিয়ারী পঞ্চাননতলায় গিয়ে খুঁজে বার করতে হবে।

ধীরে ধীরে আমরা মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলুম। দরজার বাইরে থেকেই দেখলুম দক্ষিণেশ্বরী ভবতারিণী কালীকে। শ্বেত-পাথরের মেঝের উপরে কালো পাথরের বেদী। তারই উপর রূপার শতদলপদ্মে শায়িত মহাকাল। তাঁর শ্বেতপাথরের বুকে ডান পা ফেলে দাঁড়িয়ে আছেন কালো পাথরের চতুর্ভুজা কালী করালবদনা ঘোরা মুক্তকেশী ও মুণ্ডমালা বিভূষিতা। তাঁর বাঁ দিকের দুই হাতে খড়্গ ও নরমুণ্ড, আর ডান হাতে বরাভয়। পরিধানে তাঁর বাঘছাল নয়, বেনারসী শাড়ি।

কালীকে আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে পেয়েছি। মহিষাসুর বধের পর শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবতারা যখন দেবীর স্তব করছেন, তখন দেবী সেখানে গঙ্গাস্নানে

যাবার ছল করে এসে উপস্থিত হলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে তোমরা কী করছ? কিন্তু দেবতারা কোনও উত্তর দেবার আগেই তাঁর শরীর থেকে অম্বিকা উৎপন্ন হয়ে বললেন, দৈত্যদের হাতে পরাজিত এই দেবতারা আমার স্তব করছে। বলেই ইনি কৌষিকী নামে হিমালয়ে চলে গেলেন। আর দেবী তাঁর গৌর বর্ণ ত্যাগ করে কৃষ্ণবর্ণা কালিকা নামে বিখ্যাত হলেন।

ভবিষ্যপুরাণ ও দেবী পুরাণেও আমরা কালীকে পাই। কালী বা মহাকালীর উগ্র রূপ, ভদ্রকালীর রূপ শান্ত ও সুন্দর। কালী বাঙালীর প্রিয় দেবতা, তাঁর পূজা বাঙলায় নানা নামে অনুষ্ঠিত হয়— শ্মশানকালী রক্ষাকালী সিদ্ধকালী গুহ্যকালী দক্ষিণা কালী। বিপদ আপদ মহামারী থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমরা কালীপূজা করি, কালীপূজা করে ডাকাত বেরোয় ডাকাতি করতে। কার্তিকের অমাবস্যার রাতে হয় কালীপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে কালীর ফলহারিণী পূজা আর রটন্তীপূজা মাঘ মাসে।

এ কথা আজ অস্বীকার করলে চলবে না যে তন্ত্রমতেই বাঙলায় এই শক্তির সাধনা প্রাধান্য পেয়েছে। সুরথ রাজার দুর্গোৎসব দক্ষিণ ভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন অযোধ্যার রামচন্দ্র। কিন্তু বাঙালীরাই এই দুর্গাপূজা সারা ভারতে ছড়িয়েছে। কিন্তু দুর্গার কোন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নি, বাঙালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে কালীর। ভারতের প্রায় সমস্ত কালীমন্দির প্রবাসী বাঙালীর কীর্তি। বিদেশে বাঙালী ক্লাব প্রতিষ্ঠার আগে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে।

১৮৫৫ সালের ৩১শে মে স্নানযাত্রার দিন দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ভবতারিণী কালীকে প্রণাম করে আমরা নেমে এলুম।

এই মন্দির প্রাঙ্গণেই রাধাগোবিন্দেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একই দিনে। কষ্টিপাথরের কৃষ্ণের পাশে অষ্ট ধাতুর রাধা। গোপাল ও গরুড়ের মূর্তিও আছে। আর একটি মূর্তি দেখে স্বাতি আমাকে

জিজ্ঞাসা করল : রাধিকার ডান পাশে শ্রীকৃষ্ণের আর একটি মূর্তি কেন ?

এই মূর্তি আমি আগে কখনও লক্ষ্য করি নি। কিন্তু এই মূর্তির গল্প আমার মনে পড়ে গেল। অসাবধানতার জন্যে পুরোহিতের হাত থেকে পড়ে গিয়ে গোবিন্দজীর পা ভেঙে গিয়েছিল। দুর্ভাবনার অন্ত নেই কারও। বড় বড় পণ্ডিতদের ডাকা হল বিধানের জন্যে। সবাই এক বাক্যে রায় দিলেন যে ভাঙা বিগ্রহে পূজা শুদ্ধ হয় না। একে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে নূতন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মেজ জামাই মথুরবাবুর মুখে রাণীমা এই বিধান শুনলেন। বললেন, রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করা হোক। ঠাকুর তো পণ্ডিতদের বিধান শুনে আশ্চর্য! 'এ বিগ্রহ ফেলে দেবে, সে কি কথা গো! রাণীর জামাইদের কারও পা ভাঙলে কি হবে বল তো! তাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আর এক জামাই আনা হবে! না, তার চিকিৎসা চালাবে! গোবিন্দজীর ভাঙা পা জোড়া লাগিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।' রাণীমা এই বিধানই সেদিন মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ট্রাস্টিরা সেই ভাঙা মূর্তিটি সরিয়ে রেখে নূতন মূর্তি বসিয়েছে রাধিকার পাশে। ভাঙা মূর্তিটি কিন্তু গঙ্গার জলে ফেলে দিতে সাহস পায় নি। সেটিই এখন রাধিকার ডান পাশে দেখছি।

মন্দির থেকে নেমে এসে স্বাতি ঘড়ি দেখল। বলল : হাতে সময় বেশি নেই। আর যা দেখবার আছে, তাড়াতাড়ি দেখে নিতে হবে।

একটু আগে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। এখনি স্বাতি কেন সময়ের অভাবের কথা বলছে বুঝতে পারলুম না। কোন প্রশ্নও করলুম না তাকে। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে ঠাকুরের ঘর দেখলুম। তাঁর ব্যবহৃত সব জিনিসই আছে এই ঘরে। এই ঘরেই তিনি সারদা মাকে ষোড়শী পূজা করেন এক ফলহারিণী কালীপূজার দিনে।

উত্তর দিকের ফটক দিয়ে বেরোলেই রাণী রাসমণির কুঠী। এই

কুঠী থেকেই মথুরবাবু ঠাকুরকে পায়চারি করতে দেখেছিলেন, আর ভেবেছিলেন ঠাকুর তো নয়, সামনের দিকে মা কালী আর শিব হলেন পিছনের দিকে। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

ঠাকুরের মা ও স্ত্রী সারদাদেবী যেখানে বাস করতেন, তার নাম নহবৎ। ঠাকুরের ঘরের উত্তরে এই নহবৎ। পঞ্চবটীও এখান থেকে দূরে নয়। পাশে সাধন কুটির, ঠাকুরের সাধনার স্থান।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করল: পঞ্চবটী মানে কি পাঁচটি বটগাছ?

হেসে বললুম: পাঁচটি বটগাছ নয়, পাঁচটি গাছ—অশ্বত্থ অশোক আমলকী বট ও বেল। এই পঞ্চবটীতে বৃন্দাবনের রজ ছড়িয়ে মাধবীলতা লাগানো হয়েছিল। তোতাপুরীজীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে ঠাকুর সাধনা করেছিলেন এইখানে। আর বাগানের উত্তর-পূর্ব কোণে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে তন্ত্রসাধনা শিখেছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে।

পঞ্চমুণ্ডি বুঝি পাঁচটি মুণ্ড?

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম: পাঁচটি মুণ্ড ঠিকই, কিন্তু সবকটি মানুষের নয়। একটি মানুষের আর বাকি চারটি শেয়াল কুকুর ষাঁড় ও সাপের। ঠাকুর শুধু হিন্দুদের সব সম্প্রদায়ের মতেই নয়, অন্যান্য ধর্মমতেও সাধনা করেছিলেন।

এ সব কথা শোনবার জন্যে স্বাতি দেরী করল না। বলল: ঠাকুরের কথা পরে শুনব। এখন আমাদের ফিরতে হবে।

বলে গাড়িতে উঠে বসল।

তার পাশে বসে আমি বললুম: এখন তোমাকে ভারি ব্যস্ত মনে হচ্ছে!

ব্যস্তই তো!

বলে ড্রাইভারকে বলল: সোজা চৌরঙ্গী চল।

কিন্তু সেখানে কী দরকার আমাকে তা বলল না।

১৪

স্বাতির পরিকল্পনা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ড্রাইভারকে পথ দেখিয়ে সে আমাকে যেখানে নিয়ে এল, সে একটি ডাক্তারের চেম্বার। হাড়ের ডাক্তার। বাড়ি থেকে সে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বেরিয়েছিল। তা বুঝতে পারলুম তার মন্তব্য শুনে। বলল : মিনিট দশেক আগেই এসে গেলাম। বোসো।

বলে সে নিজেই বসে পড়ে হাতের ব্যাগ খুলে চিঠিগুলো বার করে ফেলল। আমার উত্তরপাড়ার ঘরে পড়ে থাকা সেই চিঠিগুলো। বেছে বেছে কয়েকখানা চিঠি খুলে সে পড়েও ফেলল। এক সময় তার দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেখলুম। আমার দিকে চেয়ে হেসে সেই চিঠিগুলো আবার তার ব্যাগে ভরে রাখল। লম্বা খামের এই চিঠিগুলো দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে এ সব আমার নানা জায়গায় আবেদনপত্রের উত্তর। কোনখান থেকে সুখবর হয়তো এসেছে। কিন্তু তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হল। আশেপাশে আরও অনেক রোগী বসে আছে। নানা ভাবে তাদের হাত পা বাঁধা।

আমার পরীক্ষায় কিছু সময় লাগল। নতুন ছবি তুলে ডাক্তার রায় দিলেন, কোন ক্ষতি হয় নি, আরও দিন কয়েক একটু সাবধানে থাকতে হবে। ডাক্তারের ফী দিয়ে আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলুম।

কিন্তু স্বাতি সরাসরি বাড়ি এল না। একটা রেস্তোরাঁ থেকে রাতের আহারের সামগ্রী সংগ্রহ করে আনল। ফিরে এসে বলল : আজ আমি খাওয়াচ্ছি, এর পরে তুমি খাওয়াবে।

তার কানের কাছে মুখ এনে খুব সাবধানে বললুম : চির-দিন তো ?

স্বাতির লজ্জা আমি দেখতে পেলুম। হঠাৎ এক ঝলক রক্ত যেন তার চোখে মুখে কানের পাশে উঠে এল। কিন্তু কোন উত্তর সে দিল না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে বলল: কোন কলেজে একটা কাজ পেলে তোমার এই ঘুরে বেড়ানোর কাজটা ছেড়ে দেবে তো?

বললুম: আগে পেতে দাও, তারপরে ভেবে দেখব।

স্বাতি বলল: তবে ভাবতে শুরু কর।

তারপরেই বলল: কলকাতায় আমিও একটা চাকরি পেয়েছি জানো?

সত্যি নাকি!

স্বাতি রাগের ভান করে বলল: মিথ্যে ভাবছ নাকি?

এ আমাদের একটা মুদ্রাদোষের মতো, কোন খুশির খবর শুনলেই বলে ফেলি, সত্যি নাকি! যেন বিশ্বাস করি নি কথা। তাই বললুম: সন্দেশ খাই নি বলেই এই কথা বলছি।

স্বাতি হেসে বলল: বুঝেছি। সন্দেশও খাওয়াতে হবে।

বলে একটা ভাল দোকান থেকে এক বাক্স সন্দেশ কিনে বাড়ি ফিরল।

সুবলবাবু বাড়ির বাইরে পথের উপরেই পায়চারি করছিলেন। স্বাতি গাড়ি থেকে নেমেই বলে উঠল: আপনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাই না?

সুবলবাবু ব্যস্ত ভাবে বললেন: বারে বারে টেলিফোন আসছে কিনা, তাই একটু ভয়ই পেয়েছিলাম।

কে টেলিফোন করছে?

একজন মহিলা, তাঁর নম্বরটা টুকে রেখেছি। তিনি দুবার টেলিফোন করেছেন। আর যিনি পাঁচ ছবার করেছেন তিনি পুরুষ। কিন্তু নিজের নামও বললেন না, টেলিফোন নম্বরও দিলেন না।

সে কি!

বললেন, আমাকে আপনারা চিনবেন না।

এ কথা শুনে স্বাতি আরও আশ্চর্য হল। আর ঘরের ভিতরে টেলিফোনের রিং হচ্ছে শুনে ছুটে চলে গেল।

সুবলবাবু এবারে আমাকে বললেন: আপনারা খেয়ে এসেছেন তো?

বললুম: না।

না!

মনে হল, ভদ্রলোক যেন জলে পড়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন: তবে আমাকে যে বলে গেলেন—

ঠিকই বলেছেন। আমরা খাবার কিনে এনেছি।

তাই বলুন।

বলে ভদ্রলোক যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

আমি ভিতরে ঢুকতেই স্বাতির গলা শুনতে পেলুম: তোমার টেলিফোন।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে আমি টেলিফোন ধরলুম। হ্যালো বলতেই ওধার থেকে এক ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন: কন্‌-গ্র্যাচুলেশন্‌স্ ব্রাদার। আমি—না থাক, কাল সকালে সশরীরে এসেই নিজের পরিচয়টা দেব।

কিন্তু কিসের জন্যে কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্?

সে কি, আপনার খবরটাও কি আমাকে দিতে হবে নাকি?

এ কথার কী উত্তর দেব ভাবছিলুম। এমন সময় প্রশ্ন হল: কোনও প্রোগ্রাম নেই তো?

এখন তো কিছু মনে পড়ছে না!

মনে পড়লেও ভুলে যাবেন। আমরা এসেই একটা প্রোগ্রাম করব। টা-টা—

বলে ভদ্রলোক টেলিফোন রেখে দিলেন।

আমি ফিরে আসতেই স্বাতি বলল ঃ কে ?

জানি নে।

মানে ?

মানে, কাল সশরীরে এসে পরিচয় দেবেন। আর এক সঙ্গে—

বুঝেছি।

বলে স্বাতি একটা টেলিফোন নম্বর দেখেই বলে উঠল ঃ এ তো পপির নম্বর।

বলেই ডায়াল ঘুরিয়ে তার বন্ধুকে ডাকল।

কথাবার্তার শেষে প্রসন্ন মুখে ফিরে এসে বলল ঃ পপিরাই টেলিফোন করছে। পপি আর তার বর। হালদার মশাই ওদেরই বিয়ের খবর দিয়েছিলেন। আর ওঁর কাছেই তারা আমাদের খবর পেয়েছে, যত সব আজগুবি খবর!

টেলিফোনে স্বাতির টুকরো কথাবার্তায় আমি কিছু অনুমান করতে পেরেছিলুম। হালদার মশায়ের দেওয়া খবর সে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার বন্ধুর দৃঢ় প্রত্যয়কে আলগা করতে পেরেছে বলে মনে হয় নি। কিন্তু আমি একটু কৌতুক করবার লোভ ত্যাগ করতে পারলুম না, বললুম ঃ ওদের খবর যখন ঠিক দিয়েছেন, তখন আমাদেরই বা বেঠিক খবর দেবেন কেন!

স্বাতি রাগের ভাণ করে বলল ঃ তোমারও কি মাথা খারাপ নাকি!

বললুম ঃ মাথা খারাপ নয়, কলকাতায় এসে মাথাটা পরিষ্কার হচ্ছে।

স্বাতি বলল ঃ নাও, মুখ হাত ধুয়ে নাও। খেয়ে নেওয়া যাক। কাল ভোরবেলায় আবার উঠতে হবে।

কেন?

পপিরা সকালেই এসে জুটবে।

সত্যিই তারা ভোরবেলাতেই এসে উপস্থিত হল। ভদ্রলোকের

গোলগাল চেহারা, কিন্তু বয়সের চেয়ে কচি তার মুখখানি। একটু ফুলো-ফুলো, আর কানের নিচে অবধি চাপ ঝুলফি নেমেছে, নাকের নিচে মশমশে গোঁফ। আর মাথার চুল লম্বা হয়ে পিছনে সার্টের নিচে ঢুকে গেছে, সামনেটাও অবিন্যস্ত। ভদ্রলোক অত্যন্ত আঁটোসাঁটো প্যাণ্ট পরেছে সরু পায়ের, আর গলায় একটা লাল রুমাল।

ভদ্রলোককে ভাল করে দেখতে আমার বেশ সময় লাগছিল। কিন্তু আমাকে দেখতে তার মোটেই সময় লাগল না। একটু হেলে-দুলে দ্রুত এগিয়ে এসেই আমার ডান হাতটা ঝাঁকিয়ে বলল: আমি উমাশঙ্কর, এঁর ইয়ে—

বলে পপির দিকে তাকাল সগৌরবে।

এইবারে পপিকে দেখলুম। ফিনফিনে পাতলা সিল্কের শাড়ি, গায়ের জামাটা এতই ছোট যে আমারই লজ্জা হল। কিন্তু তার কোন লজ্জা হল না। বলল: তোমার এই অভ্যেস ছাড়বে!

আই অ্যাম সরি। মানে—

একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল: কী বলব তাহলে?

স্বাতি হেসে বলল: কিছুই বলতে হবে না, আমরা বুঝতে পেরেছি। তাই না?

বলে যেই আমার দিকে তাকাল সকৌতুকে, উমাশঙ্করও তখনি বলে উঠল: আমরাও পেরেছি। মানে, ইয়ে—

আবার!

হ্যাঁ, মানে হালদার মশাই বললেন বলেই—

না বললেও বুঝতে পারতাম। তাই না?

নিশ্চয় নিশ্চয়।

বলে উমাশঙ্কর আমাকে জিজ্ঞাসা করল: আপনারা রেডি?

কিসের জন্যে?

হোয়াট্! রাতে আমরা অ্যালার্ম দিয়ে উঠলুম, আর আপনারা বলছেন ইয়ে···

পপি বোধহয় তার শেষ কথাটি শুনতে পায় নি। আর স্বাতি সহাস্যে অবিলম্বে উত্তর করল: অত তাড়া কিসের! কলকাতা শহর তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না!

তারপরে আমার দিকে ফিরে বলল: আমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ওরাই তোমাকে কলকাতা শহর দেখাবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকালুম তাদের মুখের দিকে। আর উমাশঙ্কর বলে উঠল: বুঝলেন না, এ একটা ইয়ে, থুড়ি, আইডিয়া। পপি বলল, আপনার বইএ আমাদের নাম বেরিয়ে যাবে। মানে, আপনি বই লেখেন কী করে বলুন তো! চেষ্টা করলে—

আপনিও পারবেন।

পারব! দেখলে তো? তুমি বলছিলে—

ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখল। ধুতির উপরে একখানা চাদর, গায়ে কোন জামাও নেই। পরতে অসুবিধে হয় বলেই সকালে উঠে আর জামা পরি নি। একখানা চাদর জড়িয়ে নিয়েছি গায়ে। তারপরে নিজের পোশাকটা দেখে নিয়ে বলল: দরকার হলে আমিও—

না না, তার দরকার নেই।

স্বাতি বলল: এসো চায়ের টেবিলে।

বলে খাবার ঘরে নিয়ে এল।

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে এর মধ্যেই সে অনেক আয়োজন করে ফেলেছে। উমাশঙ্করই বিব্রত বোধ করল বেশি। চেঁচামেচি করে বলতে লাগল: এ সব কী করেছেন! মানে—

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল: আমরা তো খেয়েই বেরিয়েছি। মানে আমি—

তাহলে তুমি খেয়ো না। স্বাতির কথায় আমি না খেয়ে এসেছি, আমি খাব।

বলে পপি বসে পড়ল।

কিন্তু খাবার বেলায় দেখা গেল যে উমাশঙ্করই তৎপর বেশি। সবার চেয়ে সেই খেল বেশি। আর সন্দেশের উপরে তার ঝোঁকটাই বেশি। দৃষ্টির ভৎর্সনায় পপি তাকে সংযত করতে পারল না।

সামনের সপ্তাহে তার বিয়ের দিনটাও জানা গেল। নিমন্ত্রণ হল আমাদের দুজনেরই। পপি জিজ্ঞাসা করলঃ দিল্লী থেকে মাসিমারা কবে আসছেন ?

স্বাতি বললঃ ঠিক নেই।

সে কি !

কাল টেলিগ্রাম করে এখানে আসার খবর দিয়েছি। এইবারে জানতে পারব।

কিন্তু উমাশঙ্কর তখন অন্য কথা ভাবছিল। হঠাৎ বলে উঠলঃ বিয়ের আগেই রোমান্সটা জমে ভাল, তাই না ব্রাদার ? মানে—

আমি হেসে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললঃ মানে শুধু দিনের বেলায় নয়, দিনে রাতে। এই যেমন আপনাদের।

আমি স্বাতির মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলুম যে সে খুবই গম্ভীর হয়ে গেছে। বোধহয় বিরক্তও হয়েছে। কিন্তু আমি উমাশঙ্করকে উস্কাবার জন্যে বললুমঃ দিন কয়েকের জন্যে কোথাও বেড়িয়ে আসুন না।

অত্যন্ত পুলকিত হয়ে ভদ্রলোক বললেনঃ কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো ?

বললুমঃ এই ধরুন সমুদ্রের ধারে দীঘায়, কিংবা সুন্দরবনের দিকে কোন নতুন জায়গায়—

উমাশঙ্কর যেন লাফিয়ে উঠল, বললঃ ব্রাদার, আপনার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছা করছে। কবে যাওয়া যায় বলুন তো ?

পপি বললঃ এদেরও সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু।

অ্যাঁ !

বলে উমাশঙ্কর একটু দমে গিয়েছিল। পপি একটা ধমক দিয়ে বলল : বুঝতে এত সময় লাগে কেন ?

সময়! হ্যাঁ, মানে—বুঝেছি, বুঝেছি।

স্বাতি হেসে বলল : মাসিমাকে বলবে, স্বাতির সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি। এই তো!

উঁহু। বলব, স্বাতিদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি।

ও, তাই বুঝি!

বলে উমাশঙ্কর আমার মুখের দিকে তাকাল করুণ ভাবে।

আমি বললুম : আপনাদের অসুবিধা হলে আমরা তমলুকের বর্গভীমার মন্দির দেখে ফিরে আসব। কী বল ?

বলে স্বাতির দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : না। ঘরের কাছের অমন সুন্দর জায়গাটি আমিও দেখি নি। এখন তো কলকাতা থেকেই মোটরে যাওয়া যায়, এই সুযোগে দেখে আসব বৈকি!

পপি বলল : কবে আমরা যাব বল তো ?

উমাশঙ্কর তার গলার লাল রুমালটা ধরে খানিকক্ষণ টানাটানি করল, তারপরে বলল : কাল তো হবে না, পরশু।

কাল হবে না কেন ?

বুঝলে না! মানে, কাল অফিসে গিয়ে—

বললুম : ছুটি নেবেন। দেখবেন, ফেরার পথে তমলুকের বর্গভীমার মন্দির দেখার সময় যেন থাকে।

সিওর সিওর।

বলে ভদ্রলোক আরও কয়েকবার তার গলার রুমালে হাত বুলিয়ে নিল।

কেন জানি না, এই রুমালটি সম্বন্ধে আমার কৌতূহল জন্মাল। বললুম : আপনার ঐ লাল রুমালে হাত বুলিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হচ্ছেন দেখছি!

ঠিক বুঝেছেন। মানে, এই রুমালটা গলায় আছে ভাবলেই নিশ্চিন্ত বোধ করি।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। উমাশঙ্কর তা বুঝতে পেরে বলল : পাড়ার ছোঁড়ারা এক সময় পেছনে লেগেছিল। রোজ চাঁদার অঙ্ক বাড়ছে, পার্টির চাঁদা। মানে, পার্টি তাদের, আর চাঁদা দেব আমি। আর যতই দিচ্ছি, ততই খাঁই বাড়ছে। না বললেই চিঠি লিখছে, মুণ্ডু নেব। ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোতেই পারি না। বুঝুন ব্যাপারটা।

তারপর ?

তারপর আর কী! টেলিফোনে শলাপরামর্শ করলুম বন্ধুদের সঙ্গে। একজন বলল, গলায় লাল রুমাল বাঁধো, আর ওদের দলেই ভিড়ে যাও। ওরাই তোমাকে রক্ষা করবে।

প্রসন্ন মুখে উমাশঙ্কর তার চওড়া গোঁফে একবার হাত বুলোল, তারপর লাল রুমালে হাত দিয়ে বলল : সত্যি ব্রাদার, এই পরামর্শ শুনেই প্রাণে বেঁচে গেলুম।

পপি বলল : তোমরা তো কলকাতায় বেশি থাকো না, কিছু দিন আগে এই শহরে চলাফেরা করাই বিপজ্জনক ছিল। এক পাড়ার লোক আর এক পাড়ায় গেলে আর ফিরত না। নিজের পাড়াতেও সতর্কভাবে চলতে হত দিনের বেলায়। অন্ধকার হবার পর কত দিন বাড়ি থেকে বেরোই নি বল।

বলে উমাশঙ্করের মুখের দিকে তাকাল।

উমাশঙ্কর উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল : সে এক বীভৎস সময় ব্রাদার। পৈতৃক ঘর বাড়ি ছেড়ে লোকে পালিয়ে যেতে লাগল। ভাল ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজ ছেড়ে দিল্লী আগ্রায় পড়তে চলে গেল। তা না হলে হয় ছাত্রদের মার, নয় পুলিশের। আর কথায় কথায় খুন। কলকারখানার মালিকেরা তো কারখানা বন্ধ করে যন্ত্রপাতিই সরিয়ে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করল। আমরা

ভয় পেয়েছিলুম, কলকাতা শহরটাই হয়তো লোপাট হয়ে যাবে।

ভদ্রলোকের কথার ধরনে আমার হাসি পাচ্ছিল। তাই দেখে সে চটে উঠল, বলল: আপনি হাসছেন ব্রাদার! নিজের চোখে এ সব দেখলে হাসতে পারতেন না। কলকাতার সত্যি খবর দিল্লীতেও পৌঁছত না।

আমি দিল্লীতে ছিলুম না। আমি ছিলুম আসামে। কলকাতার কাগজই আমি পড়তুম। অরাজকতার খবর আমার জানা ছিল। কিন্তু এই সব সাময়িক ব্যাপার বলেই আমি মনে করতুম। আর তাই প্রমাণ হয়ে গেছে।

চা খাওয়া আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। স্বাতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল: রাজনীতি আবহাওয়ার মতো ঋতু পরিবর্তন করে। তার আয়ু শিল্প-সংস্কৃতির মতো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কলকাতা বাঙালীর সংস্কৃতির কেন্দ্র, তাই কলকাতা চিরকাল কলকাতাই থাকবে।

আমি হাসলুম তার কথা শুনে। আর তাই দেখে সে বলে উঠল: হাসলে যে!

বললুম: এ তোমার নিজের কথা, না—

নিজের কথা।

বলে সে বেরিয়ে গেল।

উমাশঙ্কর ও পপিও উঠে দাঁড়িয়েছিল বেরোবার জন্যে। তারা ভেবেছিল যে স্বাতি বোধহয় রাগ করে সরে গেল। কিন্তু পরের মুহূর্তেই তাকে দেখা গেল আমার একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি হাতে। আমার গায়ের চাদরখানা টেনে নিয়ে বলল: এইটা গায়ে দিয়ে নাও।

বলে বেশ যত্ন করে পাঞ্জাবিটা পরিয়ে দিয়ে চাদরটা আবার গায়ে জড়িয়ে দিল। তারপরে পপির দিকে চেয়ে বলল: একটুখানি সময় দাও, আমি ওপরের ঘর থেকে আসছি।

আমরা বাহিরে এসে স্বাতির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম

১৫

স্বাতির জন্যে বেশিক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হয় নি। উপব তলা থেকে সে তার ব্যাগ নিয়ে নেমে এল।

আসুন।

বলে উমাশঙ্কর তার গাড়িব কাছে এগিয়ে গেল। পপি গেল অন্য দিকে। আর দুজনে পিছনেব দুটি দরজা খুলে আমাদের গাড়িতে উঠিয়ে দিল। নিজেরা বসল সামনে। আর তার পরেই উমাশঙ্কর আর্তনাদ করে উঠল : এই যা!

পপি চমকে উঠে বলল : কী হল?

উমাশঙ্কর তখন দু হাতে তার জামা ও প্যাণ্টের পকেট হাতড়াচ্ছিল। বলল : মানে ইয়ে খুঁজছি— ।

কী খুঁজছ তা বলবে তো?

বলে পপি একটা ঠেলা দিল উমাশঙ্করকে।

মানে বুঝলে না! সেই কাগজটা।

কোন্ কাগজ? আর কাগজের এখন দরকারই বা কী?

পিছন থেকে স্বাতি বলল : এক টুকরো ছাপানো কাগজ?

উল্লসিত ভাবে উমাশঙ্কর বলে উঠল : হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। কাগজটা কোথায় রেখেছি বলুন তো?

স্বাতি হেসে গাড়ি থেকে নেমে গেল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বিড়ির মতো পাকানো একটি বস্তু তার হাতে দিয়ে বলল : ঘরে বসে এই কাগজের টুকরোটা তো আপনি পাকাচ্ছিলেন। তারপরে ঘরের কোণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

উমাশঙ্কর ততক্ষণে কাগজখানা খুলে সমান করে নিয়েই বলে উঠল : এই তো। আপনি না দেখলে কী মারাত্মক ব্যাপার হত বলুন তো!

আমি একটুখানি উঁচু হয়ে দেখে নিলুম কাগজখানা—সরকারি টুরিস্ট ব্যুরোর কলকাতা শহর দেখার ইটিনেরারি। হেসে বললুম : এটা সঙ্গে না থাকলে কি আমরা কলকাতা শহর দেখতে পারতুম না ?

উমাশঙ্কর তখন কাগজের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। বলল : একটা ইটিনেরারি সঙ্গে থাকলে খুব সুবিধে হয়। কোন্ জায়গার পর কোন্ জায়গায় যেতে হবে,—কোথায় কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে --

স্বাতি বলল : নিজেদের ইচ্ছামতো চলতে আরও ভাল লাগবে না কি ! যেখানে খুশি যাব, যতক্ষণ খুশি দেখব—কোন নিয়মকানুন মানব না, তবেই তো বেড়ানোব আনন্দ।

ঠিক বলেছেন।

বলেই উমাশঙ্কব কাগজখানা বাহিরে ফেলে দিচ্ছিল। আমি খপ্ কবে সেখানা কেড়ে নিয়ে পড়ে ফেললুম।

সকাল সাড়ে আটটায় ডালহৌসি স্কোয়ারে টুরিস্ট অফিস থেকে টুবিস্ট বাস ছাড়বে। সাধারণ বাসের ভাড়া মাথা-পিছু পাঁচ টাকা, আর আট টাকা ভাড়া এয়ার-কণ্ডিসণ্ড বাসেব। প্রোগ্রাম সারা দিনের—সকাল সাড়ে আটটা থেকে বারোটা চল্লিশ, আবার দুটো থেকে সাড়ে পাঁচটা। এস্‌প্লানেড এলাকায় নিজের ব্যবস্থায় লাঞ্চ খেতে হবে।

স্বাতিও এক নজরে দেখে নিয়ে বলল : কী কী দেখায় বল তো ?

বললুম : ইডেন গার্ডেন দেখিয়ে গঙ্গার ওপারে বটানিকাল গার্ডেন, বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বর।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : আমরা তো কাল দেখে এলাম !

পপি পুলকিত হয়ে বলল : বাঁচা গেছে। ওসব জায়গায় কি—

বলেই সে থেমে গেল। বোধহয় থামত না। স্বাতি তার আগেই জিজ্ঞাসা করেছিল : ফেরার পথে কিছু দেখায় কিনা দেখ তো !

বললুম ঃ জৈনমন্দির আর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।

পপি বলল ঃ একটা জায়গাও ইণ্টারেস্টিং নয়।

স্বাতি কোন প্রতিবাদ না করে বলল ঃ তারপর ?

বললুম ঃ দুপুরে লাঞ্চের পর জাদুঘর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চিড়িয়াখানা—

পপি বলল ঃ এ সব তো ছেলেমানুষে দেখে।

আর আমি আমার কথা শেষ করলুম ঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর রবীন্দ্রসরোবর দেখিয়ে এসপ্লানেড ফিরবে গড়িয়াহাটা হয়ে।

ব্যাস !

পপির এই উক্তি শুনে আমি ঠিকই বুঝেছিলুম যে সে কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান না দেখার জন্যে আপসোস করে নি। মহাবোধি সোসাইটি, থিওসফিকাল সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি, মহাজাতি সদন বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে তার কাছে দর্শনীয় স্থান নয়, তা না বললেও বুঝি। কিন্তু কী না দেখানোর জন্যে সে এই মন্তব্য করল, তা জানবার ইচ্ছা হল।

স্বাতি বলল ঃ বিরলা প্ল্যানেটেরিয়ামের কথা বলছিস নাকি !

প্যাগল !

বলে পপি একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তারপরে বলল ঃ নিউ মার্কেটে শপিং করে কি সারা দিন কাটানো যায় না ?

উমাশঙ্কর ভয়ার্ত স্বরে বলল ঃ বিদেশের মেয়েরা শুনেছি শপিং-এর চেয়ে উইণ্ডো শপিংই বেশি পছন্দ করে। মানে—

তা বলবেই তো।

বলে পপি একটা মুখভঙ্গি করল। আর স্বাতি সকৌতুকে তাকাল আমার দিকে।

আশুতোষ মুখার্জি রোড ধরে আমরা তখন এগিয়ে চলেছিলুম

ইংরেজের কলকাতার দিকে। ভারতবর্ষের মাপকাঠিতে কলকাতা কোন পুরাতন শহর নয়। এ শহরের বয়স আজও তিন শো বছর হয় নি। গঙ্গার ধারে ছোট ছোট গ্রাম ছিল তিনটি—কলিকাতা গোবিন্দপুর ও সুতানটি। নানা দেশের বণিকেরা এই গ্রামের ধার দিয়ে আসা যাওয়া করত। ইংরেজরাও এক দিন এল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙলা দেশের এজেণ্ট জব চার্ণকও এক দিন এইখানে এলেন জনাতিরিশেক সৈন্য নিয়ে। এই শস্য-শ্যামল গ্রাম তাঁর পছন্দ হল, চেঁচিয়ে বললেন: Here will I build, and here and here!

এ হল ১৬৯০ সালের কথা। বর্তমান কলকাতার ভিৎ স্থাপন করলেন জব চার্ণক। আর গোল্ডস্‌বরা বললেন, একটি দুর্গ স্থাপন কর। দশ বছর পরে রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে ফোর্ট উইলিয়ামও তৈরি হয়ে গেল।

পিছন ফিরে উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল: কলকাতার সব কিছু তো আপনার দেখা আছে?

বললুম: দেখা খুব কমই আছে, বইএ পড়া আছে কিছু।

মানে?

মানে দেখবার সুযোগ তো পাই নে। তাই বই পড়েই দেখার শখ মেটাই।

পপি বলল: গোটা ভারতবর্ষটা আপনি দেখেছেন শুনেছি—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল:

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

আমি হেসে বললুম: কথাটা খুব সত্যি। আজও কলকাতা আমার কাছে নতুন শহর বলে মনে হয়।

উমাশঙ্কর বলে উঠল: তবে তো আপনাকে এই সব পথঘাট চিনিয়ে দিতে হবে দেখছি।

বললুম: দিলে খুবই ভাল হয়।

তখন আমরা এলগিন রোড পেরিয়ে গিয়েছিলুম। উমাশঙ্কর বলল: ডান দিকের পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ছাড়িয়ে নেতাজী ভবন। কালীঘাটের মন্দিরের পর ভবানীপুরে এই একটিই দেখবার জায়গা।

তারপরে বলল: সামনে যে বড় রাস্তা আসছে, তার নাম আচার্য জগদীশ বোস রোড। পুরনো নাম লোয়ার সার্কুলার রোড। রেসকোর্সের দক্ষিণ দিক ঘিরে এই রাস্তাটা এসেছে। ওদিকের মাথায় খিদিরপুর রোড, আর ডান দিকে এই পথটাই উত্তর-মুখো হয়ে শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে দিয়ে শ্যামবাজার গেছে। সেদিকে তার নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।

এ সবের একটা মোটামুটি ধারণা আমার ছিল। তবু নীরব রইলুম।

উমাশঙ্কর থামল না, বলল: বাঁ দিকে ক্যালকাটা ক্লাব দেখুন। এখানে ডিনার খেতে হলে আপনার ধুতি পাঞ্জাবি এখনও চলবে না।

তারপরে একটা রাস্তা পেরিয়ে বলল: ক্যালকাটা ইনফর্মেসন সেণ্টার আর রবীন্দ্রসদন। আর ঐ সামনে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্, সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রাল আর বিরলা প্ল্যানেটেরিয়াম। এইবারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর ময়দানও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

পপি বলল: প্ল্যানেটেরিয়ামের শো দেখেছেন?

বললুম: না।

দেখেন নি?

শুনেছি, ইংরেজী ও বাঙলা দু ভাষাতেই শো হয়। কিন্তু কোন দিন সময় মতো এসে ঢুকতে পারি নি।

কেন, খবরের কাগজেই তো সময় দেওয়া থাকে।

বলে পপি একটা অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকাল স্বাতির দিকে। আর আমি তার উত্তর শুনে আশ্চর্য হলুম। বলল: আকাশের নিচে দাঁড় করিয়ে দিলে সব গ্রহনক্ষত্র ও চিনিয়ে দিতে পারে। কৃত্রিম আকাশে ওকে কিছু চিনিয়ে দেবার দরকার নেই।

তারপরে আমাকে জিজ্ঞাসা করল: সেণ্টপল্‌স্ ক্যাথিড্রালে কিছু দেখবার আছে?

বললুম: আছে অনেক কিছু। কিন্তু কলকাতার লোক সে সব দেখে না। অথচ তারাই দিল্লী আগ্রা দক্ষিণ ভারতে গেলে ইতিহাস ও স্থাপত্যকলার কথা জানতে চায় গাইডের কাছে।

স্বাতি খুব মৃদুস্বরে বলল: সংক্ষেপে বল।

বললুম: বাইরেটা এর হাইকোর্টের মতো গথিক শৈলীতে তৈরি প্রায় একই সময়ে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি। ভিতরে একটি সোনার গিল্টি করা বিরাট কমিউনিয়ান প্লেট আছে রাণী ভিক্টোরিয়ার দেওয়া। ১৯১২ সালে পঞ্চম জর্জ ও ১৯৬১ সালে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এই গীর্জায় এসেছিলেন।

এ সব কথায় উমাশঙ্করের কোন উৎসাহ দেখলুম না। সে জিজ্ঞাসা করল: ডালহৌসি স্কোয়ারে টুরিস্ট অফিসে যাবার দরকার আছে ব্রাদার?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: কেন বলুন তো!

মানে ওটাই তো কলকাতার স্টার্টিং পয়েণ্ট!

পপি বলল: রাখো তোমার স্টার্টিং পয়েণ্ট। একবার পার্ক স্ট্রীট ঘুরে নিউ মার্কেটে চল।

পার্ক স্ট্রীটে কী দেখবে?

দুপুরের লাঞ্চ কোথায় খাওয়া হবে সেটা জেনে নেবে তো—মোকাম্বো ব্লু ফক্স্ না স্কাই রূমে?

বলে পপি স্বাতির দিকে তাকাল।

স্বাতি বলল : আপত্তি না থাকলে তুপুরে তোমরা আজ আমার কাছেই খাও।

উমাশঙ্কর চোখ বড় বড় করে বলল : মানে—

স্বাতি হেসে বলল : মানে আমার কাছে। ভাল রাঁধতে তো জানি নে, তাই ইকমিক কুকারে রান্না বসিয়ে এসেছি।

পপি বলল : এ সব হাঙ্গামা আবার করতে গেলি কেন!

স্বাতি আমার দিকে একবার তাকাল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। আমার মনে হল যে তার বক্তব্য খুব পরিষ্কার মনে হচ্ছে আমার কাছে। দার্জিলিঙে অনেক দিন আমি হোটেলের রান্না খেয়েছি। সে আর আমাকে হোটেলের রান্না খেতে দিতে চায় না।

উমাশঙ্কর বলল : তবে আজকের ডিনার আমরা এক সঙ্গে খাব। আপনারা অনুগ্রহ করে সে ব্যবস্থা আর করবেন না।

চৌরঙ্গী রোড ধরে আমরা ছুটে চলেছিলুম। এই অঞ্চলটা হল ইংরেজের কলকাতা। পরম যত্নে ইংরেজ এই শহরটা গড়ে তুলেছিল পলাশী যুদ্ধ জয়ের পরে। তু শো বছর আগে এই এলাকা স্থন্দরী গাছের ঘন বনে পূর্ণ ছিল। বাঘ আর ডাকাতের ভয়ে দিনের বেলাতেও মানুষজন এ পথে চলত না। বড় লাট ওয়ারেন হেস্টিংস্ এখানে হাতির পিঠে চড়ে বাঘ শিকারে আসতেন। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হতেই কলকাতার উন্নতি হল অত্যন্ত দ্রুত। এই উন্নতির আরও একটা কারণ ছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে কলকাতাই ছিল ভারতের রাজধানী। বাহান্ন বছর এই গৌরব ছিল কলকাতার। ১৯১২ সালে এই রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হল। পঞ্চম জর্জ সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, কলকাতা তবু চিরকাল এ দেশের শ্রেষ্ঠ শহর হয়েই থাকবে।

পথের বাঁ দিকে ময়দান ও ডান দিকে বড় বড় ঘর বাড়ি কলকাতার আভিজাত্য ঘোষণা করছে। ডান হাতে জাতুঘরের বিরাট বাড়িখানা ছাড়িয়ে উমাশঙ্কর নিউ মার্কেটের পথ ধরবে

ভেবেছিল। চৌরঙ্গীর দোকানপাট তখনও খোলে নি দেখে আমি বললুম : নিউ মার্কেট কি এখন খুলেছে ?

ঘড়ির দিকে চেয়ে উমাশঙ্কর বলল : তাই তো !

বলেই ডান দিকে না ফিরে সোজা এগিয়ে চলল।

তখন আমার চোখ পড়েছে শহীদ মিনারের দিকে। কিছু দিন আগেও এর নাম ছিল অক্টারলনি মনুমেন্ট। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে নেপাল যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরেছিলেন স্যর ডেভিড অক্টারলনি। তারই বিজয়স্তম্ভ এটি। স্থাপত্য নিয়ে আজকাল কেউ মাথা ঘামায় না। সময় নেই কারও। তা না হলে ভাল করে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে স্থাপত্য শৈলী এক রকম নয়—ভিৎটা ইজিপ্সিয়ান, সিরিয়ান এর মিনারটি, আর উপরের গম্বুজটি হল টার্কিশ স্টাইলের। ওর মাথায় যে একটা ধাতুর চূড়ো আছে, তাও অনেকে লক্ষ্য করে না।

সবার দৃষ্টি তখন ঐদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তাই দেখে উমাশঙ্করকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ওর ওপরে কখনও উঠেছেন ?

উমাশঙ্কর সবিস্ময়ে বলে উঠল : ওর ওপরে ওঠা যায় নাকি ?

বললুম : পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুমতি নিয়ে ওঠা যায়।

কতগুলো সিঁড়ি আছে ?

বলে পপি আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বললুম : দু শো আঠারোটা সিঁড়ি। কিন্তু উঁচু খুব বেশি নয়। মাত্র এক শো আটান্ন ফুট।

মাত্র !

বললুম : এর চেয়ে উঁচু বাড়ি কলকাতায় অনেক আছে। সেন্টপলস্ ক্যাথিড্রাল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাইকোর্ট—এ সবও এর চেয়ে উঁচু।

দিল্লীর কুতব মিনার ?

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম ঃ সে অনেক বেশি উঁচু—দু শো আটত্রিশ ফুট। স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপরে নতুন সেক্রেটারিয়েটের তের তলা বাড়িরও মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে কুতবমিনার। সে বাড়িটাও দু শো ফুট উঁচু নয়।

পপি বলল ঃ এত সব হিসেব আপনি মনে রাখেন কী করে?

হেসে বললুম ঃ মন দিয়ে শুনলে মনই মনে রাখে। মন দিয়ে পড়লেও তাই। মনে রাখবার জন্যে কোন চেষ্টা করতে হয় না।

স্বাতি বলল ঃ আর বেশি দিন এ সব কথা আমাদের মনে রাখতে হবে না।

কেন?

নিউ ইয়র্কের লোক কলকাতাকে বেঁটে শহর বলছে। ওদের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি একশো দু-তলা। ষাট-সত্তর তলা বাড়ি যে কত আছে, তার কোন হিসেব নেই।

এস্‌প্লানেডে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম। ডান হাতে ধর্মতলা, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ ও বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট পাশ কাটিয়ে উমাশঙ্কর বাঁ হাতে এস্‌প্লানেড ঈস্ট ধরে এগিয়ে চলল।

এ অঞ্চলটা আমার পরিচিত। তবু জিজ্ঞাসা করলুম ঃ এবারে কোন্ ধারে যাবেন?

বড় বড় ঘরবাড়িগুলো আপনাকে চিনিয়ে দেব।

বলে ময়দানের দিকে না গিয়ে উমাশঙ্কর ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে ফিরল। মাঝখানে লালদীঘি, তার চারি ধার ঘিরে বড় বড় অফিস-বাড়ি। এক দিন বড়লাটের নামে এর নাম হয়েছিল। এখন নাম হয়েছে বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ। চৌরঙ্গীর উপরে আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেলের বিরাট বাড়ির সামনে দিয়ে এসেছি, এই পথে গ্রেট ঈস্টার্ণ হোটেলের সামনে দিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারে পৌঁছে গেলুম। আর টেলিফোন ভবনের বিরাট বাড়িখানা বাঁয়ে রেখে এগিয়ে গেলুম উত্তরের দিকে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর বিশাল বাড়িখানা এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

স্বাতি আমাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল : এই দীঘির নাম লালদীঘি হয়েছিল কেন বলতে পার ?

বললুম : পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম ছিল এইখানে আর সিরাজ-উদ্-দৌলার সঙ্গে ইংরেজের প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল এইখানেই। কিন্তু মনে হয় না যে রক্তে এই পুকুরের জল রাঙা হয়ে গিয়েছিল বলেই এই নাম হয়েছে। তার বদলে অন্য একটি গল্প শুনেছি। জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীরা নাকি এই পুকুরের জলে রঙ মিলিয়ে হোলি খেলতেন। পুরনো কলকাতার এই গল্প আজও চলে আসছে।

তারপরেই আমি দেখতে পেলুম আমাদের অফিস-বাড়িটি। কেন জানি না, সহসা একটা বেদনায় আমার বুক ভরে গেল। ঐ অফিসে আমি অনেক দিন কাজ করেছি। দিল্লীতে নিজের পরিচয় দেবার সময়ে আমি সত্য কথা লুকুই নি। ওই বাড়ির ভিতরে একখানা বিরাট ঘরে সারি সারি টেবলের মধ্যে আমার জন্যেও একখানা টেবল ছিল, আর একখানা শক্ত চেয়ার। শিক্ষিত বাঙালী যুবকের এই হল শক্ত মাটি। কেরানীর জাত বলেই আমরা এখন পরিচিত হয়ে গেছি।

কিন্তু বাঙলার আকাশের রঙ এখন বদলাতে শুরু করেছে। আমারও পরিবর্তন হয়েছে অনেক। এবারে দিল্লী থেকে ফিরে এই অফিসে আর যোগ দিই নি। নিজের কোন খবরও দিই নি। আমার জায়গায় আর কেউ এসে বসেছে কিনা জানি না। চাওলার চেষ্টায় আমি নতুন চাকরি পেয়েছি আসামে। সে চাকরি আমার জীবনে অন্য দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে। হয় তো সেখান থেকেও আমাকে সরে আসতে হবে। নতুন জীবন হাতছানি দিচ্ছে আমাকে। সে তো ঐ বড় ঘরখানির ভিতরে বদ্ধ ছোট জীবন নয়, সে অনেক আলোকিত সুবিস্তৃত উজ্জ্বল জীবন। কিন্তু তবু আমার মন বেদনায় ভরে যাচ্ছে কেন !

১৬

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল : এই বাড়িটার নাম রাইটার্স বিল্ডিং হল কেন জানি নে।

বললুম : জব চার্ণকের আমলে জুনিয়ার রাইটারদের জন্যে একটা বাড়ি তৈরি হয়েছিল এইখানে ফোর্ট উইলিয়ামের সামনেই। সেই জায়গাতেই এই নতুন বাড়ি এখন বাঙলার সেক্রেটারিয়েট।

বাধা দিয়ে পপি বলল : ফোর্ট উইলিয়াম তো ময়দানের মাঝখানে।

বললুম : ওটা নতুন দুর্গ। পুরনো দুর্গটা ছিল সামনে ঐ জেনারেল পোস্ট অফিসের জায়গায়। কয়লাঘাট থেকে ফেয়ার্লি প্লেস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আর গঙ্গা বইত ঠিক পিছন দিকেই।

সত্যি!

কোন সন্দেহ থাকলে আমরা নেমে দেখতে পারি।

আমার এই কথা শুনে সবাই আশ্চর্য হল। বললুম : শুনেছি একটা জায়গায় নাকি পিতলের প্লেটে এই কথা লেখা আছে।

ডান দিকে ঈস্টার্ণ রেলের বড় অফিস ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উঁচু বাড়ি। আমরা বাঁ দিকে পোস্ট অফিসের পথ ধরলুম। মোটা মোটা করিন্থিয়ান থামের উপরে ঘড়িওয়ালা সাদা গম্বুজ। ফোর্ট এখান থেকে উঠে যাবার পরে কাস্টম্‌স্ হাউস যেখানে হয়েছিল, সেইখানে এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাড়ি উঠেছে।

১৭৫৬ সালের ঘটনা। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী খানের মৃত্যুর পরে নবাব হয়েছিলেন তাঁর দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা। ইংরেজের উপরে তাঁর একটা জাতক্রোধ ছিল, তার উপরে তারা তাঁর রাজ্যাভিষেকে নজরানা পাঠাল না। সিরাজ হুকুম দিলেন,

ইংরেজকে তাড়াও কলকাতা থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে নবাবের সৈন্য এসে এই ফোর্ট উইলিয়াম ঘিরে ফেলল, বিধ্বস্ত করে দিল ইংরেজের কলকাতা।

এইখানেই ঘটেছিল সেই ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডির ঘটনা। পোস্ট অফিসের উত্তর-পূর্ব কোণে সেই জায়গাটি লর্ড কার্জন কালো পাথরে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। আর একটি মনুমেণ্ট উঠেছিল এইখানে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ইংরেজকে বাধ্য করেছিলেন এই মনুমেণ্ট এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে। শুনেছি সেটি এখন সেণ্ট জন্স্ চার্চে আছে জব চার্ণকের মেমোরিয়ালের কাছে। জব চার্ণক যে সতীদাহের চিতা থেকে উদ্ধার করে এক হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করেছিলেন, এ কথা লোকে ভুলে গেছে। হল্‌ওয়েল সাহেব লিখে গেছেন যে একশো ছেচল্লিশজন ইংরেজকে সিরাজ একটা ছোট ঘরে বন্দী করে রেখেছিলেন ২০শে জুনের রাতে। ঘরটা ছিল দুর্গের স্লিপিং ব্যারাকের গার্ডরুম। তার এক দিকে বাইশ ফুট, অন্য দিকে চোদ্দ, উঁচু ষোল বা আঠারো ফুট। রাত পোহালে দেখা গিয়েছিল যে তেইশজন বাদে আর সবাই মারা গেছে সেই অন্ধকার ঘরে। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা শুনেছি এ ঘটনা অস্বীকার করেছে। Echoes from old Calcutta বইখানা পড়লে এ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

নবাবের সৈন্যের সঙ্গে ইংরেজদের বোধহয় কোন বড় যুদ্ধ হয় নি। সেনাপতিকে নিয়ে ইংরেজ গভর্ণর নদীর পথে পালিয়ে গিয়েছিল। আর কলকাতা অধিকার করে সিরাজ এর নাম রেখেছিল আলিনগর, দাদামশায়ের নামে নাম। আলিপুর বোধহয় তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কিন্তু সিরাজ কলকাতাকে বেশি দিন দখলে রাখতে পারে নি। ঠিক পরের বছরেই মাদ্রাজ থেকে এলেন রবার্ট ক্লাইভ অ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সনকে নিয়ে। নবাবের সৈন্যকে আবার পিছু হঠে যেতে হয়েছিল। যুদ্ধ হয়েছিল পলাশীর মাঠে। ১৭৫৭ সালের ২৩শে

জুন সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ পরাজিত ও নিহত হলেন।

কিন্তু বিজয়ী ক্লাইভ কলকাতায় ফিরে এসে বললেন, এই পুরনো দুর্গে আর নয়, নতুন দুর্গ তৈরি করতে হবে। সেই দুর্গই তৈরি হল ময়দানের মাঝখানে। রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে ছিল পুরনো দুর্গ, নতুন দুর্গেরও এই নাম বহাল রইল। কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং মানে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে চোদ্দ বছর ধরে এই দুর্গ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দু শো বছরেও এই দুর্গ থেকে একটি কামান দাগার দরকার হয় নি। এ রকম রেকর্ড আর কোন দুর্গের আছে কিনা জানি না।

উমাশঙ্কর কোনখানে দাঁড়াল না। ডালহৌসি স্কোয়ার এলাকা এখনও কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে নি। চারি দিকের বড় বড় অফিসগুলি খুলতে এখনও দেরি আছে। তাই প্রশস্ত পথ জনশূন্য মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে এলে এ জায়গা আর এমন দেখা যাবে না। যানবাহন আর লোকজন দেখে শ্বাসরোধ হবে। মনে হবে, একটা পাগলের দেশে এসে পৌঁছেছি। ট্রামে বাসে হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে লোক আসছে। হেঁটেও আসছে কাতারে কাতারে। আসছে কলকাতার চারি ধার থেকে, হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন থেকে। কে কত দূর থেকে কেমন করে আসছে, কত লোক আসছে আর কত আসতে পারছে না, তা দেখবার লোক নেই। নিজেকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। জনবহুল একটি রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র হল কলকাতা। যুদ্ধ করে বাঁচতে হলে এই কলকাতা শহরেই আসতে হবে।

অনেক দিন পরে সরকার এ বিষয়ে সচেতন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আশ্বাস দিয়েছে যানবাহনের সমস্যা সমাধানের। পাতাল রেল তৈরি হচ্ছে। মাটির নিচে সুড়ঙ্গ পথে এই ট্রেন চলবে দমদম থেকে টালিগঞ্জ। স্টেশন হবে রাস্তার নিচে নিচে। শ্যামবাজার থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ চৌরঙ্গী রোড আশুতোষ মুখার্জি রোড ধরে

এই রেলপথ চলবে উত্তর থেকে দক্ষিণে। ১৯৭৯ সালে এই ট্রেন প্রথম চলবার পরে অন্য পথের কাজ শুরু হতে পারে। কলকাতা ও শহরতলীর যুদ্ধক্লান্ত নরনারী এখন এই সুদিনের অপেক্ষাতেই দিনযাপন করবে।

কোন দিকে না ফিরে উমাশঙ্কর সোজা চলতে লাগল। হেয়ার স্ট্রীট ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট ধরে। হেস্টিংস স্ট্রীটের উপরে সেই সেণ্ট জন্‌স্‌ চার্চ। বিদেশীরা এই গীর্জায় আসে ব্ল্যাকহোল মনুমেণ্ট ও জব চার্ণকের সমাধি দেখতে। কিন্তু কলকাতার লোক এসব কথা মনে রাখে নি। উমাশঙ্কর ডান দিকে হেস্টিংস স্ট্রীট ধরল না। সোজা এগিয়ে চলল।

এবারে বাঁ দিকে রাজভবনের বিশাল এলাকা। আমরা পূর্ব দিক দিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারে গিয়েছিলাম, ফিরছি পশ্চিম দিক দিয়ে। ময়দানের দিকে এর প্রধান প্রবেশ পথ। এস্‌প্লানেডে যাতায়াতের পথে এই রাজভবন আমি অনেক বার দেখেছি। লর্ড ওয়েলেস্‌লি শুনেছি এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন লর্ড কার্জনের বিলেতের বাড়ির অনুকরণে গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে গোড়ার দিকে। বাড়ির মাথায় রূপোলি গম্বুজ এখনও ঝকঝক করে। ভিতরেও নাকি দেখবার জিনিস আছে। খবরের কাগজে যে থ্রোন রুমের কথা পড়ি, তাতে টিপু সুলতানের সিংহাসন আছে। কোন ভারতীয়কে দেওয়া নেপোলিয়নের উপহার আছে—দ্বাদশ সিজারের আবক্ষ-মূর্তি, এ কথা সত্য কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহও আছে। কিন্তু যাতে সন্দেহ নেই, তা হল নানা রকমের শিল্পনিদর্শনের সংগ্রহ। ইংরেজ শাসনের সময়ে বিলেত থেকে রাজপরিবারের কেউ এলে এই বাড়িতেই থাকতেন। অন্য সময়ে থাকতেন লাটসাহেবরা। কলকাতায় যখন রাজধানী ছিল, তখন এখানে বড়লাট নিজেই থাকতেন।

এই বাড়ি তৈরি হবার আগে তাঁরা বেলভেডিয়ারে থাকতেন। ময়দানের ঠিক উল্টো দিকে একটি বেশ বড় এলাকার মধ্যে এই

পুরনো বাড়িতেই এখন কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি। ইটালিয়ান রেনেসাঁস শৈলীতে তৈরি এই বাড়ির জোড়া জোড়া থামগুলি ডরিক ও করিন্থিয়ান শৈলীর কথাই মনে করিয়ে দেবে। এর তিন খিলানের গেটের উপরে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

একদা লর্ড কার্জনের একটি লাইব্রেরি স্থাপনের ইচ্ছা হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা অক্সফোর্ডের বড্‌লিয়ানের মতো বিরাট কিছু কলকাতায় হোক। তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়েছে কিনা তা বলতে পারবেন যাঁরা ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা বড্‌লিয়ান দেখে এসেছেন।

এর ভিতরেও দুটি বিশেষ দ্রষ্টব্য আছে। প্রথম হল চামড়ায় বাঁধানো প্লিনির বই। আর দ্বিতীয়টি হল একশো দশ ফুট লম্বা একটি ডিনার টেবল, যেটি এখন পড়ার টেবলে পরিণত হয়েছে।

উমাশঙ্কর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল : এবারে কোথায় যাই বল তো ?

প্রশ্নটা করেছিল পপিকে। কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না।

ডান দিকে এস্‌প্লানেড রো ধরলে আমরা টাউন হল আর হাইকোর্টের দিকে যেতে পারতুম। কিন্তু উমাশঙ্কর বোধহয় সোজা যাবে বলে ভেবেছিল। হঠাৎ পিছনে স্বাতির কথা শুনে গাড়ির গতি মন্থর করে ফেলল।

স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল : হাইকোর্ট দেখেছ ?

কিন্তু আমি কোন উত্তর দেবার আগেই উমাশঙ্কর ডান দিকে মোড় নেবার উপক্রম করে বলল : সে কি, হাইকোর্ট আপনি দেখেন নি !

তারপরেই পশ্চিম-মুখো হয়ে বলল : চলুন, আপনাকে হাইকোর্ট দেখিয়ে দিচ্ছি।

স্বাতি মুখ টিপে হাসছিল। তাই দেখে বললুম : অনেকেই আমাকে হাইকোর্ট দেখিয়েছে। আর শুধু কলকাতার হাইকোর্ট নয়—

সামনে থেকে পপি এবারে হেসে উঠল, বলল: তুমি কী বোকা বল তো!

অ্যাঁ! মানে—

মানে স্বাতির রসিকতা তুমি বুঝলে না!

রসিকতা! ও হ্যাঁ, মানে—

উমাশঙ্কর যে তখনও বোঝে নি আমি তা বুঝলুম পরের কথায়। বলল: টাউন হল ডান দিকে, তারপরেই দেখুন হাইকোর্ট।

শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে ডরিক স্টাইলে এই টাউন হলটি তৈরি হয়েছিল গত শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে লটারীর টাকায়। কলকাতার নাগরিকদের কাছ থেকেই এই টাকা উঠেছিল।

ঠিক এই সময়েই আমরা হাইকোর্টের সামনে এসে পড়লুম। একটু লক্ষ্য করলেই মনে হবে যে এই বাড়িটা প্রায় সেণ্ট পল্স্ ক্যাথিড্রালের মতোই। তার মানে, এটিও গথিক স্টাইলে তৈরি হয়েছে। এই শৈলীর প্রধান লক্ষণ হল একটি চার কোণা চূড়ো। এই চূড়োয় উঠলে শহিদ মিনারকেও বেঁটে মনে হবে।

কলকাতা থেকে রাজধানী উঠে যাবার সময় সুপ্রিম কোর্টও উঠে যায়। তারপরে তৈরি হয়েছে এই বাড়ি। এর বয়সও একশো বছরের বেশি হয়েছে।

আমরা তখন সামনে গঙ্গার ধারে স্ট্র্যাণ্ড রোডে পৌঁছে যাচ্ছিলুম। তাই উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল: এবারে কোন্ দিকে?

পপি এবারে তৎপর ভাবে উত্তর দিল: ইডেন গার্ডেন।

স্ট্র্যাণ্ড রোডে পৌঁছে সে বাঁ দিকে ফিরল। গঙ্গার ধারে এই স্ট্র্যাণ্ড রোড, আর এই গঙ্গার ধার দিয়েই চিৎপুর থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত রেল লাইন এসেছে। খিদিরপুরে জাহাজের ডক, তারপরে গার্ডেনরীচ। চিৎপুর পর্যন্ত গঙ্গা দক্ষিণবাহী, তারপরে একটু পশ্চিম-

মুখো হেলে খিদিরপুর থেকেই পশ্চিমবাহী হয়েছে। শিবপুরের বটানিকাল গার্ডেন তাই গার্ডেনরীচের অপর পারে গঙ্গার উত্তর দিকে।

কাশীর গঙ্গার মতো পাশাপাশি ঘাট এখানে নেই। হাওড়া পুলের দক্ষিণে বড়বাজার এলাকায় আছে আর্মেনিয়ান ঘাট, আর এইখানে স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে চাঁদপাল ঘাট। পুরাকালের জজেরা বিলেত থেকে এসে এই ঘাটে নামতেন। কাউন্সিলার ও সেনা-পতিরাও নামতেন এই ঘাটে। এলিজা ইম্পে ও সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মেম্বাররাও দু শো বছর আগে এই ঘাটেই পদার্পণ করেছিলেন।

এলিজা ইম্পের নাম আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর নাম রয়ে গেছে। নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুমের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত হয়ে আছে। হাইকোর্টের সেই পুরনো দলিল এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আছে।

এই ইম্পে সাহেবেরই একটি ডিয়ার পার্ক ছিল—হরিণ পোষার বাগান। সে বাগান এখন নেই, কিন্তু নামটি রয়ে গেছে পার্ক স্ট্রীটে। কলকাতার লোক এ কথাও মনে রাখে নি।

চাঁদপাল ঘাটের পরেই বাবু ঘাট ইডেন গার্ডেনের উত্তর প্রান্তে, আর দক্ষিণ প্রান্তে হল আউটরাম ঘাট। ময়দানের দিক থেকে ইডেন গার্ডেনে এলে রাজভবনের সদর গেট ছাড়িয়ে আমরা অ্যাসেম্ব্লি হাউস দেখতুম। দেখতুম ইডেন গার্ডেনের এই প্রান্তে মোগল শৈলীতে তৈরি আকাশ-বাণীর নতুন ভবন। কিন্তু আমরা উল্টো দিক থেকে এলুম বলে এ সব দেখতে পেলুম না।

ইডেন গার্ডেনের নামে লর্ড অকল্যাণ্ডের দুই শিল্পী বোনের কথা মনে পড়ে। তাঁদের নাম মিস এমিলি ইডেন ও ফ্যানি ইডেন। তাঁরা এই বাগানটি তৈরি করেছিলেন বলেই এর নাম হয়েছে ইডেন গার্ডেন। সেকালের লোকেরা বলত লেডি বাগান। কলকাতার অনেক মান্যগণ্য লোকেরা তখন এখানে সান্ধ্যভ্রমণে আসতেন।

পপির দিকে চেয়ে উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল : নামবে নাকি ?

পপি বলল : কী দেখবে এখানে ?

কেন জানি না আমি বলতে পারলুম না যে আমার কিছু দেখবার ছিল। অনেক দিন আগে এখানে বেড়াতে এসে ছোট লেকটির পাড়ে সেই বার্মিজ প্যাগোডা আমি দেখতে পাই নি। শুনেছিলুম যে ব্রহ্মদেশের প্রোম থেকে সেই প্যাগোডাটি তুলে এনে লর্ড ডালহৌসি এখানে স্থাপন করেছিলেন। তার মধ্যে সোনার গিল্টি করা একটি বুদ্ধমূর্তি ছিল। কিন্তু এর মেরামত খরচ এমন বেড়ে গিয়েছিল যে সাড়ে চার হাজার টাকায় এটি বিক্রি করে দেওয়া হয়। তখন স্থির হয়েছিল যে সাড়ে চার লক্ষ টাকায় একটা নতুন প্যাগোডা তৈরি হবে। সেটি তৈরি হয়েছে কিনা দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল।

এই বাগানের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছিল ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব। আর তাকে ঘিরেই রঞ্জি স্টেডিয়াম। এই মাঠেই কয়েক বার আমরা বিদেশীদের হারিয়েছি ক্রিকেট খেলায়।

কারও কাছে উৎসাহ না পেয়ে উমাশঙ্কর ইডেন গার্ডেনে থামল না। সোজা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

গঙ্গার ধারে ধারে এই স্ট্র্যাণ্ড রোড ফোর্ট উইলিয়ামের পিছন দিয়ে হেস্টিংস এলাকায় পৌঁছেছে। অনেক কৌতূহলী ইংরেজ সেখানে পুরনো হেস্টিংস হাউস দেখতে যায় জাজেস কোর্ট রোডে। এরই কাছে কোথাও বড়লাট হেস্টিংসের সঙ্গে ফিলিপ ফ্রান্সিসের দ্বৈত-যুদ্ধ হয়েছিল। আর একটা অবিশ্বাস্য কথাও শোনা যায়। সেই বাড়িতে রাত্রি যাপন করলে নাকি ভূতও দেখতে পাওয়া যায়—ভোরের দিকে নাকি ওয়ারেন হেস্টিংস ঘোড়ার গাড়িতে চেপে এই বাড়িতে আসেন।

ইডেন গার্ডেন ঘুরে আমরা ফুটবল খেলার মাঠের দিকে এগোলুম না। ফোর্টের পিছন দিয়ে আমরা প্রিন্সেপ্ ঘাটের দিকে এগোলুম। গঙ্গার উপরে দ্বিতীয় পুল হচ্ছে এইখানে। হাওড়া এলাকায় ভিড়ের

প্রবল চাপ কমাবার জন্যেই এই পুল তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ামের খানিকটা জমি ছেড়ে দিতে হয়েছে এইখানে।

স্বাতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: ফোর্ট উইলিয়াম আমরা দেখতে পাই নে কেন? দুর্গটা কি মাটির নিচে?

বললুম: ওপরের পথ থেকে খানিকটা নিচে নেমে যেতে হয়।

তুমি কখনও ভেতরে গেছ?

না। তবে দেখবার ইচ্ছা থাকলে অনুমতি পাওয়া যায়। ফোর্টের অফিসার কমাণ্ডিং থাকেন চৌরঙ্গী গেটের দিকে। মিউজিয়ামের সামনে থেকে আউটরাম রোড ধরে এলে তাঁর কাছেই অনুমতি পাওয়া যায়।

দেখবার মতো কিছু আছে?

বললুম: আছে বৈকি। দুই বর্গমাইল এলাকার এই ছোটখাটো শহরটিতে হাজার দশেক লোক বাস করতে পারে। তাদের জন্যে বাজার হাট সিনেমা খেলার মাঠ পোস্ট অফিস গির্জা—সব আছে। ভিতরে যাবার জন্যে গেট আছে ছটা—তাদের নাম চৌরঙ্গী গেট পলাশী গেট কলকাতা গেট ওয়াটার গেট সেণ্ট জর্জ গেট ও ট্রেজারি গেট। চৌরঙ্গী গেটের ভিতরে ছিল সেকালের গভর্ণরের বাসগৃহ, আর সেনাপতি থাকতেন ট্রেজারি গেটের দিকে। এখন যারা ভিতরে যায়, তারা আর্সিনাল দেখে—শিখ-যুদ্ধে ব্যবহৃত কামান বন্দুক ও নানারকম অস্ত্রশস্ত্র।

স্বাতি বলল: আমাদের দেখবার মতো কিছু নেই তাহলে।

বললুম: আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে।

খুবই আস্তে আস্তে আমরা কথা বলছিলুম। সামনে থেকে ওরা শুনতে পাচ্ছিল কিনা জানি না। স্বাতি বলল: ঐ বাড়ির ভিতরটা এক দিন ভাল করে দেখতে হবে।

বললুম: ও বাড়ির বাইরেটাই আমরা দেখি। ভিতরটাও যে দেখবার মতো, এ কথা অনেকেই জানে না।

১৭

রেসকোর্সের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পপি বলল ঃ এবারে বর্ষার রেস একেবারেই জমল না। বেয়াড়া বৃষ্টিতে সব মাটি হয়ে গেল।

স্বাতি বলল ঃ রেস খেলতে যাস বুঝি ?

কেন, তুই যাস নে ?

বলে পপি পিছন ফিরে তাকাল।

স্বাতি কোন উত্তর না দিয়ে শুধু হাসল।

আর পপি বলল ঃ এ রকম ইন্টারেস্টিং খেলা আর নেই। টার্ফ ক্লাবের এক মেম্বারকে ধরে আমিও এ বছর মেম্বার হয়েছি। শীতের সময় রোজ যাব।

উমাশঙ্কর বলল ঃ নিজে খেলতে যেও না, বসে বসে অন্যের খেলা দেখো।

পপি বলল ঃ কী বলছ তুমি! নিজে না খেলে কি আনন্দ পাওয়া যায়!

কেন পাওয়া যাবে না! চোখে বায়নাকুলার লাগিয়ে ঘোড়ার দৌড় দেখেই তো আনন্দ!

আর সেই সঙ্গে বাজি জিতলে ?

আর বারে বারে হারতে থাকলে ?

স্বাতি হেসে বলল ঃ খেলায় হারজিৎ আছেই, তার জন্যে না খেলার কোন যুক্তি নেই।

ঠিক বলেছিস।

বলে পপি যেন ঘোড়দৌড়ে জেতার আনন্দই প্রকাশ করল।

এই রেসকোর্সের বেশ নাম আছে। অনেকে বলে যে প্রাচ্যে এরকম রেসকোর্স আর নেই। হেমন্ত থেকে বসন্তকাল পর্যন্ত খেলা

চলে। বড়দিনের সময় হয় সবচেয়ে ভাল খেলা। ব্লু রিবণ্ড্ কুইন এলিজাবেথ ও আরও অনেক কাপের খেলা হয়। কলকাতার শৌখিন নরনারী তখন রেসের মাঠে ভেঙে পড়ে।

আমার এক সময় মনে হয়েছিল যে এই সব খেলার মাঠে মেয়েরা সময় কাটাতে আসে সেজেগুজে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। খেলায় যোগ দেবার ইচ্ছার চেয়ে খেলায় যোগ দিয়েছি এ কথা জানাতেই তারা বেশি ব্যস্ত। খেলে পয়সা পেয়েছি বলার বাসনার চেয়ে খেলে পয়সা নষ্ট করেছি বলাতেই যেন একটা আভিজাত্যের ভাব আছে। ক্রিকেটের মাঠেও রঙ-বেরঙের মেয়েদের দেখে আমার এই কথাই মনে হয়েছে। কিন্তু এ কথা কাউকে বলবার সাহস পাই নি।

আমার দিকে ফিরে স্বাতি বলল: তুমি নিশ্চয়ই ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঢোক নি?

কেন এমন্ ভাবছ বল তো!

বলে আমি তার দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল: এ সব ব্যাপারে তোমার গোঁড়ামি আছে বলে মনে হয়।

বললুম: হিসেবের ভুল হয়ে গেল।

কেন?

বললুম: শুধু মাঠে ঢোকা নয়, বই কিনে ঘোড়া চিনে পয়সাও নষ্ট করেছি।

সত্যি!

হেসে বললুম: শুধু এক দিন। এর মধ্যে লোভনীয় কী আছে, তা জানবার জন্যেই এই কাজ এক দিন করেছি।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য কেন!

স্বাতি বলল: পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে, যা আমরা

জানি নে। অথচ জানবার কৌতূহল আছে। কিন্তু তাই বলে কি সব জিনিস চোখে দেখবার জো আছে!

দেখতে পারলে ক্ষতি কী!

সামনে থেকে উমাশঙ্কর বলল: কী কথা হচ্ছে আপনাদের?

বললুম: কোথায় যাব তাই জানতে চাইছি।

উমাশঙ্কর বলল: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে।

বললুম: সে কি! সকাল দশটার আগে তো তার দরজা খোলে না! এখন গেলে বাইরেটা দেখেই ফিরে আসতে হবে।

তবে কি বিকেলে আসব?

হেসে বললুম: শীতকালে বিকেল চারটেতেই বন্ধ হয়ে যায়। আর গরমকালে পাঁচটায়।

তবে কি মিউজিয়ামে যাব?

সেখানেও একই অবস্থা।

স্বাতি বলল: চিড়িয়াখানায় চলুন।

চিড়িয়াখানায়!

বলে পপি সবিস্ময়ে তাকাল স্বাতির মুখের দিকে। আর আমি বললুম: চিড়িয়াখানার গেট ভোর ছটাতেই খোলে, এখন বোধহয় সাড়ে ছটায়।

উমাশঙ্কর নিশ্চিন্ত হয়ে বলল: তাহলে সেখানেই যাওয়া যাক।

স্বাতি বোধহয় পপির উত্তর দেবার কথা ভাবছিল, বলল: কলকাতায় বেড়াবার যত জায়গা আছে, তার মধ্যে চিড়িয়াখানাই বোধহয় সবচেয়ে ভাল। ফুলের এমন বাগানও শহরে কম আছে।

আমি বললুম: মরশুমি ফুল ফোটার সময় এখনও হয় নি। শীতের শেষে হবে ফুলের বাহার।

রেসকোর্সের পাশ দিয়ে আমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে এগোলুম না। আমরা বেলভেডিয়ার রোড ধরব বলে অন্য ধারে এগিয়ে গেলুম।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ঠিক পিছন দিকেই প্রেসিডেন্সী জেনারেল হস্‌পিটাল। এখন তার নাম হয়েছে শেঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হস্‌পিটাল। তার ঠিক পশ্চিমেই মিলিটারি হস্‌পিটাল। ময়দানের দিক থেকে আসতে হলে হস্‌পিটাল রোড ধরে আসতে হয়। আমরা বেলভেডিয়ার রোড ধরে আদিগঙ্গার উপরে জেরাট পুল পেরোলুম।

তক্তাঘাটের দক্ষিণে এই আদিগঙ্গার মুখ। স্ট্র্যাণ্ড রোড ও নিউ স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে এলে হেস্টিংস ব্রীজ পেরিয়ে গার্ডেনরীচের দিকে যেতে হয়। আর ময়দানের অন্য ধারে খিদিরপুর রোড ধরে এলে আদিগঙ্গা পেরোতে হয় খিদিরপুর ব্রীজের উপর দিয়ে। আর ভবানীপুর থেকে আলিপুর ব্রীজ পেরিয়ে এই অঞ্চলে আসতে হয়। আমরা যে দিক থেকে আসছি, তাতে প্রথমে চিড়িয়াখানা, তারপরে ন্যাশনাল লাইব্রেরি; হর্টিকাল্‌চারাল গার্ডেন আরও দক্ষিণে। চিড়িয়াখানার পশ্চিমে আবহাওয়া গণনার মানমন্দির।

চিড়িয়াখানায় পৌঁছতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। আমরা নেমে পড়তেই উমাশঙ্কর চাবি দিয়ে গাড়ি বন্ধ করল। তারপরে টিকিট কেটে আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লুম।

শুনেছি যে ছ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে টিকিট কাটতে হয় না। আর মাসে একটা দিন নাকি কারও টিকিট লাগে না। ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিনে গাড়ি নিয়েও ভিতরে ঢোকা যায় টিকিট কেটে। এর পরেও টিকিট কাটবার নতুন জায়গা হয়েছে। সাদা বাঘ দেখতে হলে আর একবার টিকিট কাটতে হয়। তারপরে হাতি ঘোড়ায় চড়তে হলেও পয়সা লাগে।

পপি আমার দিকে চেয়ে বলল: এইবারে কী দেখবেন বলুন তো?

খানিকটা কৌতুকের সুর শুনলুম তার কণ্ঠস্বরে। আর স্বাতি আমার দিকে তাকাল এমন দৃষ্টিতে যে তার অব্যক্ত আদেশ আমি

উপলব্ধি করলুম। চিড়িয়াখানা যে শুধু বাচ্চাদের জন্যেই নয়, এই সত্য আমাকে বুঝি প্রমাণ করতে হবে। আমি নিঃশব্দে তার আদেশ মেনে নিয়ে বললুম: সবার আগে এই চিড়িয়াখানার প্রাচীনতম প্রাণীকে একবার প্রণাম করব।

উমাশঙ্কর আশ্চর্য হয়ে বলল: তিনি কে?

বললুম: তিনি আগে বড়লাটের ব্যারাকপুরের বাড়িতে বাস করতেন। ১৮৭৫ সালে যখন এই চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তাঁকে এইখানে আনা হয়। আর পরের বছর ১লা জানুয়ারী সপ্তম এডোয়ার্ড যখন এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি সেই উৎসব নিজের চোখে দেখেছেন। এখন আমাদেরও দেখছেন।

বলেন কি!

ঠিকই বলছি। সপ্তম এডোয়ার্ড তখন যুবরাজ ছিলেন, পরে তিনি রাজা হন, তারপরে আরও কত রাজা রাণী হলেন ইংলণ্ডে। কিন্তু---

পপি অধৈর্য ভাবে জিজ্ঞাসা করল: আপনি কার কথা বলছেন?

বললুম: একটি কচ্ছপের কথা।

স্বাতি হেসে উঠল। কিন্তু উমাশঙ্কর বলল: বলেন কি ব্রাদার! মানে, কচ্ছপ কি একশো বছর বাঁচে! মানে—

বললুম: এই কচ্ছপ যখন এখানে এসেছিল, তখন তার বয়স কত ছিল কারও জানা নেই। থাকলে একটা অনুমান করা যেত।

ও লর্ড! মানে, কয়েক শো বছরও বয়স হতে পারে! আরও ক শো বছর বাঁচবে তাই বা কে বলতে পারে!

পপি বলল: পাগল হয়েছ নাকি!

সুন্দর পথ ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলুম। আর আমি এই চিড়িয়াখানার কথাই ভাবছিলুম। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় আমরা চিড়িয়াখানা দেখেছি। কিন্তু কলকাতার এই চিড়িয়াখানাই বোধহয় সব চেয়ে বড় ও আকর্ষণীয়। অথচ এটি সরকারী ব্যবস্থায়

চলে না। এর জন্যে শুনেছি একটি অনারারি ম্যানেজিং কমিটি আছে। তাদের হাতেই এর পরিচালনার ভার। বছরে প্রায় আঠারো লক্ষ লোক এই চিড়িয়াখানায় আসে, আর আয় হয় পাঁচ-ছ' লক্ষ টাকা। সরকারী সাহায্য আছে কিছু। পশু পাখির চিকিৎসার জন্যে একটি হাসপাতালও আছে। সেটি রাস্তার অন্য ধারে। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। এই হাসপাতালে যে একটি বাঘের অস্ত্রোপচার হয়েছিল সে কথা আমরা খবরের কাগজে পড়েছি।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় আমরা লেকের ধারে পৌঁছে গেলুম। গাছে ঢাকা ছোট দ্বীপগুলিতে নানা জাতের পাখির বাস। শীতের সময় আরও অনেক পাখি এই শান্ত পরিবেশে এসে বাসা বাঁধে, আর গরমের আগেই ফিরে যায় নিজের দেশে। কত জাতের পাখি, কী তাদের নাম, তার কোন হিসাব আমরা রাখি না। খাঁচায় যে সব পাখি আছে, তাদের পরিচয় আছে লেখা।

উমাশঙ্কর কোথাও বসতে রাজী হল না। বলল : সঙ্গে খাবার নিয়ে এলে এখানে বসেই খাওয়া যেত। ভারি সুন্দর পিকনিকের জায়গা।

পপি বলল : গেঁয়ো শখ। কলকাতা শহরে এমন ভাল হোটেল রেস্তোরাঁ থাকতে এখানে কেউ খেতে আসে!

উমাশঙ্কর তখনই এ কথা মেনে নিল. বলল : তা বটে। মানে, হোটেলের খাবার এনেও খাওয়া যায়?

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল নিঃশব্দে।

ঘুরে ঘুরে আমরা অনেক পশুপাখি দেখলুম।—জিরাফ জেব্রা জলহস্তী, গিবন ঘেবুন ওরাং ওটাং, নানা জাতের বাঘ সিংহ গণ্ডার, গোল্ডেন ক্যাট ক্যাঙ্গারু ও সরীসৃপের সংগ্রহ।

সাদা বাঘও দেখলুম। বিশ বছর আগে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে একটি সাদা বাঘ ধরেছিলেন রেওয়ার মহারাজা। তার নাম রাখা হয়েছিল মোহন। মোহনের জন্যে সাদা জুড়ি পাওয়া যায় নি বলে

একটি সাধারণ বাঘিনীকেই সঙ্গিনী হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। তাদেরই বাচ্চা হিমাদ্রি ও নীলাদ্রি। আট ন বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বাচ্চা দুটিকে কিনে এনেছে বহু টাকা ব্যয় করে। তাদের জন্যে মালিনীকেও আনা হয়েছে।

এই সব জন্তু জানোয়ার ও পশুপাখি ভাল করে দেখতে বেশ সময় লাগে। আর দেখায় মন লেগে গেলে সময়ের কথাও মনে থাকে না। ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে থাকলে চিলড্রেন্‌স্‌ কর্ণারেও অনেক সময় কেটে যায়। এই সব দেখে আমরা যখন বেরিয়ে এলুম, সূর্য তখন প্রায় মাথার উপরে উঠেছে। সেই দিকে চেয়ে উমাশঙ্কর বলল: এবারে কোথায়?

স্বাতি তৎপর ভাবে বলল: আমাদের বাড়ি।

পপি বলল: বাড়িতে কেন হাঙ্গামা করতে গেলি বুঝি নে। ভাল খানসামা আছে বুঝি?

স্বাতি বলল: না।

তবে?

খেতে বসে কান্না পেলেই সব বুঝতে পারবি।

সত্যি কথা বলতে কি, আমিও একটু ভয় পেয়েছিলুম। কাল স্বাতি নিজের হাতে রেঁধেছিল। সুক্ত ঘণ্ট আর মাছের ঝাল। হালদার মশাই তাই খেয়েছিলেন পরম পরিতৃপ্তিতে। কিন্তু আজ কে রাঁধছে জানি নে। এদের উপযোগী রান্না কি কেউ রাঁধতে পারবে! বাড়ি ফিরে রাঁধবারও তো সময় নেই। তবে কি স্বাতি সুবলবাবুকেই খাবার কিনে এনে রাখতে বলে এসেছে! না, সত্যিই ইকমিক কুকারে রান্না বসিয়েছে! কী দরকার ছিল এই সব ঝামেলায় গিয়ে তা বুঝি নে। কোন হোটেলে খাইয়ে দিলেই তো ভাল ছিল!

উমাশঙ্কর আমাকে তাড়া দিয়ে বলল: দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ব্রাদার? উঠে পড়ুন।

বলে আমাকে প্রায় ঠেলেই গাড়িতে তুলে দিল।

এবারে আমরা স্বাতিদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু মন আমার দুর্ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। স্বাতি আজ কী কেলেঙ্কারি করবে জানি নে।

পরক্ষণেই মনে হল, আমি কেন এ ভাবনা ভাবছি! স্বাতি তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাচ্ছে। আমিও তো তাদের মতোই অতিথি। আমি কেন উমাশঙ্করের মতো নির্বিকার থাকতে পারছি না!

বাড়ি পৌঁছে আমি আরও আশ্চর্য হলুম। স্বাতি নামল সবার চেয়ে নির্বিকার ভাবে। তার আচরণে কোন উদ্বেগ নেই। সবাইকে বসবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আমাকে বলল: তুমি এদের সঙ্গে একটু গল্প কর। আমি খাবার ব্যবস্থা করছি।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু আমি স্থির হয়ে বসতে পারলুম না। দু-একটা কথা বলবার পরেই রান্নাঘরের খোঁজে ভিতরে চলে গেলুম।

দেখলুম যে সুবলবাবু উপস্থিত আছেন। বলছিলেন: খাবার বাসনপত্র সব ধুয়ে মুছে রাখিয়েছি, কিন্তু ওদিকে হাত দেবার সাহস পাই নি।

স্বাতি একটা বড় ইকমিক কুকারের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর অনায়াসে সেটি খুলে বাটিগুলো এনে রাখল খাবার টেবিলে। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল: ভাবনা হয়েছিল বুঝি?

বললুম: হবার কথাই যে!

স্বাতি হেসে বলল: এ হল মেয়েদের কাজ, তোমাদের লেখাপড়ার মতো।

বলে বাটি থেকে এক একটা জিনিস বার করতে লাগল। প্রথম বাটি থেকে বেরোল কড়াই-শুঁটি মেশানো ঘি-ভাত। তারপরে দই-মাছ, নানারকম সব্জি দেওয়া ডালের নিচের বাটিতে মুর্গির মাংস।

রান্নার সুগন্ধে চারি দিক ভরে গেল। আর আমি পরম বিস্ময় নিয়ে তাকালুম স্বাতির মুখের দিকে।

স্বাতির হাসি এবারে কৌতুকে উজ্জ্বল হল, বলল: ভাবছ, ভানুমতীর খেল! তা নয়। সুবলবাবু কাল এ সব কিনে এনে ফ্রিজে রেখেছিলেন। কাল রাতেই সব যোগাড় করা ছিল। সকালে সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম।

সুবলবাবু বাইরে গিয়েছিলেন। এবারে ফিরে এলেন দুখানা কাগজ হাতে। স্বাতি খাবারগুলো সার্ভিং ডিশে সাজিয়ে রাখছে দেখে বললেন: কাগজ কি বসবার ঘরে রাখব?

স্বাতি বলল: আপনি একটু কষ্ট করে দেখে দিন না। এর জন্যে একটা ভাল ফ্ল্যাট চাই। দু-ঘরের হলেই চলবে। একখানা শোবার ঘর, আর বসবার ঘর একখানা।

আমার জন্যে!

তবে কি তুমি আবার উত্তরপাড়াতেই ফিরে যাবে নাকি!

কিন্তু—

কিন্তু কী! এই রকমের একটা ইকমিক কুকার চাই?

নিজেকে আমি সামলে নিয়েছি। হেসে বললুম: না। একটা রান্নাঘর আর রাঁধুনি চাই একজন।

স্বাতির মুখের দিকে আমি নজর রেখেছিলুম তার পরিবর্তন লক্ষ্য করবার জন্যে। কিন্তু সুবলবাবুর উত্তর শুনে সে হেসে উঠল। ভদ্রলোক আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন: আজকালের মধ্যেই রাঁধুনি পেয়ে যাব।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়ে স্বাতি পপি ও উমাশঙ্করকে ডেকে আনল। পপিকে বলল: ঐখানে হাত ধোবার ব্যবস্থা আছে।

পপি বলল: দরকার নেই।

আর স্বাতি তখনই সাইড বোর্ডের ড্রয়ার থেকে ছুরি কাঁটা চামচে বার করে টেবিলে রাখল। গেলাসের মধ্যে ন্যাপকিন

সাজানোই ছিল। একটা তুলে নিয়ে উমাশঙ্কর বলে উঠল : ওয়াণ্ডার-ফুল !

পপি ভেবেছিল যে তার চোখ পড়েছে ফুলদানির উপরে তাই বলল : ফুল সাজানোর ক্লাস করেছিলি বুঝি ?

স্বাতি বলল : না।

কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে উমাশঙ্কর টেবিলের খাবার দেখে খুশী হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল : এ সব হোটেল থেকে আনিয়েছেন বুঝি ?

স্বাতি এ কথার উত্তরেও বলল : না।

পপি ও উমাশঙ্কর বসে পড়েছিল। আর আমি অপেক্ষা করছিলুম স্বাতির জন্যে। সে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে দিল। খুব মৃদু শব্দ—বাজনা সেতারের। তারপরে হাত ধুয়ে এসে খেতে বসল। কাঁটা চামচে নিল না। আমিও নিলুম না।

মুর্গির একটা পায়ে কামড় দিয়ে উমাশঙ্কর বলল : যাই বল, বাড়ির রান্নার আস্বাদটাই অন্য রকম।

কিন্তু পপির মুখ দেখে মনে হল যে সে এ কথা সমর্থন করে না। বলল : আর বেশি দিন তোমাদের এ নবাবী চলবে না।

কেন ?

আর বেশি দিন খানসামা পাওয়া যাবে না।

উমাশঙ্করের মুখ ভরে গিয়েছিল। কোন রকমে বলল : হুঁ।

সেতারের বাজনা আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। মনোযোগ দিয়ে শুনতেই মনে হল যে এই রাগিণী আমি যেন আগে কোথাও শুনেছি। খুব পরিচিত সুর, খুব অন্তরঙ্গ। মনের মধ্যে এই সুর যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, অনেক দিন পরে আজ আবার জেগে উঠল সহসা।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল : খাও।

একটুখানি কৌতুকের রেশ তার কণ্ঠস্বরে। আমি আবার খাবারে মন দেবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু দেখলুম যে মন বড় বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। বারে বারেই ছুটে যাচ্ছে ঐ বাজনার দিকে।

উমাশঙ্কর বোধহয় আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেছিল। জিজ্ঞাসা করল: রবিশঙ্কর?

স্বাতি বলল: না।

তবে কি বিলায়েৎ?

এ কথার উত্তরেও স্বাতি 'না' বলল।

কিন্তু তখন আমি চিনতে পেরেছি শিল্পীকে। এক দিন দিল্লীতে তার বাজনা শুনেছিলুম আড়াল থেকে। সহসা সেই পুরনো কথা আমার মনে পড়ে গেল।

বাহিরে একখানা খাটিয়া নামিয়ে আমি শুয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু চোখে ঘুম ছিল না। নানা দুর্ভাবনায় মন আমার অস্থির হয়ে উঠেছিল। তারপরেই শুনতে পেয়েছিলুম একটা মিষ্টি সুর। মিষ্টি হাতে মীড় টেনে টেনে সেতারে কেউ আলাপ করে যাচ্ছিল আপন মনে। কিন্তু বড় করুণ বড় উদাস সেই সুরটি। ভাবনার জাল আমার ছিঁড়ে গিয়েছিল। আমি উৎকর্ণ হয়ে সেই বাজনা শুনেছিলুম। মনে হচ্ছিল, আমার মনের সুরটিই যেন বাজছে। একমুঠো কাশফুলের মতো সেই সুর ভেসে বেড়াচ্ছে দুরন্ত বাতাসে। তার গতির প্রবাহ নেই, স্থিতিও নেই, লক্ষ্যহীন ভাবে জটলা পাকাচ্ছে। একটা শ্রান্ত ঔদাস্যে মন আমার ভরে গিয়েছিল।

গোগ্রাসে গিলতে গিলতে উমাশঙ্কর বলল: তবে কি কোন নতুন শিল্পী?

এ প্রশ্নের উত্তর দিলুম আমি, বললুম: স্বাতির নিজের বাজনা।

উমাশঙ্কর চমকে উঠল, বলল: সত্যি!

আমার মনে হল, তার মুখের খাবার গলা দিয়ে আর নামছে না।

আলাপের পর তান শেষ হয়ে গেল। এইবারে ঝালা বাজছে। অত্যন্ত দ্রুত উঠছে ঝঙ্কার। দিল্লীর সেই রাতের কথাও আমার মনে পড়ল। নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম। আমার চেতনা যেন অবশ হয়ে এসেছিল। জগৎটাই আর যেন দেখতে পাচ্ছিলুম না। আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম!

সকাল বেলায় স্বাতি আমাকে বলেছিল: কাল রাতে বেহাগ বাজিয়েছিলাম।

কিন্তু আজ স্বাতি আমাকে বেহাগ কেন শোনাচ্ছে! সে কি কোন নতুন সুর আমাকে শোনাবে না!

১৮

বেরবার আগে পপি যখন মুখের রঙ ঠিক করতে উঠে গেল, স্বাতি তার খবরের কাগজ দুখানা হাতে নিয়ে বাইরে গেল। বারান্দায় পায়চারি করছিলেন সুবলবাবু। তাঁকে বলল ঃ আপনাকে একটুখানি কষ্ট করতে হবে সুবলদা।

রাতের জন্যে—

না না, রাতে আমরা খেয়েই ফিরব। আপনি কয়েকটা টেলিফোন করবেন।

টেলিফোন!

হ্যাঁ। এই কাগজে কয়েকটা নম্বরে আমি দাগ দিয়েছি। বাড়ি ভাড়ার ব্যাপার। কেমন বাড়ি, ভাড়া কত, এই সব খবর নিয়ে রাখবেন। ভাল হলে কাল বিকেলের দিকে আমরা দেখে আসব।

সুবলবাবু বললেন ঃ এতে আর কষ্ট কী আছে দিদি! আমি সব খবর নিয়ে রাখব।

এ ব্যবস্থা যে আমার জন্যেই হচ্ছে, আমি তা বুঝতে পারছি। উত্তরপাড়ার ঘর থেকে সে আমাকে কলকাতায় টেনে আনবে। তারপরে ছাড়তে বলবে আসামের চাকরি। সে চায় আমি কোন কলেজে পড়াতে যাই। কেন তা চায়, তার কারণও আমি অনুমান করতে পারি। আমাকে নিয়মিত লিখতে হবে এই দেশের কথা, ভারতবর্ষের কথা। মহাভারতের মতো বিরাট আয়তন হবে তার। স্থায়ী কীর্তি বলে চিহ্নিত হবে সেই গ্রন্থ। তার স্বপ্ন আমার মনেও সে কিছু-পরিমাণে সঞ্চারিত করেছে। আমি তাই কোন প্রতিবাদ করলুম না। জীবনে বুঝি আত্মসমর্পণেই আনন্দ বেশি।

স্বাতি আবার ঘরের ভিতরে ফিরে এল। কিন্তু পপি তখনও অঙ্গরাগ শেষ করে ফেরে নি। কিছু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল উমাশঙ্কর। স্বাতিকে দেখতে পেয়ে বলল: আমাকে আবার চাকরিটাও বাঁচাতে হবে। মানে—

আজ আপনার ছুটি নেই?

ছুটি! না, মানে—

বলেই উমাশঙ্কর থেমে গেল।

দেখতে পেলুম যে পপি ফিরে আসছে। প্রসাধনের সৌরভেই আমি তার ফেরার বার্তা পেয়েছিলুম। আর পপিও বোধহয় উমাশঙ্করের কথা শুনতে পেয়েছিল। বলল: রাখো তোমার চাকরি। রোজই তো চাকরি কর। তারপর তোমার বস্ তো আজ নেই!

মানে, অফিসটা তো আছে—

বলে উমাশঙ্কর করুণ ভাবে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম: তাহলে আজ এই পর্যন্তই থাক।

কিন্তু পপি প্রবল ভাবে আপত্তি করল, বলল: থাকবে কেন! কলকাতা দেখতে যখন বেরিয়েছি, তখন সারা দিন শহর দেখব। সন্ধ্যাবেলায় টুকিটাকি জিনিস কিনব নিউ মার্কেটে। তারপর কোন ভাল জায়গায় তোমাদের খাওয়াব। খবর নিয়ে বেরিয়েছ তো, ভাল ফ্লোর শো আছে কোথায়?

ঠিক এই মুহূর্তে উমাশঙ্করের মুখখানি বড় ম্লান দেখাল। উত্তর দেবার মতো কোন কথা সহসা সে খুঁজে পেল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল: চল।

আর স্বাতি আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল যে আমি তার বক্তব্য বুঝতে পারলুম। সে বোধহয় বলতে চাইছে, আমার নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

কিন্তু উমাশঙ্করের জন্যে আমার এক রকমের বেদনা বোধ হল।

বোধহয় স্বাতিরও হয়েছিল। তাই গাড়িতে উঠেই সে প্রস্তাব করল: একটা কাজ করা যায়।

কী কাজ?

বলে উমাশঙ্কর স্বাতির দিকে ফিরে তাকাল।

স্বাতি বলল: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আমাদের নামিয়ে দিয়ে অফিসের কাজটা আপনি সেরে আসুন।

উমাশঙ্কর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেল, বলল: খুব ভাল আইডিয়া।

কিন্তু পপির দৃষ্টিতে আমি তিরস্কার দেখলুম। সে কোন সমর্থন জানাল না।

উমাশঙ্কর অত্যন্ত দ্রুতবেগে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে চলল। বুঝতে পারছি যে সে দু কূলই রাখতে চায়। তার এক কূল আমি দেখতে পাচ্ছি, কঠিন কূল। আর এক কূলের কথা জানি নে। যদি সরকারী অফিস হয় তো দুর্ভাবনা কম। সহসা চাকরি যাবে না। কিন্তু বেসরকারী অফিস হলে ভাবনা কিছু আছে। তারা যোগ্যতার ওজন করে পয়সা দেয়। যথেষ্ট পেলেই যথেষ্ট দেয়। সরকারী সংস্থার মতো তারা মুড়ি-মিছরির এক দর দেয় না।

আরও একটা ভাবনার কথা আমার মনে ঘনিয়ে এল। এদের দুজনের পরিবারের কোন কথাই আমি জানি না—পরিবারের সচ্ছলতার কথা। কিন্তু তাদের বেপরোয়া ব্যয়ের বাসনা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। বাঙলা গল্প-উপন্যাসে এর পরিণামের কথাও পড়েছি। কিন্তু সে সব তৈরি গল্প। বাস্তব জীবনে তা কতটুকু সত্য, তা আমার জানা নেই। স্বাতি কি এই জন্যই আমাকে নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে অপেক্ষা করতে বলছে!

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছাকাছি এসে পপি বলল: তাহলে কি কালই দীঘা যাবে ভাবছ, না পরশু?

উমাশঙ্কর সংক্ষেপে বলল: পরশু।

কেন, আজ যদি অফিসে যাও তো কাল ব্যবস্থা করার অসুবিধা কী ?

বস্ নেই তো ! ছুটি দেবে কে ?

পপি বলল ঃ ছুটির দরখাস্ত রেখে চলে যাবে।

মানে—

মানে তুমি চিরকাল খোকা হয়ে থাকবে !

স্বাতি উমাশঙ্করকে আবার রক্ষা করল, বলল ঃ পরশু যাওয়াই ভাল। কাল আমাদেরও একটু দরকারী কাজ আছে। সেটা সেরে নিশ্চিন্ত মনে যেতে চাইছি।

উমাশঙ্কর কৃতজ্ঞতায় যেন গলে গেল। বলল ঃ দরকারী কাজ সেরে গেলেই নিশ্চিন্ত মনে বেড়ানো যায়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে প্রবেশের সদর দ্বার হল কুইনস ওয়ে থেকে। সেক্সপিয়ার সরণির সামনে থেকে বেরিয়েছে এই রাস্তা। পিছনে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড। এ দুটি রাস্তার পুরনো নাম হল থিয়েটার রোড আর লোয়ার সার্কুলার রোড। পূর্ব দিকে ক্যাথিড্রাল রোড ও পশ্চিমে হস্পিটাল রোড দিয়ে ঘেরা এই বিরাট এলাকার মধ্যে স্থাপিত হয়েছে রাণী ভিক্টোরিয়ার সমাধি মন্দির।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন এর স্বপ্ন দেখে দেশীয় রাজা ও বড়লোকদের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছিলেন। মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন সবাই। ইমার্সন সাহেব এই মেমোরিয়ালের পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। ১৯০৪ সালে এর নির্মাণ-কার্য শুরু হয়। দু বছর পরে ভিত্তি স্থাপন করেন পঞ্চম জর্জ, তখন তিনি যুবরাজ।

ভারতের কোন্ শহরে এই মেমোরিয়াল হবে, তা নিয়ে নাকি একটা প্রশ্ন উঠেছিল। তার উত্তর দিয়েছিলেন লর্ড কার্জন এই জায়গাটি পছন্দ করে। শুনেছি যে তখন এখানে খোলা ময়দান ছিল

না। তার বদলে ছিল একটা জেলখানা। সেই জেলখানা ভেঙে এই মেমোরিয়াল গড়ার কাজ শুরু হয়েছিল।

তিরিশ বছর সময় লেগেছিল এটির নির্মাণ শেষ হতে। টাকা লেগেছিল পঁচাত্তর লক্ষ। কিন্তু তার আগেই এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছিল। ১৯২১ সালে নতুন যুবরাজ এসেছিলেন কলকাতায়—পরবর্তীকালের ডিউক অব উইণ্ডসর। তিনি এর উদ্বোধন করেন। বিলেতের রাজপরিবার থেকে দেশের রাজারাজড়া ও নানা জনের কাছ থেকে অসংখ্য উপহার এসেছিল। নানা রকমের ঐতিহাসিক ও শিল্প নিদর্শনও সংগৃহীত হয়েছিল। মেমোরিয়ালের ভিতরে পঁচিশটি গ্যালারিতে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার দ্রষ্টব্য বস্তু এখন সাজানো আছে।

উমাশঙ্কর এসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের কাছাকাছি দাঁড়াল। কিন্তু নিজে নামল না। স্বাতির দিকে তাকাল করুণ ভাবে।

স্বাতি এই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে বলল: অফিস থেকে ফিরতে যদি দেরি হয় তো আপনি সোজা মিউজিয়ামে চলে আসবেন। আমরা একটা ট্যাক্সি ধরে সেখানে চলে যাব।

কিন্তু পপি ক্ষেপে গেল, বলল: তুই পাগল হলি নাকি! অফিসে ওর কী রাজকার্য আছে যে দেরি হবে! ও এইখানেই আসবে, ঠিক এই জায়গায়। আমরা এইখানে ফিরে ওকে দেখতে চাই।

উমাশঙ্কর আর দাঁড়াল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। আমি হাসলুম। কিন্তু স্বাতি হেসে বলল: তোদের দেখে মনে হচ্ছে যে অনেক দিন ঘর সংসার করছিস।

তা করছিই তো!

বলে পপি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে এগিয়ে চলল।

আমি ভেবেছিলুম যে স্বাতি হয়তো কোন উপদেশ দেবে। কিন্তু তা দিল না। পপি নিজেই আবার চুপিচুপি স্বাতির কানে বলল: মা বলেন, পুরুষমানুষকে বেশি আলগা দিতে নেই। বুঝলি!

কথাটা আমার কানেও গেল। আর তা বুঝতে পেরে পপি আমাকে বলল: আমাদের কথায় কান দিচ্ছেন কেন?

বললুম: চোখ কান দুইই বেয়াড়া। মনের মতো ওদেরও কৌতূহল বেশি, কোন শাসন মানতে রাজী নয়।

পপি আমার উত্তর শুনতে চায় নি, হনহন করে এগিয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের অনুসরণ করেছিলুম। কিন্তু তবু এক-নজরে দেখে নিয়েছিলুম এই বিরাট কীর্তির পরিকল্পনা।

সামনে রাস্তার দু ধারে দুটি পুকুর আছে, আর দূরে দূরে কয়েকটি তাল গাছ। সবুজ কার্পেটের মতো লন ও নানা জাতের ফুলপাতার পরিচ্ছন্ন বাগান। প্রকাণ্ড উঁচু গেটের নিচে দিয়ে আমরা ভিতরে এসেছিলুম। আর সামনেই দেখতে পাচ্ছিলুম ঝকঝকে সাদা পাথরের সৌধ। প্রথমেই তাজমহলের কথা মনে আসে। যোধপুর রাজ্যের মকরানার শ্বেতপাথরে তৈরি হয়েছিল তাজমহল। এখানেও সেই পাথরেই বেশির ভাগ কাজ হয়েছে। কিন্তু তবু ঠিক তাজমহলের মতো নয়। চার কোণায় বিচ্ছিন্ন ভাবে চারিটি সরু মিনার নেই। এখানে বাড়ির সংলগ্ন চারটি মিনার চারতলার সমান উঁচু। তার উপরে গম্বুজ। মাঝখানের মস্ত গম্বুজটিও ঠিক তাজমহলের মতো নয়। পাশে ছোট ছোট গম্বুজ আছে ঠিকই, কিন্তু মাঝখানের গম্বুজটির চারি ধার ঘিরে জানালার মতো নেই। যতদূর মনে পড়ছে, তাজমহলকে একটি দোতলা ঘরের মতো মনে হয়। আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল একটি বিরাট দোতলা বাড়ি, তার মাঝখানে একটি গম্বুজ। এদের মিল যদি কিছু থাকে তো তা মস্ত খিলানের একটি প্রবেশ পথ। এই পথেই সবাইকে ভিতরে ঢুকতে হয়।

হঠাৎ এক ভদ্রলোকের কথায় আমি উৎকর্ণ হলুম। ভদ্রলোক এই মেমোরিয়ালকে ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ক্যাপিটলের সঙ্গে তুলনা করছিলেন। বললেন: ঐ বাড়িটিও এমনি দোতলা, কিন্তু সামনেটা

খিলানের বদলে কলকাতার পুরনো সিনেট হলের মতো, আর উপরের গম্বুজটি আরও বড়, আরও উঁচু। আর এর মাথায় যেমন ফিগার অব ভিক্টরি, ওর মাথায় তেমনি স্ট্যাচু অব ফ্রিডম্।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি উপরের দিকে তাকালুম। গম্বুজের উপরে সরু শিখর, তার উপরে ফিগার অব ভিক্টরি প্রায় ষোল ফুট উঁচু। এটি ঘোরে। এই স্থাপত্য শৈলীকে রেনেসাঁস বলে, তার সঙ্গে সেরাসেনিক শৈলী কিছু মেলানো আছে।

আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে স্বাতি টিকিট কিনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমি কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করল: গাইড বই পাওয়া যাচ্ছে, তোমার কি দরকার হবে?

বললুম: না।

কেন?

বেশি তথ্যের ভার আছে, দর্শক বা পাঠকের মন ভারাক্রান্ত করে। নিজের চোখে দেখতে যা ভাল লাগবে তাই দেখব।

সেই ভাল।

বলে পপিকে এগিয়ে দিয়ে স্বাতি ঢুকে পড়ল।

এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অভ্যন্তর যে কত বড়, ভিতরে না ঢুকলে তা বোঝা যায় না। যত হলঘর, তত গ্যালারি, আর দর্শনীয় বস্তুর যেন শেষ নেই। বাড়ির উপরের ও বাহিরের অনেক মূর্তি ইটালি থেকে তৈরি করে এনে বসানো হয়েছে। ভিতরে ঢুকেই সপ্তম এডোয়ার্ড ও রাণী আলেকজান্দ্রার আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি আর পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর মূর্তি শ্বেত পাথরের। ব্রোঞ্জ মূর্তি দুটি উপহার দিয়েছিলেন পঞ্চম জর্জ, আর পাথরের মূর্তি দুটি আগা খানের উপহার।

আমরা ডান দিকে রয়াল গ্যালারির দিকে এগিয়ে গেলুম। এই ঘরের মাঝখানে আছে রাণী ভিক্টোরিয়ার পিয়ানো ও রাইটিং ডেস্ক্।

রোজ উডের এই পিয়ানোটি রাণী তাঁর বাল্যকালে বাজাতেন। রাণীর নানা বয়সের অনেকগুলি ছবিও আছে। ছবিগুলি দিয়েছিলেন সপ্তম এডোয়ার্ড। আর দক্ষিণের দেওয়ালে আছে জয়পুরের মহারাজার দেওয়া সেই বিখ্যাত বিরাট ছবি—সপ্তম এডোয়ার্ডের জয়পুরে আগমন। এটি নাকি এশিয়ার সবচেয়ে বড় ও পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ ছবি। কিছু গ্রন্থ পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্রও সাজানো আছে। আর আছে পলাশী যুদ্ধে ব্যবহৃত একটি কামানের গোলা।

বাঁ দিকের পোট্রেট গ্যালারিটিও দেখলুম। বড় বড় সাহেব-সুবোর ছবির মধ্যে সাজানো আছে দ্বারকানাথ ঠাকুর মধুসূদন দত্ত ও কেশবচন্দ্র সেনের ছবি। টিপু সুলতানের ডায়েরি আছে ফের্দৌসী ও আবুল ফজলের বইএর সঙ্গে। অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে আছে টিপু সুলতানের একটি রকেট।

পপির কৌতূহল কম বলে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল। কতকটা বাধ্য হয়েই স্বাতি তাকে অনুসরণ করছিল। আর এক নজরে যতটুকু দেখা যায়, তাই দেখছিলুম আমি।

কুইন্‌স্‌ ভেস্টিবিউল দিয়ে আমরা কুইন্‌স্‌ হলে চলে এলুম। এই হলটি ঠিক গম্বুজের নিচেই। যে বয়সে রাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, সেই বয়সের একটি মূর্তি আছে এই হলে। আর দেওয়ালের গায়ে নানা ভাষায় উৎকীর্ণ আছে তাঁর অনুশাসন। দুদিকের দুটি ব্রোঞ্জের দরজাও দেখবার মতো।

আর একটু এগিয়ে গেলে প্রিন্সেস হল। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মর্মর মূর্তি আছে এই হলে। ক্লাইভের একটি মর্মর মূর্তি তার অন্যতম। পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত দুটি ফরাসী কামান ও একটি পিতলের কামান দেখবার জিনিস। এই কামানের উপরে বাঙলায় লেখা আছে, কিশোর দাস নামে একজন কর্মকার এটি রাজা কৃষ্ণ রায়ের জন্যে তৈরি করেছিল।

এরই বাঁ দিকে দরবার হল। এর একটা বৈশিষ্ট্য চোখে

পড়বেই। শ্বেতপাথরের বদলে চুনারের পাথর ব্যবহার করা হয়েছে এইখানে। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে এটা ব্যয় সঙ্কোচের জন্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন আরম্ভ হয়ে গেছে, সেই জন্যই এই ব্যবস্থার দরকার হয়েছিল। এই দরবার হলের শেষ প্রান্তেই আছে সেই কষ্টিপাথরের বিখ্যাত মসনদ—বাঙলার নবাবদের সিংহাসন। বিরাট তার আকার –ছ ফুট চওড়া আর আঠারো ফুট উঁচু। একখানা পাথর কেটে এটা তৈরি হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিন শো বছর আগে। সিংহাসনের গায়ে উৎকীর্ণ ফারসী লেখা থেকে নাকি জানা যায় যে এটি মুঙ্গেরে শাজাহানের মেজ ছেলের আমলে তৈরি। সেখান থেকে ঢাকা হয়ে মুর্শিদাবাদে এসেছিল। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পরে ক্লাইভ এই সিংহাসনেই বসিয়েছিলেন মীরজাফরকে। তারপরে বাঙলার দেওয়ানী পেয়ে নিজেও বসেছিলেন পরবর্তী নবাবের পাশে। দিল্লীর ময়ূর সিংহাসনের মতো এটি বাঙলার ঐতিহাসিক সিংহাসন।

প্রিন্সেস হলের অন্য ধারে এবং দোতলাতেও আছে ছবির গ্যালারি। উপর তলার শেষ প্রান্তে ক্যালকাটা রুমটিও যত্ন করে দেখবার মতো। কিন্তু পপি কোনখানে দাঁড়াতে চাইছিল না। দু ধারে তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। স্বাতি আমার দিকে ফিরে ফিরে দেখছিল, আর এগিয়ে যাচ্ছিল পপির সঙ্গে। তার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি। এ দেখা ঠিক দেখা হচ্ছে না। এ সব জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। সঙ্গে গাইড থাকলে কিছু বাদ দেওয়া চলে, প্রধান দর্শনীয় বস্তুগুলি তারা চিনিয়ে দিতে পারে।

তবু আমরা অনেক ছবি দেখলুম। অনেক বিলেতি ও দেশী ছবি, অনেক দেশী ও বিদেশী লোকের ছবি, অনেক নাম করা শিল্পীর ছবি। নিচে যে বিরাট ছবিটি দেখছিলুম, তা রুশ শিল্পী ভেরেশ্চেগিনের আঁকা। জর্মন শিল্পী জোহান জোফানিও একজন সেকালের বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। তাঁরও আঁকা আট ন-খানি ছবি

আছে। লর্ড অকল্যাণ্ডের বোন এমিলি ইডেনের আঁকা কয়েকখানি ছবি আছে। জে টি সিটন, জেম্‌স্‌ হাণ্টার, এটকিন্সন, ড্যানিয়েল রবার্ট হোম, চার্ল্‌স্‌ হার্ডিঞ্জ, স্যামুয়েল ডেভিস প্রভৃতি আরও অনেক শিল্পীর ছবি।

আবার দেশী শিল্পীর ছবিও কম নেই। ত্রিবাঙ্কুরের রাজকুমার রবি বর্মা থেকে বাঙলার শিল্পী অতুল বসুর আঁকা স্বদেশী নেতা ও মহাপুরুষদের ছবি।

এ ছাড়াও আছে মোগল পেন্টিং রাজপুত পেন্টিং মিনিয়েচার পেন্টিং ও নবাব আলিবর্দী খাঁ ও অন্যান্য নবাবদের মূল্যবান চিত্র-সংগ্রহ। প্রাচীন কলকাতার অনেক চিত্র ও মানচিত্রও আছে। কিন্তু সে সব দেখবার উৎসাহ যেন কারও নেই।

অনেক দর্শনীয় জিনিসের কথা আমি শুনেছিলুম। তার কিছু কিছু মনেও পড়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্‌ মনুসংহিতার অনুবাদ করেছিলেন পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সহযোগিতায়। সেই পাণ্ডুলিপি আছে এখানে। প্রধান বাঙলা সংবাদপত্র দিগ্‌দর্শন, দু শো বছরেরও বেশি পুরনো ফস্টর সাহেবের ইংলিশ-বেঙ্গলী ডিক্‌সনারি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত মতামতের আলোকচিত্র, কেশব সেনের আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপির পাতা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কবিতার পাণ্ডুলিপি, মাইকেল মধুসূদনের কবিতার ফরাসী অনুবাদের আলোকচিত্র, রবীন্দ্রনাথের চিঠি, তিব্বতী পাণ্ডুলিপি, টাউনহলের লটারির টিকিট, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিল, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার টেবিল ও এই রকমের নানা জিনিস।

আমরা আরও উপরে গম্বুজের ধারের গ্যালারিতে মুরল চিত্র দেখলুম না। তার উপরেও উঠলুম না। হুইস্পারিং গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে প্রতিধ্বনির শব্দও শুনলুম না। পপি বোধহয় এসব কথা জানেও না। জানলে সে নিজেই আমাদের উপরে টেনে নিয়ে যেত।

তাই দোতলা থেকে সোজা নেমে এল নিচে, তারপর বাহিরের রাস্তায় বেরিয়ে এল উমাশঙ্করের গাড়ির খোঁজে।

পপি ও স্বাতিকে নিঃশব্দে অনুসরণ করতে করতে আমার মনে হল যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-মন্দিরই নয়। এ আমাদের প্রাচীন কলকাতারই স্মৃতিমন্দির। লর্ড কার্জন ইংলণ্ডের রাণীকে সম্মান করতে গিয়ে কলকাতার রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকেই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এই অপরূপ সৌধের মধ্যে। নিজেদের অজ্ঞানতার জন্যেই বুঝি আমরা একে ক্যালকাটা মেমোরিয়াল না বলে বলি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

আরও একটি অদ্ভুত কথা আমার মনে এল। বাঙলার অগ্নিযুগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েই এই মেমোরিয়ালের ভিত্তি স্থাপন হয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে যখন বাঙালীর প্রবল ঘৃণা দিকে দিকে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে, নির্ভীক বাঙালী সেদিন ইংরেজের কোন কীর্তি ধ্বংস করে নি, অবমাননা করে নি কোন রাজপুরুষের মর্মর মূর্তির। এই সব কীর্তিকে রক্ষা করে বাঙালী তার ঐতিহ্যপ্রীতিকেই প্রমাণ করেছে।

কিন্তু এ কালের নবীনরা কি এ কথা মেনে নেবে না! স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়েরা দেশের মহাপুরুষদের অবমাননা করে কী প্রমাণ করবে জানি না।

১৯

পপি বাহিরে এসে সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে উমাশঙ্করের গাড়ি দেখতে না পেয়েই বলে উঠল : এই জন্যেই আমি লোকটাকে—

স্বাতি বাধা দিয়ে বলল : একটু ঘুরে দেখতে হবে।

এ দিকে গাড়ি রাখবার জায়গা ছিল না বলে আমি বললুম : এইখানেই দাঁড়াও, আমি দেখে আসছি।

বলে যেই এগিয়ে যাচ্ছিলুম, অমনি উমাশঙ্করের ডাক শুনতে পেলুম : এই যে, এই যে ব্রাদার!

পরক্ষণেই ভদ্রলোক লাফিয়ে সামনে এসে উপস্থিত হল।

পপি বলল : কোথায় থাক বল তো!

এখানেই তো ছিলুম, এই গাড়িটার পেছনে।

বলে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। তারপরে গাড়িতে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল : এইবারে মিউজিয়ামে তো!

পপি একটা ভ্রূকুটি করে বলল : পাগল নাকি!

এই মন্তব্য শুনে স্বাতির মতো আমিও আশ্চর্য হলুম। আর উমাশঙ্করও কতকটা বিহ্বল চোখে তাকাল পপির মুখের দিকে। গাড়ি চালাবার কথা সে বোধহয় ভুলেই গেল।

দেহটা এলিয়ে দিয়ে পপি বলল : ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

তাই বল।

বলেই উমাশঙ্কর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে চলল। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই পার্ক স্ট্রীটের একটা রেস্তোরাঁয় এনে উপস্থিত করল। আমরা নেমে পড়লুম।

ভিতরে ঢুকে উমাশঙ্কর একটা খালি টেবল নিয়ে বসল। বলল : কী খাবে বল?

বলে পপির দিকে না তাকিয়ে তাকাল স্বাতির দিকে।

স্বাতি বলল ঃ শুধু এক পেয়ালা চা।

হোয়াট্!

না, উমাশঙ্কর নয়, বিস্ময় প্রকাশ করল পপি। চায়ের নাম শুনেই বিস্ময়। কিন্তু স্বাতি নির্বিকার ভাবে বলল ঃ আমরা অন্য কিছু খাই নে।

পপি হতাশ হল। উমাশঙ্কর বলল ঃ কফিও না ?

স্বাতি আরও দৃঢ় ভাবে বলল ঃ চা-ই ভাল লাগে।

তুমি ?

বলে উমাশঙ্কর তাকাল পপির দিকে। আর পপি কিছুই বলল না দেখে বেয়ারাকে চা আনতে বলল।

চায়ের সঙ্গে পেস্ট্রি এল এক প্লেট। কিন্তু ক্ষিধের অভাবে আমরা সে সব খেলুম না। এক এক পেয়ালা চা খেয়েই বেরিয়ে এলুম।

মিউজিয়ামে যাবার জন্যে স্বাতি ব্যস্ত হয়েছিল বেশি। বলেছিল ঃ দেরি হলে মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাবে।

মিউজিয়ামকে আমরা জাত্নঘর বলি। কিন্তু কেন বলি তা জানি না, জাত্ন মানে ম্যাজিক বা ইন্দ্রজাল। কিন্তু জাত্নঘরে সে রকম কিছু নেই। আছে একটা দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক কালের সংগৃহীত প্রত্নতত্ত্ব নৃতত্ত্ব ভূতত্ত্ব প্রাণী ও উদ্ভিদ বিদ্যার এবং শিল্প ও ললিতকলার নিদর্শনের সংগ্রহ।

পার্ক স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে আমরা চৌরঙ্গী রোড ধরে এসপ্লানেডের দিকে এগোলুম। তারপর খোলা ময়দানের দিকে গাড়ি রেখে এগোলুম জাত্নঘরের বিরাট বাড়ির দিকে। এক দিকে আর্ট কলেজ ও জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিস, অন্য দিকে জাত্নঘরের একশো বছরের পুরনো বাড়ি। জনযানবহুল পথ পেরিয়ে জাত্নঘরের ভিতরে আমরা ঢুকে পড়লুম।

পপি স্বাতিকে বলল: এ সব জায়গায় জানতাম স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাই আসে।

স্বাতি বলল: তাদের দেখবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে শুনেছি, তাই না?

বলে সে আমার দিকে তাকাল।

বললুম: জনা ত্রিশেক ছাত্রের তিনটি দলকে গাইডরা এক সঙ্গে দেখাতে পারে বিকেলের দিকে। এখানে কয়েকটা ক্লাসও হয় শুনেছি।

পপি বলল: আমরা তো ছাত্র নই, আমাদের কোন পরীক্ষাও দিতে হবে না।

আমি বুঝতে পারছিলুম যে এই মিউজিয়ামের কোন আকর্ষণ নেই পপির কাছে। সে কথা সে স্বীকার করেই বসল। বলল: যা দেখবার আছে, এক নজরে দেখে নিউ মার্কেটে চল।

উমাশঙ্কর বলে উঠল: কিছু কেনবার আছে নাকি?

তবে কি আমি উইণ্ডো শপিংএ যাব ভাবছ!

বলে পপি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করল।

আমি বললুম: তবে আজ এখানে থাক।

উমাশঙ্কর বলল: থাকবে কেন! আমাদের আর কতক্ষণ সময় লাগবে!

বলে গটমট করে এগিয়ে যেখানে পৌঁছল সেখানে একটা চতুষ্কোণ অঙ্গন দেখলুম। তার চারি ধার ঘিরে ইটালিয়ান স্টাইলের কলোনেড। বাড়িটি যে তিনতলা তাও বুঝতে পারলুম এইখানে দাঁড়িয়ে। তারপরে এই কলোনেডের চারি ধার ঘুরে দেখলুম।

উত্তর দিকে দেখলুম জিওলজিকাল গ্যালারী—মিনারাল ও মেটিয়রাইট, পূর্ব দিকে জুলজিকাল গ্যালারি—ইন্‌ভার্টিব্রেট, আর দক্ষিণ দিকে আর্কেয়লজিকাল গ্যালারিতে গুপ্ত ও অশোকের যুগের নানা লিপির সংগ্রহ।

যে ভাবে সবাই অন্য ধারে এগিয়ে গেল তাতে স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পারলুম যে আজ দেখা কিছুই হবে না। এভাবে নিউ মার্কেট দেখা যায়, জাদুঘর নয়, তবু অনেক কিছু নজরে পড়ল। খুঁটিনাটি না বুঝলেও মোটামুটি ভাবে একটা ধারণা হল।

এ দেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন বোধহয় এই জাদুঘরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। তা হল পাঁচ হাজার বছরের পুরনো শহর মহেঞ্জোদড় ও হরপ্পার মাটি খুঁড়ে পাওয়া শিল্পের নমুনা। তারপর মৌর্য শুঙ্গ ভারহুত গান্ধার ও গুপ্ত যুগের নিদর্শন। মধ্যযুগের উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে, হিন্দু ও মুসলমান আমলে ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন থেকে, অধুনা লুপ্ত কৌশাম্বী তক্ষশীলা বৈশালী নালন্দা থেকেও শিল্পকর্মের নিদর্শন এনে এই জাদুঘরে সংরক্ষিত হয়েছে। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসে যারা কৌতূহলী, ভারহুত গান্ধার ও গুপ্ত গ্যালারি তাদের যত্ন করে দেখতে হবে। বাঘেলখণ্ডের ভারহুত স্তূপ থেকে জাতকের কাহিনী চিত্রিত পাথর এনে বুদ্ধ গয়া সাঁচী ও উড়িষ্যার নিদর্শন মিলিয়ে সাজানো হয়েছে ভারহুত গ্যালারি। পেশোয়ারে পাওয়া নিদর্শন আছে গান্ধার গ্যালারিতে, আর গুপ্ত গ্যালারিতে আছে অমরাবতী সারনাথ বাঙলা বিহার উড়িষ্যা দক্ষিণ ভারত ও জাভা কম্বোডিয়ার স্থাপত্য শিল্পের নমুনা।

কোন রকমে চোখ বুলিয়ে এগিয়ে গেলেও আমি একবারে হতাশ হই নি। বিভিন্ন বিভাগে কী রকমের জিনিস সাজানো আছে, তার উপরে লক্ষ্য রেখেছিলুম। অ্যান্থ্রপলজিকাল গ্যালারিতে তিনটি বিভাগ দেখলুম—এ দেশের আদিবাসী, তাদের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র এবং নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এই নৃতত্ত্ব বিভাগ। নাগা মিশ্‌মি মিকির ডফলাদের সঙ্গে আন্দামান ও নিকোবরের উপজাতিদের পরিচয়ও আছে।

জিওলজির শিবালিক ফসিল গ্যালারিতে অনেক আশ্চর্য পশু পাখির কঙ্কাল আছে—হায়না বীয়ার, পোলার বীয়ারের আকারের

কুকুর জাতীয় প্রাণী অ্যাম্ফিসিয়ন, বাঘের মতো বড় শিবালিক বেরাল, এগার ফুট উঁচু একটা হাতির কঙ্কাল। শুধু হাতির নয়, গণ্ডার জিরাফ হিপোপটেমাস কুমীর বানর প্রভৃতি নানা পশু পাখির কঙ্কাল আছে সাজানো। কঙ্কালের এমন সম্পূর্ণ সংগ্রহ পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই নাকি আছে।

তারপরে জুলজিকাল বা জীববিদ্যা বিভাগের ছটি গ্যালারি—ইনভার্টিব্রেট, অ্যাম্ফিবিয়াস-রেপটিলিয়ান, বার্ড, ফিশ, ইনসেক্ট গ্যালারি ও ছোট বড় ম্যামাল গ্যালারি। শুধু এ দেশের নয়, বিদেশের জীবজন্তুর নমুনাও আছে।

এ ছাড়াও আছে কলা বিভাগের কয়েকটি আকর্ষণীয় গ্যালারি—উড কার্ভিং টেক্সটাইল ব্রোঞ্জ আইভরি প্রভৃতি কারু শিল্পের গ্যালারি। প্রাচীন ও আধুনিক কালের দেশ-বিদেশের সুন্দর জিনিসের নমুনা। দিল্লীর বাদশাহরা ঢাকার যে মসলিন ব্যবহার করতেন, তারও নমুনা এখানে সাজানো আছে। কিন্তু এ সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখবার কৌতূহল কারও নেই।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আমরা এক দিক থেকে অন্য দিকে চলে যাচ্ছিলুম। কোথাও গ্যালারি, কোথাও লাইব্রেরি, কোথাও বা অফিস ঘর। সরকারের অনেক ডিপার্টমেণ্ট এই সব লাইব্রেরি ও অফিস ঘরের মালিক। কিন্তু এক শো বছর আগে এ সবই ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পত্তি। তাদের বইএর লাইব্রেরি ছাড়া আর সব কিছুই তারা এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেছিল। তাদের সংগ্রহ নিয়েই এই জাদুঘর।

শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে সে যুগের কিউরেটাররা পঞ্চাশ থেকে দু শো টাকা মাইনে পেতেন। সোসাইটি নিঃস্ব হয়ে যাবার পরে সরকারী সাহায্য পাওয়া যেত শ তিনেক টাকা। তাতেই এই সংগ্রহশালা চলত।

সে সময়ে ডালহৌসি স্কোয়ারে একটি ইকনমিক মিউজিয়াম

ছিল। সেটি এখন এই মিউজিয়ামের অন্তর্গত হয়েছে। তাদের বাঙলার ধানের একটি সংগ্রহ ছিল। সেই সংগ্রহে নাকি আট শো রকমের ধান ছিল। সব রকমের ধান এখন হয় কিনা কে জানে!

পপিই পথ দেখিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, আর আমরা অনুসরণ করছিলুম তাকে। উপর থেকে সে নিচে নেমে এল। তারপরে বেরিয়ে এল বাহিরে। মিউজিয়ামের বিক্রয় কেন্দ্রে আমার একটু দাঁড়াবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তার সুযোগ পেলুম না। শুনেছিলুম যে এই বিক্রয় কেন্দ্রে ফোল্ডার ও ছবির পোস্টকার্ডের সঙ্গে কিছু মূর্তির কাস্ট্ কম দামে কিনতে পাওয়া যায়। সেগুলি নাকি উপহারের উপযোগী জিনিস। পুরাকালের জিনিস উপহার দেবার আনন্দ অন্য রকম।

যানবাহনবহুল পথ পেরোতে আমাদের কিছু সময় লাগল। আমরা এসে উমাশঙ্করের গাড়িতে উঠলুম। পপি এবারে নিউ মার্কেটে যাবে।

নিউ মার্কেটের দিকে গাড়ি চালিয়ে উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমার কোন জরুরি কাজ আছে?

পপি সংক্ষেপে বলল ঃ খুব জরুরি কাজ।

কিন্তু কী কাজ তা বলল না। উমাশঙ্করও তা জানতে চাইবার সাহস পেল না।

আমি তখন নিউ মার্কেটের কথা ভাবছিলুম। এই বিরাট বাজারটার সরকারী নাম কী, তা মনে করবার চেষ্টা করছিলুম। পুরনো লোকেরা একে হগ মার্কেট বলেন। একশো বছর আগে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্যর স্টুয়ার্ট হগ বহু টাকা খরচ করে এই বাজার তৈরি করেছিলেন। তাঁর নামেই বাজারের নাম হয়েছিল। কিন্তু অনেকে এই বাজারকে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটও বলে। তবে এই নাম পরিবর্তন করে বোধহয় এখন নিউ মার্কেট নাম রাখা হয়েছে।

দিনে দিনে বাজারটিও বড় হয়েছে। এখন এর আয়তন বোধহয় চল্লিশ বিঘে। স্থায়ী দোকান প্রায় দেড় হাজার, আর অস্থায়ী দোকানের সংখ্যাও আট শোর বেশি হবে। নিউ মার্কেটে পাওয়া যায় না এমন দেশী ও বিদেশী জিনিস বোধহয় নেই, কিন্তু কোথায় কী পাওয়া যায় সেই রহস্যটি জানা থাকা চাই।

পপি হঠাৎ পিছন ফিরে বলল: বুঝলি স্বাতি, দেশী কস্‌মেটিক্স আমি ব্যবহার করতে পারি নে।

স্বাতি এ কথার কোন উত্তর দিল না। আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে পপি বলল: মা কিছু দেশী জিনিস যোগাড় করেছেন, আর বলছেন, সে সব নাকি খুব ভাল জিনিস। হোয়াট্ ননসেন্স্!

উমাশঙ্কর গম্ভীর ভাবে বলল: বিদেশী জিনিস এখন আর আসে না তো!

তুমি থামো তো!

বলে পপি তাকে থামিয়ে দিল। তারপর স্বাতিকে বলল: আমার একটা চেনা দোকান আছে। দোকান ঠিক নয়। একটা লোক ক্যমি শেনেল অ্যাভন যা চাই তাই যোগাড় করে দেয়। অ্যাভন পাউডারের এমন সুগন্ধ যে গলায় একটু ছোঁয়ালেই মনে হবে যে শেনেলের সেণ্ট ছড়িয়েছি সারা গায়ে।

স্বাতি এ কথারও কোন উত্তর দিল না।

আমি তখনও নিউ মার্কেটের কথাই ভাবছিলুম। বম্বের ক্রফোর্ড মার্কেট দেখেছি, দেখেছি মাদ্রাজের মুওর মার্কেট। দিল্লীতে এই ধরনের বাজার আছে কিনা জানি না। কিন্তু কলকাতার এই নিউ মার্কেটের সঙ্গে কোন বাজারের তুলনা হয় না। এ বাজারের কোন তুলনা এ দেশে নেই।

খবরের কাগজে এক দিন এই বাজারের দুর্দশার কথা পড়ছিলুম। জায়গায় জায়গায় নাকি ছাদ ফুটো হয়ে গিয়েছে। জল পড়ে বর্ষার সময়। বিজলির তার বদলাবার দরকার, যখন তখন বাতি নিভে

যায়। অনেক নর্দমা পরিষ্কার হয় না। উন্নতির বদলে বাজারের অবনতি হচ্ছে প্রতি দিন।

কিন্তু এর চেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে যে এই বাজারে নাকি জুয়ার আড্ডা বসেছে, মদ চোলাই হচ্ছে, আর বিদেশীদের পিছনে লাগছে দালাল আর ভিখিরি। খবরের কাগজের এ কথা সত্যি কিনা জানা নেই। আমরা এ বাজারে আসি না শৌখিন দাম বলে। জিনিসপত্রের দাম যদি নির্দিষ্ট হত, তাহলে সুবিধা হত আমাদের মতো সাধারণ মানুষের। এ বাজারে সব কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু দামের জন্যেই এ বাজারে শৌখিন মানুষেরাই আসবে।

কলকাতার রাজপথে এখন বাতি জ্বলতে শুরু হয়েছে।

২০

লিণ্ড্সে স্ট্রীট ধরে উমাশঙ্কর নিউ মার্কেটের ঠিক সামনে এসে গাড়ি পার্ক করল। আমরা নেমে পড়লুম।

পপি বলল : তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি।

উমাশঙ্কর বলল : টাকা নিয়ে যাও।

দাও।

বলে পপি উমাশঙ্করের হাত থেকে খান কয়েক নোট নিয়ে চলে গেল।

আমি স্বাতির দিকে তাকালুম, কিন্তু স্বাতি যেন কিছুই লক্ষ্য করে নি এমনি ভাবে বলল : সামনের ঐ ফুলের দোকানগুলি আমার খুব ভাল লাগে। বছরের কোন সময়ে ওদের শো-কেসগুলো খালি থাকে না।

উমাশঙ্কর বলল : কিন্তু প্রতি দিন ওদের ফুল বদলাতে হয়। বাসি ফুলের কারবার একেবারে নেই।

স্বাতি বলল : সজীব বলেই এমন ভাল লাগে।

তারপরে আমাকে বলল : প্রথমে তোমার একটু অস্নুবিধা হবে, কিন্তু—

কিসের অস্নুবিধা ?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি উমাশঙ্করকে বলল : আমি ওকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলছি।

উমাশঙ্কর আঁৎকে উঠে বলল : সে কি !

স্বাতি সাহাস্যে বলল : দেখুন না, বেশি পয়সার জন্যে কেউ দেশ ছেড়ে বিদেশে চাকরি করতে যায় ! পয়সা কম থাকলে খরচ কম কর, দুজনে চাকরি কর—

আমি হেসে বললুম: একজন দুজন হব কী করে!

আমার কথায় স্বাতির মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উমাশঙ্কর হা-হা করে হেসে উঠে বলল: ঠিক বলেছেন ব্রাদার। রোজগারের বেলায় সব পুরুষই একজন, খরচের বেলায় দুজন কেন—

ঠিক এই সময়ে পপি ফিরে এল, বলল: তোমাকে নিয়ে আর পারি নে, মান সম্মান আর কোন খানে থাকবে না।

তার পিছনে একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে আরও কিছু টাকা দিতে হবে। সেই অঙ্কটা বলেই যোগ করল: দেখলে আমি ব্যাগ নিয়ে গেলাম না—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: এখানে আর কিছু কাজ আছে?

আছে বৈকি!

বলে হাতের জিনিসগুলি পপি গাড়ির ভিতর তুলে রেখে বলল: দাঁড়িয়ে আছ কেন! গাড়িটা বন্ধ কর।

একটা মস্ত বড় কাজ ভুল হয়ে গেছে, এমনি ভাবে উমাশঙ্কর ছুটে গেল। আর পপি একবার তার নিজের দিকে চেয়ে বলল: সারা দিন এই শাড়িটার উপরে ধকল গেছে, এটা পরে কি হোটেলে খেতে যাওয়া যায়! তুই শাড়ি বদলাবি না?

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল: না।

কিন্তু এ কথায় পপির কোন উদ্বেগ দেখা গেল না, বলল: নয়নার ফ্ল্যাটে গিয়ে শাড়িটা চট্ করে বদলে নেব। নয়নাকে তোর মনে নেই!

আর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল: বেশ আছে নয়না।

উমাশঙ্কর তার গাড়ি বন্ধ করে ফিরে এসেছিল, বলল: বেশ আছে বোলো না।

কেন?

ও ভদ্রলোক বিয়ে না করলে তার কী হবে বল! ভদ্রলোকের

নিজের পরিবার আছে তো, ছেলেমেয়েও আছে। বিয়ে করব বললেই করা যায় না!

এই বুদ্ধি না হলে তুমি চাকরি করছ!

বলে পপি হনহন করে শাড়ির দোকানের দিকে এগিয়ে চলল।

স্বাতি বলল: তোমরা শাড়ি কেন, আমি একটু বাজারটা ঘুরে দেখে আসি।

বলে আমাকে চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে চলল।

নিউ মার্কেট তখন বিজলির আলোয় ঝলমল করছে। কত দোকান আর তাতে কত রকমের জিনিস থরে থরে সাজানো আছে তার যেন শেষ নেই। মানুষের প্রয়োজনীয় কোন জিনিস এই বাজারে নেই তা ভাবতে পারা যায় না। আর সে সব এমন ভাবে সাজানো যে জানা থাকলে সরাসরি সেখানে চলে যাওয়া যায়। অন্য শহরে গিয়ে স্বাতি ঠিকই বলত যে কলকাতার নিউ মার্কেটের মতো আর একটি বাজার এ দেশে নেই।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে আমরা এই বাজারে খানিকক্ষণ ঘুরে দেখলুম। সামনে যেমন ফুল ও শৌখিন জিনিসের দোকান, পিছনের দিকে তেমনি মাছ তরকারি ও সব রকম খাবার জিনিস, জুতো ছাড়া বাক্স বিছানা বাসন কোসন সবই আছে। আর কিছু কিনলেই দেখা যায় ঝাঁকা মুটে, ছোটখাটো জিনিস বইবার জন্যেও তারা হাত বাড়িয়ে দেয়। দোকানে ডাকাডাকি আছে—খদ্দেরকে আমন্ত্রণ, ভোলাবার চেষ্টা, দরাদরিও আছে। আর এই বাজারে ঢোকবার ও বেরোবার জন্যে দরজা আছে অনেকগুলি। যে দিক থেকে খুশি ঢোকা যায়, বেরোনোও যায় যে দিক দিয়ে খুশি, কিন্তু আমাদের আবার সামনে ফিরে আসতে হল, উমাশঙ্কর গাড়ি রেখেছে সামনে।

কিন্তু তারা এখনও ফেরে নি। এই সুযোগে আমি বললুম: কলকাতায় এসে অবধি মনে হচ্ছে, কোন নতুন মানুষের সঙ্গে ঘুরছি।

স্বাতি বলল: এই জন্যেই তো পপি নতুন শাড়ি কিনতে গেছে।

মানে ?

নতুন শাড়ি পরে তাকে নতুন মানুষ মনে হবে।

বললুম : আমার কথার উত্তরটা তুমি এড়িয়ে গেলে। বাইরের রূপের কথা আমি ভাবি নি।

স্বাতি বলল : তাহলে আকাশের দিকে তাকাতে হবে।

কেন ?

সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় যদি না হয় তো ধূমকেতু উঠেছে কিনা দেখ।

বলে হাসতে লাগল।

সূর্য কি নিচে গেছে ?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : সূর্য তার নিজের রঙ দেখতে পায় কিনা সেইটেই ভাবনার কথা।

মনের আকাশটা দেখা যায় না কিনা তাই ভাবনা।

চোখ বন্ধ কর, মন দিয়ে মনের আকাশ দেখবে। তাতে সূর্যোদয় না সূর্যাস্ত, তাও বুঝতে পারবে।

ঠিক এই সময়ে ফিরে এল উমাশঙ্করেরা। পপির মুখে বেশ খুশি-খুশি ভাব। বলল : তোরা বুঝি এইখানেই দাঁড়িয়ে আছিস ?

স্বাতি বলল : রাতের আকাশ দেখছি।

পপি আশ্চর্য হয়ে বলল : এখানে দাঁড়িয়ে! প্ল্যানেটারিয়ামের ভিতরে বসে তো অনেক ভাল দেখা যায়। বুঝিয়েও দেয় তারা। দেখিস নি!

সেই পুরনো কথা। স্বাতি বলল : নিজের চোখে দেখে চিনলে অভিজ্ঞতা বাড়ে।

উমাশঙ্কর তখন গাড়ির দরজা খুলে শাড়ির বাক্সটা রেখে দিয়েছিল। অন্য দরজার তালা খুলে দিতেই আমরা উঠে পড়লুম।

বেশি দূরে নয়, চৌরঙ্গী রোডের একটা বাড়ির দরজায় এসে

গাড়ি থামল। শাড়ির বাক্সটা হাতে নিয়ে পপি নেমে পড়ল। উমাশঙ্করও নামতে যাচ্ছিল। কিন্তু পপি বলে উঠল: তুমি নামছ কেন!

বলে এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উমাশঙ্কর এবার স্থির হয়ে বসে বলল: চব্বিশ ঘণ্টায় দিন বলে কলকাতা শহরে ভারি অসুবিধে।

স্বাতি হেসে বলল: কেন বলুন তো!

মানে—চব্বিশ ঘণ্টায় এখানে সব কাজ ম্যানেজ করা যায় না।

আমি ভেবেছিলুম যে ভদ্রলোকের বোধহয় অফিসের কথা মনে পড়ছিল—অফিসের কাজে অবহেলার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই তার বক্তব্য স্পষ্ট হল। আমার দিকে চেয়ে বলল: নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নেমে এসে বলবে, সকালে দাড়িটাও ভাল করে কামাতে পার না! আপনিই বলুন, দোষটা আমার না দাড়ির!

তারপরে বলল: এবার থেকে সঙ্গে একটা ট্রান্‌জিস্টার শেভার রাখব। এই রকম ফুরসতের সময় কামিয়ে নেওয়া যাবে।

স্বাতি হেসে বলল: তার চেয়ে এই দিকেই একটা ফ্ল্যাট নিন।

উমাশঙ্কর গম্ভীর ভাবে বলল: বাড়িতে গলাধাক্কা খাবার আগে তাই করতে হবে।

এই জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই, তার জন্যে ক্ষোভও নেই কোন। জীবনের আকাশটা এত বড় যে এক সঙ্গে আমরা তার সমগ্র রূপ কখনও দেখতে পাই নে। দেখবার চেষ্টাও করি না। জীবনের খণ্ড রূপকেই আমরা সত্য ভেবে এগিয়ে চলি। আমি তাই উমাশঙ্করের কথার উত্তর দিলুম না। কিন্তু স্বাতি হেসে বলল: সে ভয়ও আছে নাকি?

উমাশঙ্কর বলল: আছে মানে! মা না সামলালে দাদারা অনেক আগেই বার করে দিত।

সত্যি!

আরও কিছু জানবার জন্যেই স্বাতি এই কৌতূহল প্রকাশ করেছিল। আর উমাশঙ্করও অসঙ্কোচে বলল: রোজগারের চেয়ে যে ছেলের খরচ বেশি, সে ছেলেকে মা আর কত দিন সামলাবে বলুন!

তারপরেই ভয় পেয়ে বলল: আপনি যেন এ সব কথা আপনার বন্ধুকে বলবেন না।

কেন?

বিয়েটাই তাহলে ভেঙে যাবে।

ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করি, বিয়ের পরে কী হবে! কিন্তু প্রথম পরিচয়ের দিনেই সে কথা বলতে সঙ্কোচ হল। কিন্তু স্বাতি কোন সঙ্কোচ করল না, প্রশ্ন করল: পপি আপনার সব কথা জানে তো?

উমাশঙ্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: জানে কিনা সেই জানে।

আপনি কিছু বলেন নি তাকে?

শুনতে চাইলে তো বলব। আর—

বলুন।

মানে—

বলুন না।

মানে এই সব মেয়ের কাছে ওর আসাটা আমি পছন্দ করি না। মানে—

মানে বলুন।

মানে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এ রকম জীবনটা তো ঠিক সামাজিক নয়, সম্মানেরও নয়। অথচ পপি যে কেন—

বলে সভয়ে চারি দিকে চেয়েই থেমে গেল। তারপরেই ব্যস্ত ভাবে দরজা খুলে নেমে পড়ল।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম যে পপি তার সমবয়সী একটি

মেয়ের সঙ্গে পথে বেরিয়ে আসছিল। উমাশঙ্কর ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে নমস্কার করল। কী কথা হল শুনতে পেলুম না। পপি তাকে টেনে নিয়ে গাড়ির কাছে চলে গেল, আর মেয়েটি চলে গেল ভিতরে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে একবার তাকাল। কিন্তু তার মুখে কোন ভাবান্তর দেখলুম না। পপি বলল: খুব বেশি দেরি হয় নি তো?

বলে গাড়িতে উঠে বসতেই তার প্রসাধনের উগ্র গন্ধে যেন নেশা ধরে গেল।

স্বাতি বলল: আমি ভেবেছিলাম তোর আরও দেরি হবে।

কেন?

শুধু শাড়িটাই বদলালি, খোঁপা বদল করা হল না।

পপি বলল: খোঁপা আমি নিজে বাঁধি না তো, দোকানে বেঁধে আসি।

উমাশঙ্কর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞাসা করল: কোথায় যাবে?

পপি একটা হোটেলের নাম করতেই উমাশঙ্কর চমকে উঠল। আর পপি তা দেখতে পেয়ে বলল: অমন আঁৎকে উঠলে কেন! নয়নারাও আসছে। ভাল ফ্লোর শো আছে আজ।

কিন্তু স্বাতির কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলুম। সে বলল: আজ আমাদের হাতে একেবারেই সময় নেই ভাই। তাড়াতাড়ি কোথাও খেয়ে নিয়েই ফিরব ভাবছি।

সে কি!

বলে পপি যেন আকাশ থেকে পড়ল।

স্বাতি বলল: আমাদের কোথাও নামিয়ে দিয়ে তোমরা এগিয়ে যাও।

মাথা দুলিয়ে পপি বলল: না না, তা হয় না। আমরা এক সঙ্গেই খাব।

উমাশঙ্কর কোন্ দিকে যাবে ভেবে পাচ্ছিল না। স্বাতি বলল: আমরা ছোটখাটো জায়গাতেই খেতে ভালবাসি। বেশি নাচগান হলে খেয়ে আমার পেট ভরে না।

পপি বলল: তুই দেখছি সেই রকমই আছিস। এ যুগের মেয়ে হয়েও যেন—

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই স্বাতি উমাশঙ্করকে বলল: কলেজে পড়বার সময়ে আপনি যে রেস্তোরাঁয় খেতে ভালবাসতেন, চলুন তো সেখানে!

উমাশঙ্করের কাছে এই প্রস্তাব যেন অবিশ্বাস্য মনে হল। বলল: আপনারা যাবেন সেখানে?

কেন যাব না!

সেখানে তো কোন ড্রিঙ্কস্ নেই!

ভাল খাবার আছে তো!

খুব ভাল খাবার, আর—

বলুন।

মানে বেজায় সস্তা। মানে চার জনে পেট ভরে খাবার পর পয়সা দেবার সময় মনে হবে কেউ কিছুই খাই নি।

তাহলে তো আরও মজা। সেইখানেই আপনি চলুন।

পপি বলল: তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল স্বাতি!

কেন?

ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে বসে কি আমরা খেতে পারি! হাঁ করে সব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

স্বাতি বলল: কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না।

প্রেস্টিজের কোন প্রশ্ন নেই!

ও কথাটাই মেকি। দাম হল মনুষ্যত্বের।

পপি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধরা গলায় বলল: আমাকে তোমরা নামিয়ে দিয়ে যাও।

স্বাতি বলল : তবে চল্ সেই রেস্তোরাঁটায় যাই। তুই খুব খুশি হয়েছিলি সেখানে খেয়ে।

কোথায় বলুন তো ?

বলে উমাশঙ্কর স্বাতির দিকে তাকাল।

স্বাতি নাম করতেই সে বলল : এই তো কাছে।

বলে রাস্তার ধার ঘেঁষে একটুখানি এগিয়ে গিয়েই গাড়ি থামাল। দরজা খুলে আমরা নেমে পড়লুম।

১১

বাড়ি ফিরে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : তুমি কি খুব ক্লান্ত বোধ করছ ?

হেসে বললুম : আবার কোথাও বেরোতে হবে নাকি ?

আজ নয়, কাল সকালে।

কোথায় ?

অনেক দিন তারকেশ্বরে যাই নি। কাল নিয়ে যাবে ?

হেসে বললুম : মেয়ের এই ভক্তি দেখলে মামী খুব খুশী হতেন।

স্বাতি এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল : ট্রেনে যাব। বাড়ির গাড়িতে যাব হাওড়া স্টেশনে। তুমি রাজী হবার আগেই ড্রাইভারকে বলে রেখেছি।

বললুম : পরশু আবার দীঘা যেতে না হয় !

স্বাতি একটু বিমর্ষ হল, বলল : তোমার হয়তো ভাল লাগবে না।

বললুম : মন্দও লাগবে না।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : সত্যি বলছ !

বললুম : নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

তা হচ্ছে।

বলে স্বাতি আমার কথা মেনে নিল। তারপরেই বলল : মনে হচ্ছে, আমিও তোমার ওপরে জুলুম করছি। তাই পিছিয়ে এসেছি খানিকটা।

কী রকম ?

সুবলবাবু কয়েকটা ফ্ল্যাটের খবর নিয়েছেন, তার মধ্যে একটা

বেশ ভাল। ভাল রাস্তার ওপরে নতুন বাড়িতে ছু ঘরের ফ্ল্যাট। কিন্তু সেখানে থাকতে হলে তো তোমাকে আসামের চাকরিটা ছাড়তে হবে। কলেজে পড়ানোর চাকরি কি তোমার পছন্দ হবে! মাইনেও অনেক কম।

বললুম: আমার প্রয়োজনও তো কম।

এই কথা ভেবেই আমি এগিয়ে যাচ্ছিলুম।

পিছিয়ে এলে কেন?

বললাম তো, তোমার ওপরে জুলুম করছি বলে মনে হচ্ছে।

হেসে বললুম: একে জুলুম বলে না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করছ। তার দাম না দিয়ে জুলুম বললে আমার পাপ হবে।

স্বাতি প্রতিবাদের সুরে বলল: এ তোমার বুদ্ধির কথা নয়, এ আবেগের কথা। যদি ভুল হয়, তখন আপসোস করবে।

বললুম: হেরে গিয়েই মানুষ আপসোস করে। আমি বাঁচব জয়ের আশা নিয়ে।

স্বাতি খুশী হয়ে বলল: তবে কি তুমি আমার হাতেই তোমার ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেবে?

যদি চিরকালের ভার নাও তো কোন দিন আপত্তি করব না।

কথা দিলে?

দিলুম।

স্বাতি উঠে গিয়ে তার টেপ-রেকর্ডার খুলে দিল। সেতার বাজনা। কিন্তু সেই পুরনো সুর নয়। এবারে একটা নতুন সুর বাজছে। সংযত সুর। তাতে আনন্দের রেশ আছে, কিন্তু বসন্তের আবেগ নেই। আমার মনোযোগ দেখে স্বাতি বলল: ভাল লাগছে?

বললুম: নিজের মনের সুরটিই যেন বাজছে।

স্বাতি হেসে বলল: পঞ্চম নয়, বসন্ত নয়, হিন্দোলও নয়।

অথচ এদেরই সংমিশ্রণে হয়েছে ললিত। কিন্তু এই রাগিণীর সময় এখন নয়, ললিত হল রাত্রির শেষ প্রহরের গান। বিলাসবেশে ললিতা অপেক্ষা করছে তার নায়কের জন্যে।

কিন্তু শেষ প্রহরে কেন? প্রথম প্রহরে কি অপেক্ষা করতে নেই?

তোমার ললিতাকে এই কথা জিজ্ঞেস কোরো।

বলে স্বাতি অন্তর্হিত হল।

পরদিন সকালে আমরা তারকেশ্বর যাত্রা করলুম। বাড়ির গাড়ি আমাদের হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল। থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে আমরা ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে বসলুম পাশাপাশি। ট্রেন ছাড়তে দেরি ছিল কিছু। আর ফাঁকা গাড়ি ধীরে ধীরে ভরে উঠতে লাগল।

এক সময় স্বাতি বলল: অনেক দিন আগে একবার মোটরে তারকেশ্বর গিয়েছিলাম বাবা মার সঙ্গে। এখন শুধু ভিড়ের কথাই মনে আছে, আর সব কথা ভুলে গেছি।

বললুম: শ্রাবণ মাসের কোন সোমবারে গেলে তারকেশ্বরের কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত।

কেন?

শ্রাবণ মাসকে আমরা শিবের জন্ম মাস বলে মেনে নিয়েছি।

শিবেরও কি জন্ম আছে!

বললুম: শাস্ত্রে হয়তো নেই, কিন্তু আমাদের সংস্কারে আছে। তাই ভারতের প্রায় সর্বত্র আমরা শ্রাবণ মাসটাকে শিবের মাস বলে মানি। আর সোমবারকে শিবের বার।

স্বাতি বলল: শিবের জন্মবার নাকি?

হেসে বললুম: জানি নে। তবে সোম হলেন শিবের প্রিয় দেবতা, তাঁর মাথার ভূষণ—চন্দ্রাবতংস।

তারপর ?

এই কথার উত্তরেই আমি তারকেশ্বরের মাথায় গঙ্গাজল চড়ানোর গল্প বললুম। দেওঘরে যেমন শিবরাত্রির দিন দলে দলে যাত্রী আসে বাঁকে গঙ্গাজল নিয়ে, তারকেশ্বরে তেমনি গোটা শ্রাবণ মাস ধরে অগণিত যাত্রী ভারতের সব জায়গা থেকে শেওড়াফুলিতে আসে এই কাজের জন্যে। স্টেশন থেকে আধ মাইল দূরে গঙ্গার উপরে নিমাই তীর্থ ঘাট। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নাকি এই ঘাটে স্নান করে এটিকে তীর্থে পরিণত করে গেছেন। যাত্রীরা এই ঘাট থেকেই গঙ্গাজল সংগ্রহ করে। আর এই ঘাটে যাবার পথের দুধারেই প্রয়োজনীয় সব কিছু পাওয়া যায়—বাঁশের বাঁক, মাটির কলসী, দড়ি ঘণ্টা নূপুর সাজসজ্জা ফুল মালা ধূপ দীপ—যা চাই সব। স্ট্যাণ্ডের উপরে এই সব জিনিস রেখে গঙ্গাস্নান করে বাঁকে গঙ্গাজলের কলসী নিয়ে তারকেশ্বর যাত্রা।

দূরত্ব চব্বিশ পঁচিশ মাইলের কম নয়, আর এই পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হয়। আগে মেয়েরা সাহস পেত না। এখন তারাও এগিয়ে আসছে। আর লেখাপড়া জানা এ কালের যুবকদের দেখেও আশ্চর্য হতে হয়। শুধু অশিক্ষিত ধর্মান্ধ মেয়ে পুরুষ নয়, শুধু বাঙলার নরনারীও নয়, ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে হাজারে হাজারে মানুষ প্রতি দিন দুপুরে এসে শেওড়াফুলি স্টেশনে নামে, আর বিকেলের দিকে যাত্রা করে তারকেশ্বর।

বাঁধানো পথ ধরে দলে দলে লোক চলেছে। বাঙালীই বেশি, কিন্তু মুখে হিন্দী বুলি—ভোলে বাবা পার করেগা, তারকনাথ পার করেগা। কখনও বলে—ভোলে বম, তারক বম। ঘণ্টা বা নূপুরের ঝুনঝুন শব্দ, আর দেবতার নাম। ইলেকট্রিক ট্রেনে যাবার সময়েও স্থানে স্থানে এই দৃশ্য দেখা যায়।

কিন্তু একটানা যেতে হয় না। বিশ্রামের জায়গা আছে স্থানে স্থানে। শেওড়াফুলি থেকে সোজা পথে না এগিয়ে একটু ঘোরা

পথে গেলেই পাঁচ মাইলের পরে ডাকাতে কালীবাড়ি। যারা এই পথে আসবে, তারা ছুটো কলসীর উপরে ছুটো ছোট ঘটে গঙ্গাজল আনবে মায়ের জন্যে। মায়ের পায়ে জল চড়িয়ে আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে যাবে।

হিমালয়ে যেমন তেমনি এই পথেও চটি আছে—কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতির চটি চোদ্দ মাইলের মাথায়। অনেকটা জায়গা জুড়ে যাত্রীদের বিশ্রামের জায়গা। চা ও শরবৎ পাওয়া যায় বিনে পয়সায়। যাত্রীরা আসে, স্ট্যাণ্ডের উপরে বাঁক টাঙিয়ে রেখে বিশ্রাম নেয়। কেউ চা খায়, কেউ খায় শরবৎ। খানিকটা সুস্থ হয়ে আবার এগোয়।

আরও কয়েকটি ছোটখাটো চটি পেরিয়ে মন্দকুঠীর বড় চটি। মারোয়াড়ীরাই এই সব চটি পরিচালনা করে, আর অসংখ্য যাত্রীর আশীর্বাদ পায়। বিশ্রাম করে স্নান করে নতুন উদ্যমে আবার যাত্রা মাঝরাতের পরে।

তারকেশ্বর এখান থেকে পাঁচ মাইলের পথ। কিন্তু মাঝখানে আছেন লোকনাথ শিব। তাঁর মাথায় দিতে হয় এক কলসী জল। হাজার-ছুহাজার যাত্রীর লাইন লেগে থাকে সারাক্ষণ, কিন্তু আধ-ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক যাত্রীদের যে ভাবে সাহায্য করে নিঃস্বার্থ ভাবে, তা দেখে মন ভরে যায়।

পরিশ্রান্ত দেহে তারকেশ্বর পৌঁছতে রাত ফুরিয়ে যায়। বাবার মঙ্গল আরতি হয় ভোর চারটের সময়। ততক্ষণ যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু বিশ্রামের জায়গা নেই। ভীড়, অব্যবস্থা, স্থানাভাব, মন্দির কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য—এই সব অভিযোগ অনেকের কাছে শুনেছি। কিন্তু নিজে কোন দিন বাঁকে গঙ্গাজল নিয়ে যাই নি বলে যাত্রীদের সেই ছুরবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় নি। অশেষ কষ্ট ভোগ করে সেই গঙ্গাজল বাবা তারকেশ্বরের মাথায় চড়িয়ে তৃপ্তির কথাও শুনেছি। হ্যাঁ, মানৎ করেছিলুম, সেই মানৎ রক্ষা

করেছি। এইটুকুই তৃপ্তি। অন্ধকারে বাবার রূপ দেখতে পাই নি, ধ্যান করতে পারি নি ধাক্কাধাক্কির জন্যে, আর কলসীর গঙ্গাজল সামলাতে এমনই ব্যস্ত ছিলুম যে মনে কোনও ভাবই জাগে নি। তবু তৃপ্তি পেয়েছি একটি সংকল্প পূরণের।

রেলপথে হাওড়া থেকে তারকেশ্বরের দূরত্ব ছত্রিশ মাইল। সময় লাগে দু ঘণ্টার কম। দেখতে দেখতেই লিলুয়া বেলুড় বালি উত্তরপাড়া পেরিয়ে যায়, তার পরেই হিন্দমোটর কোন্নগর রিষড়া শ্রীরামপুর। শেওড়াফুলি জংসন থেকে লাইন কামারকুণ্ডু জংসন হয়ে তারকেশ্বর পৌঁছেছে। প্রায় প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন আছে।

অনেকটা পথ আমরা এগিয়ে গিয়েছিলুম। কথা বলতে বলতেই যাচ্ছিলুম। স্বাতি এইবারে ইতিহাসের কথা জানতে চাইল।

বললুম ঃ তারকেশ্বর খুব পুরনো তীর্থ বলে মনে হয় না।

কেন ?

ভারামল্ল নামে রামনগরের যে রাজা এই মন্দির নির্মাণ করে দেন বলে সবাই বিশ্বাস করে, তাঁর কাল হল অষ্টাদশ শতাব্দী। ঐতিহাসিক অনুমানে ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি মঠ স্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পত্তি দান করেন।

স্বাতি বলল ঃ রামনগর তো কাশীর কাছে।

হেসে বললুম ঃ সে চৈৎ সিংএর রামনগর। এ হল তারকেশ্বরের মাইল তিনেক দূরে একটি রাজ্য। অযোধ্যার নবাবের ভয়ে এই রাজপুত পরিবার পালিয়ে এসে এখানে রাজা হয়ে বসেছিলেন। তাদের গল্প জানো ?

স্বাতি বলল ঃ না।

আমিও জানতুম না। তারকেশ্বরেই এই সব গল্প শুনেছিলুম।

স্বাতি বাহিরের দিকে একবার চেয়ে দেখল। এখনও অনেক সময় আমাদের কাটাতে হবে। একটু গুছিয়ে বসে বলল ঃ বল।

বললুম ঃ জৌনপুরের কেশব হাজারীর ছোট ছেলে ভারামল্ল,

বিষ্ণুদাস বড় ভাই, আর ছোট বোন হল ভানুমতী। অযোধ্যার নবাবের হাত থেকে এই ভানুমতীকে রক্ষা করবার জন্যেই এঁরা সপরিবারে পালিয়ে এসেছিলেন। আর গ্রামের লোকেদের কাছে কর আদায়ের দায়ে দুই ভাই বন্দী হলেন মুর্শিদাবাদের নবাবের হাতে। জেল থেকে তাঁদের মুক্তি পাবার ঘটনাটি একেবারে অলৌকিক।

এই পর্যন্ত বলে আমি একটু থামতেই স্বাতি বলল: কী রকম?

বললুম: বড় ভাই বিষ্ণুদাস ছিলেন বিষ্ণুর ভক্ত, তাঁর বুকের ভেতর শালগ্রাম শিলা লুকনো থাকত। তিনি বললেন, না খেয়ে আমি প্রাণ ত্যাগ করব।

কেন?

দেবতাকে উপবাসী রেখে তো নিজে খাওয়া যায় না! নবাব এই খবর পেয়ে বললেন, দেখি তোমার দেবতার মহিমা। বলে একটা জ্বলন্ত শাবল এনে বললেন, দু হাত দিয়ে ধর এই শাবলটা। নারায়ণ নারায়ণ বলে বিষ্ণুদাস তাঁর দুই হাতে চেপে ধরলেন শাবল। অসংখ্য লোক এসেছিল এই দৃশ্য দেখতে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে সবাই দেখল যে বিষ্ণুদাসের হাতে একটা ছ্যাঁকাও লাগল না। বিস্মিত নবাব বললেন, মুক্তি দাও দুই ভাইকে। আর বিষ্ণুদাসকে রাজা আর ভারামল্লকে আমি রাও উপাধি দিলাম আজ থেকে। তারকেশ্বরের ইতিহাসের সঙ্গে এই ভারামল্লেরই নাম জড়িয়ে আছে।

এইবারে তারকেশ্বরের কথা বল।

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম: তারকেশ্বরের কথায় কপিলা গাইএর কথা আগে বলতে হয়। ভারামল্লের একটি গাভীর নাম কপিলা। হঠাৎ দেখা গেল যে তার দুধ কমে গেছে। রাজার দরবারে ডাক পড়ল মুকুন্দ ঘোষ গোয়ালার।

স্বাতি হেসে বলল: বুঝেছি। কোন বনের ভিতরে একখণ্ড পাথরের ওপরে দুধ দিত এই কপিলা।

আমিও হেসে বললুম: কিন্তু এই পাথরের উপরে একটা গর্ত ছিল। গ্রামের মেয়েরা নাকি ধান ভানত এই পাথরের ওপর। সেই জন্যেই গর্ত হয়েছিল। যদি সুযোগ পাও তো শিবের মাথায় হাত বুলিয়ে এই গর্তটা দেখে নিও।

তারপরে কী হল বল।

বললুম তো, স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করল মুকুন্দ ঘোষ। খবর পেয়ে ভারামল্ল চেষ্টা করলেন সেটা তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের গাঁয়ে প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু এক শো জন মজুর বারোদিন মাটি খুঁড়েও তার মূল খুঁজে পেল না। শেষ পর্যন্ত সেইখানেই জঙ্গল কেটে মন্দির তৈরি করে দিলেন।

মুকুন্দ ঘোষের কী হল?

কেউ বলে মুকুন্দ ঘোষই তারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত। কেউ বলে, না, রাজা ভারামল্লই সন্ন্যাসী হয়ে প্রথম মোহান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মেনে নেওয়া হয়েছে যে রাজা ভারামল্ল সন্ন্যাসী মায়াগিরিকেই মঠ স্থাপনের অনুমতি দিয়ে তাঁকেই প্রথম মোহান্ত করেছিলেন। তারপরে মোহান্ত হয়েছেন শিষ্যানুক্রমে। আর এঁদের সম্বন্ধেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে—পাঠানদের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের যুদ্ধ, তাঁদের পদচ্যুতি, ব্যবসায় মঠ ক্রয় বিক্রয়, এলোকেশীর সতীত্ব নাশের অপরাধে মোহান্ত মাধবচন্দ্র গিরির কারাদণ্ড ভোগ ও মামলা করে পুনরায় মোহান্ত পদ লাভ, রেলওয়ের পানিপাঁড়ে সতীশচন্দ্র গিরির মোহান্ত পদ লাভ—

স্বাতি হেসে বলল: এই সব নিয়েই তো একটা বই লেখা যায় দেখছি।

আমিও হেসে বললুম: যায় বৈকি। আর শুনে আশ্চর্য হবে যে এই মোহান্তের অত্যাচার ও দুর্নীতির প্রতিবাদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রকেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নামতে হয়েছিল। এই সত্যাগ্রহ চলেছিল প্রায় ছ মাস। স্বামী বিশ্বানন্দ ও সচ্চিদানন্দের সঙ্গে আরও অনেকে কারাবরণ করেছিলেন। কিন্তু মোহান্তকেও পালিয়ে যেতে হয়েছিল। কিছুদিন সরকারী রিসিভারের হাতে থাকবার পরে মন্দির আবার মোহান্তদের হাতে এসেছে।

একটার পর আর একটা স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়াচ্ছিল, আবার ছাড়ছিল। আমাদের সময় যে কী ভাবে কেটে গেল বুঝতে পারি নি। লোকনাথ স্টেশন ছাড়তেই যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠল। পরের স্টেশনই তারকেশ্বর।

আমরা যখন তারকেশ্বরে নামলুম, সকালের রোদ তখন বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে। স্টেশন থেকে বাজার প্রায় আধ মাইল দূরে, বাজারের মধ্য দিয়ে মন্দিরের পথ। স্বাতি বলল: এই পথটুকু হেঁটেই যাওয়া যাক।

বললুম: কিছু না খেয়ে এসেছ, হাঁটাতে কষ্ট হবে না তো?

স্বাতি বলল: কষ্ট না করলে কি—

হেসে বললুম: তারকেশ্বর কেষ্ট নন, ইনি শিব, অল্পেই সন্তুষ্ট হন ইনি।

তাহলে তোমার ওপরেও হবেন।

বলে স্বাতি আরও অনেকের মতো হেঁটেই অগ্রসর হল।

এক সময়ে স্বাতি বলল: কারও সঙ্গে ভাব করবে কি?

হেসে বললুম: তার দরকার নেই। জায়গাটার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আছে, আর অলৌকিক গল্পও শোনা আছে কিছু।

তবে মুখ বুঁজে না চলে কথা বলতে বলতেই চল না!

বললুম: এখানে এসে যদি থাকতে চাও তো দুটো ধর্মশালা আছে মারোয়াড়ীদের, আর কিছু যাত্রীনিবাসও আছে। বছরে বড় মেলা হয় তিনটি—শ্রাবণ মাসে মারোয়াড়ী মেলা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি, আর গাজনের মেলা চৈত্র মাসে।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : অলৌকিক গল্প বল।

বললুম : প্রথম অলৌকিক গল্প হল তারকেশ্বরের প্রথম সেবায়েতের। নাম তাঁর চতুর্ভুজ গাঙ্গুলী। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ।

তবে সেবায়েৎ হলেন কেমন করে ?

সেই ঘটনাই অলৌকিক। রাজা ভারামল্ল স্বপ্নে এই ব্রাহ্মণের সন্ধান পেয়েছিলেন। আর এই ব্রাহ্মণও এই আদেশ পেয়ে ভেবেছিলেন, জন্মান্ধ হয়ে এই দায়িত্ব কী করে বহন করবেন। তারপরে তিনিও স্বপ্ন দেখলেন রাতে। মন্দিরের পশ্চিমে দুধপুকুরে স্নান করলেই দৃষ্টি ফিরে পাবেন। পেলেনও তাই। এমনি অনেক গল্প আছে—বোবার বোলের গল্প, পাটকাঠির বাঁকে সুতোয় কলসী ঝুলিয়ে গঙ্গাজল আনার গল্প, মুসলমানের হাত থেকে দুধ খাওয়ার গল্প—

বাজারে লোকজনের ভিড় দেখেই আমি থেমে গেলুম। তারপরে নিঃশব্দে এগিয়ে পৌঁছে গেলুম মন্দিরে।

স্বাতি বলল : এস, মাথায় একটু দুধপুকুরের জল ছিটিয়ে নিই।

বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে মাথায় জল ছিটিয়ে এল। আমার মাথাতেও ছিটিয়ে দিল খানিকটা জল। বলল : এই ভিড়ের ভেতর মন্দিরে ঢোকবার চেষ্টা করো না। তোমার ভাঙা হাড়ে লেগে যেতে পারে।

হেসে বললুম : ভাল থাকলেও ভেতরে ঢুকতুম না।

কেন ?

তুমি পুজো সেরে এসো, পরে বলব।

তুমি কোথায় থাকবে ?

জায়গার কি অভাব আছে! মোহান্তজীর গদির পাশে নাটমন্দিরেই আমাকে দেখতে পাবে।

বলে তাকে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে দিলুম।

পুরুষ ও মেয়েদের আলাদা লাইন। মেয়েদের লাইনে স্বাতিকে

দাঁড়াতে হল। বেশ কিছুক্ষণ যে সময় লাগবে তাতে সন্দেহ নেই। এই অবকাশে আমি মুকুন্দ ঘোষের সমাধি দেখলুম, আর কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির—পূর্বে কালীমায়ের মন্দির, উত্তরে দামোদর ঠাকুরের মন্দির, দক্ষিণ-পশ্চিমে মোহান্তের প্রাসাদের পাশে, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির। নাটমন্দির দক্ষিণ দিকে নহবৎখানার কাছে। স্বাতির জন্যে এইখানেই আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম।

অনেক দিন আগের একটি ঘটনা আমার মনে পড়ল। একটা ছুটির দিনে আমি তারকেশ্বরে এসেছিলুম। সেদিন সোমবার ছিল কিনা মনে নেই। কিন্তু যাত্রীর বেশ ভিড় ছিল। একজনকে দণ্ড কেটে মন্দির পরিক্রমা করতেও দেখেছিলুম। সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়তে হয় মাটিতে, সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে। তারপরে মাটিতে একটা দাগ দিয়ে সেই দাগে পা রেখে আবার শুয়ে পড়তে হয়। ভিড়ের মধ্যেও যাত্রীরা তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল। রোগ-মুক্তির জন্যে অনেকে ধর্ণা দিতেও আসে। বাবার স্বপ্নাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত অনাহারে অর্ধাহারে শুধু চরণামৃত খেয়েও পড়ে থাকে অনির্দিষ্টকাল।

কিন্তু এ সব কথা নয়, আমার মনে পড়ল অন্য কথা। অনেক চেষ্টার পরে যখন মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে পারলুম, তখন আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না, আর ভিড়ের ধাক্কাধাক্কিতে বেসামাল হয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ মনে হল, পায়ে কী একটা ঠেকল। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন চেঁচিয়ে উঠল, করছেন কি, বাবার মাথার ওপরে উঠে দাঁড়াবেন নাকি?

এক ধাক্কায় ভিড় সরিয়ে দিয়ে আমি বাহিরে বেরিয়ে এলুম। মনস্তাপে মন আমার ভরে গেল। এ কী করলুম আমি! মনে নেই, কার কাছে এই অপরাধ আমি স্বীকার করেছিলুম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, ভয় নেই, বাবার মাথা একটা ধাতুর টোপরে ঢাকা থাকে। এই সান্ত্বনা নিয়েই আমি ফিরে এসেছিলুম।

শুনেছি এই মন্দিরের মধ্যে একটি বাসুদেবের মূর্তি আছে। আর পটে আঁকা দুর্গা অন্নপূর্ণা ও কালিকা। সেই সঙ্গেই একটি পৌরাণিক কথা আমার মনে পড়ল। কৈলাসে এসে নারদ শিব ও পার্বতীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভারতে এত পাপীতাপী, এক কাশীতে কজন মুক্তি পাবে? শিব বললেন, সেই জন্যেই তো আমি ভারতের নানা স্থানে অনাদি লিঙ্গ হয়ে আছি। তারকেশ্বরেও আমি মানুষকে কৃপা করব।

ইনিই আশুতোষ শিব। এমন বিরাট হৃদয় বুঝি আর কোন দেবতার নেই। অচিন্ত্যবাবুর লেখা আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। শিবের স্তোত্র পাঠ করছেন পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ। 'শিব ভাবে বিভোর হয়ে আছেন তিনি। উদাসীন আর উপশান্ত, আত্মবিভূতিতে বৈভবময়। পড়তে পড়তে সেই শ্লোকে এসেছেন যেখানে বলেছে—শিবমহিমার আর পারাপার নেই। হিমালয় যদি হয় কালির বড়ি, সমুদ্র হয় দোয়াত, কল্পতরুশাখা কলম, সমস্ত পৃথিবী কাগজ আর স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা, তবুও সেই কালির দোয়াতে সেই কলম ডুবিয়ে সেই বিস্তীর্ণ কাগজে অনন্তকাল ধরে লিখে লিখেও শিব-মহিমার কথা সে লেখিকা শেষ করতে পারবেন না। পড়তে পড়তে বিহ্বল হয়ে পড়লেন রামকৃষ্ণ, চেঁচিয়ে উঠলেন আকুল হয়ে—মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা কেমন করে বলবো! শুধু নীরবে অশ্রু বিসর্জন নয়, একেবারে আকুল রোল তুললেন রামকৃষ্ণ। মুক্তকণ্ঠের কান্না। আন্তরিকতার আর্তনাদ।'

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। মনে হচ্ছিল যে মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ নেই শিব, তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। হৃদয় দিয়ে তাঁকে আমরা অনুভব করতে পারব।



সময়ের হিসাব আমার ছিল না। স্বাতির কথাতেই আমি চেতনার জগতে ফিরে এলুম। স্বাতি বলল: এমনি করে বসেই থাকবে নাকি?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম: চল।

তারপরেই মনে পড়ল যে সে এখনও জলস্পর্শ করে নি। কিন্তু মুখে কোন ক্লান্তির চিহ্ন নেই, প্রসন্নতায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাকে। তাই বললুম: বেশ ক্ষিধে পেয়ে গেছে।

স্বাতি আমার ছল বুঝতে পেরে বলল: চল, খাইয়ে দিচ্ছি।

তারপরে বেছে বেছে এমন একটি জায়গায় এসে ঢুকল যেখানে সাধারণ যাত্রীদের কোন ভিড় নেই। মণ্ডা-মিঠাইএর দোকানে সে আসে নি, আসে নি পুরী-তরকারীর দোকানে। বেলার দিকে চেয়ে মনে হল যে এখন দুপুরের আহারের সময় হতে আর দেরি নেই। তবু স্বাতি একটা আলু-কাব্লির দোকানে আমাকে টেনে আনল। তারপরে স্থির হয়ে বসে বলল: কী মনে পড়ছে বল তো?

বললুম: শক্ত কথা। তোমার যা মনে পড়ছে—

তোমারও তাই মনে পড়া উচিত।

সব সময় কি তা হয়! মন যে দুটো!

একাত্মও হয়।

তারপরেই বলল: আমি যখন মন্দিরের ভেতর শিবকে দেখছি, তুমিও কি মনে মনে তাঁকে দেখ নি!

আমার অত পুণ্য নেই।

কিন্তু সংকল্প আছে, মনের মধ্যে তুমি অনেক বেশি দেখতে পাও।

ঠিক এই সময়ে আমার রামেশ্বরের কথা মনে পড়ে গেল। বাজারের মধ্য দিয়ে রামঝরোকার দিকে যেতে যেতে স্বাতি এমনি একটি দোকানে এসে বসেছিল। বলেছিল, গরম বড়া ভাজছে বেশ। এই পুরনো কথা তাকে বলতে গিয়ে দেখলুম যে সে তখন খাবারের অর্ডার দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই একটু অপেক্ষা করে বললুম : এ সবের প্রতি তোমার একটা দুর্বলতা যে আছে, তা প্রথম থেকেই জেনেছিলুম।

তাই নাকি!

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম : রামেশ্বরেও তুমি এমনি একটা দোকানে বসে জিজ্ঞেস করেছিলে, এরা আলুকাবলি ঘুগনি ফুচকা এ সব খায় কি না.

খুশী হয়ে স্বাতি বলল : দেখলে তো, ঠিক মনে পড়ে গেল।

আমি বললুম : তার পরের কথাও মনে আছে নিশ্চয়ই!

তুমি বলেছিলে, আমার মতো পার্টনার পেলে এই সবের একটা দোকান খুলতে সেখানে।

আর তুমি আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে জবাব দিয়েছিলে, রাস্তার মতো আস্বাদ ঘরে কিছুতেই হয় না।

স্বাতি বলল : কথাটা ঠিক নয়?

খুব ঠিক।

কিন্তু এ কত দিন আগের কথা বল তো?

খুব পুরনো বলে মনে হচ্ছে না কি?

স্বাতি উত্তর দিল না। কিন্তু আমি হিসাব করে দেখলুম, বেশি দিন নয়, আজ থেকে মাত্র দু বছর দু মাস আগে এই ঘটনা ঘটেছিল তাদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কিছু পরে। অথচ মনে হচ্ছে যে এ বোধহয় অনেক দিনের পুরনো কথা—দুটো বছর নয়। গত হয়েছে দুটো যুগ।

ফেরার পথে স্বাতি বলল : আজ তোমার বেশ কষ্ট হবে।

কেন ?

খেতে খুব দেরি হয়ে যাবে।

তারপরেই বলল : সুবলদাকে কথা দিয়ে এসেছি, যেখানে সেখানে আজ খাব না। বাড়িতে ফিরেই আমাদের খেতে হবে।

রাঁধবে কে ?

ঠাকুর যোগাড় হয়েছে। মানে, রান্না জানা চাকর। আজ থেকে কাজে আসবে।

যদি না আসে ?

সুবলদা তাহলে নিজেই রেঁধে রাখবেন।

তারপরে তোমাদের বামুনঠাকুর এলে কি তাকে তাড়িয়ে দেবে ?

সকৌতুকে স্বাতি বলল : তোমার ফ্ল্যাটে কাজে লাগিয়ে দেব।

আমি আশ্চর্য হলুম তার কথা শুনে। বুঝতে পারলুম যে আমার ভবিষ্যৎ জীবন সে একটা শক্ত খুঁটিতে বেঁধে দিচ্ছে। এমন ভাবে বাঁধছে যে বন্দী হবার বেদনা জাগছে না মনে, তার বদলে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যাচ্ছে। আমি কোন কথা বলতে পারলুম না।

স্টেশনে ফিরে হাওড়ার টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসলুম।

এবারেও নানা কথা হল ট্রেনে। বেশির ভাগ কথাই বাঙলায় বেড়াবার কথা। তার প্রশ্ন শুনে আমি বুঝতে পারলুম যে স্বাতি এবারে বাঙলার কথা ভাবছে—বাঙলার ছোটোখাট দর্শনীয় স্থানের কথা। ঘরের কাছে এমন অনেক জায়গা আছে, যা আমরা আজও দেখি নি, দেখবার জন্যে কোন আগ্রহও জাগে নি এতকাল। অথচ এ সব জায়গা বাঙলার বাহিরে হলে হয়তো এত দিনে দেখে আসতুম। দূরে গেলে আমরা ভাবি যে হয়তো সেদিকে আর

যাওয়া হবে না। তাই দেখবার কিছু থাকলে দেখা শেষ করেই ফিরি। কিন্তু ঘরে ফিরে সে মনোভাব আর থাকে না। টালিগঞ্জের পঞ্চাননতলায় যে নবরত্ন মন্দির আছে ঠিক দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের মতো, আজও আমাদের তা দেখা হয় নি। কলকাতায় টিপু সুলতানের মসজিদ দেখি নি, কিন্তু মহিস্থুরের শ্রীরঙ্গপত্তনে গিয়ে টিপু সুলতানের দুর্গ সামার-প্যালেস গুম্বজ দেখে এসেছি প্রচুর আগ্রহ নিয়ে।

এক সময় স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: ঘরের কাছে দেখবার জায়গা কত আছে বলতে পার?

বললুম: অনেক।

স্বাতি বলল: আমি সংখ্যা শুনতে চাইছি না, নাম জানতে চাইছি।

বললুম: নাম আমি অনেক জানি, কিন্তু সে সব জায়গার সঙ্গে পরিচয় নেই।

কেন?

দেখব দেখব করেও দেখা হয়ে ওঠে নি।

স্বাতি তবু আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে বললুম: এই তো কদিন আগে আমরা গৌড়-পাণ্ডুয়া দেখে এলুম, কিন্তু ঘরের কাছে হুগলি জেলায় যে আর এক পাণ্ডুয়া আছে তা তো দেখি নি। সেও ঐতিহাসিক স্থান—গৌড়-পাণ্ডুয়ার মতোই প্রাচীন, আবার দর্শনীয় জায়গা হিসেবেও কিছু কম আকর্ষণীয় নয়।

তারপরে এই জায়গার কথা যতটুকু জানি তা বললুম। কলকাতা থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের কাছে এই জায়গা। কিন্তু রেলের কোন স্টেশন নেই। বোধহয় বঁইচি স্টেশনে নেমে হেঁটে বা বাসে যেতে হয়। তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল থেকে ধনেখালির উপর দিয়ে বঁইচি পর্যন্ত রাস্তা আছে। এই রাস্তা পাণ্ডুয়ার উপর দিয়ে গিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে মিলেছে।

গ্রামের নাম পেঁড়ো বসন্তপুর। রাজা পাণ্ডুদাসের নামে নাকি পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া হয়েছিল। এঁরা নাকি বুদ্ধদেবের পিতৃব্য অমৃতদাসের পুত্র পাণ্ডুশাক্য রাজার বংশধর। পাঠানরা এ দেশে এসে এই সব জায়গা দখল করে, শাহ সুফির শাসনে আসে পাণ্ডুয়া।

এখন যে সব দেখবার জিনিস আছে, তার মধ্যে প্রধান হল একটি সোয়া শো ফুট উঁচু বিজয়স্তম্ভ। লোকে বলে এটি নাকি পাঁচ-তলা উঁচু একটি মন্দিরের চূড়া ছিল। পাণ্ডু রাজার দরবার ও বাইশ দরজার ধ্বংসাবশেষও দেখবার মতো। বাইশ দরজার মধ্যে একটি কালো পাথরের বেদী আছে। তাই দেখে লোকে এটিকেও দেবতার মন্দির মনে করে। কিন্তু পাঠানরা এটিকে মসজিদে পরিণত করেছিল।

আমি এ সব জায়গার ছবি দেখেছি। এর স্থাপত্য এমন যে বলে না দিলে বোঝা যায় না এ হুগলির পাণ্ডুয়া না মালদহের। সমসাময়িক কালের স্থাপত্য বলেই এই রকম মনে হয়।

তারপরে পীঠস্থানের কথা উঠে পড়ল। স্বাতি বলল: কালীঘাট ছাড়া আর কোনও পীঠস্থান বোধহয় এদিকে নেই।

বললুম: পীঠস্থানের কথায় আমি ফাঁপরে পড়ে যাই।

কেন?

পঞ্জিকায় এই সব পীঠস্থানের নাম আছে। কিন্তু এ নিয়ে একবার বিশ্বকোষ ঘেঁটে বিপদে পড়েছিলুম।

স্বাতি এবারে কোন প্রশ্ন না করে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: তন্ত্রচূড়ামণিতে একান্নটি পীঠের নাম পাওয়া যায়, আর দেবীভাগবতে পাওয়া যায় এক শো আট পীঠের নাম। তারপরে কুব্জিকাতন্ত্র আরও কিছু নাম যোগ করেছে।

স্বাতি বলল: সত্যিই বিপদের কথা।

বললুম: এখানে শেষ হলেও একটা কথা ছিল। শিবচরিত

নামে একটি বইএ নানা মত ঘেঁটে একান্নটি পীঠের নাম ও ছাব্বিশটি উপপীঠের নাম সংকলন করা হয়েছে।

স্বাতি হাসল আমার কথা শুনে।

বললুম : এর পরে আছে কিংবদন্তী—স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। তাকেও উপেক্ষা করা যায় না। তাই পশ্চিমবঙ্গে পীঠস্থানের শেষ নেই।

মনে পড়ে গেল যে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের পীঠস্থানের আলোচনা আগেই করেছি। তাই শুধু এই অঞ্চলের কথাই বললুম।

দুবরাজপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে বক্রেশ্বর একটি মহাপীঠ। শিবচরিতের মতে সতীর ডান বাহু পড়েছিল এইখানে। দেবী বক্রেশ্বরী ও ভৈরব বক্রেশ্বর। কিন্তু অন্যত্র দেখেছি যে সতীর ভ্রূমধ্য পড়েছিল এইখানে। দেবী মহিষমর্দিনী ও ভৈরব বক্রনাথ। আবার বক্রনাথও একটি পীঠস্থান। যে অঙ্গ পড়েছিল তা মল। দেবী পাপহরা ও ভৈরব বক্রনাথ। এরই কাছে আর একটি পীঠস্থান আছে বলে স্থানীয় লোকে দাবী করে। সতীর দন্ত পড়েছিল বলে দেবী দন্তেশ্বরী, আর ভৈরব যাগেশ্বর। শিবচরিতের মতে উর্ধ্ব ও অধো দন্ত অন্যত্র পড়েছিল।

বক্রেশ্বর তুমি দেখেছ ?

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

আমি সত্যি কথাই বললুম : শুধু বক্রেশ্বর কেন, এ অঞ্চলের কোন তীর্থস্থানই আমি দেখি নি। তবে এ সব জায়গার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আছে।

স্বাতি বলল : তাহলেই হবে।

বললুম : জায়গাটি সুন্দর বলে শুনেছি। সাতটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে শ্বেত সরোবর নামে একটি গরম জলের কুণ্ডে স্নান করে যাত্রীরা বক্রনাথ দর্শন করে। শ্মশানের উপরে নাকি এই পীঠস্থান।

তারপরে বললুম : পৌরাণিক কাহিনী শোনবার লোভ থাকলে বক্রেশ্বরে তোমাকে যেতে হবে।

কেন ?

প্রত্যেকটি কুণ্ডের নাম ও কিংবদন্তী আছে। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলে নাকি বোঝা যায় যে জলের গুণ ঐ সব গল্প দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। যেমন হিরণ্যকশিপুকে বধ করে নৃসিংহদেবের নখে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়—ব্রাহ্মণ বধের জ্বালা। অষ্টাবক্র মুনি স্বেচ্ছায় এই জ্বালা নিজে টেনে নিলেন। তারপরে নৃসিংহদেবের কথায় একটি কুণ্ডে নামলেন। সর্বতীর্থের জলে তাঁর জ্বালা দূর হয়ে গেল।

স্বাতি বলল : গন্ধকের জলে চর্মরোগ সারে বলে শুনেছি।

তারপরে আমি উজানির কথা বললুম। উজানিতে সতীর বাম কনুই পড়েছিল, দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী ও ভৈরব কপিলাম্বর। বহুলার নাম এখন কেতুগ্রাম। সেখানে দেবীর বাম বাহু পড়েছিল, দেবী বহুলা ও ভৈরব ভীরুক। এই সব পীঠস্থানের নামে এও একটা বিপদ। কোন্ পীঠ কোথায়, তার বর্তমান নাম কী, তার হদিস পাওয়া যায় না।

স্বাতি বলল : নলহাটীও একটা পীঠস্থান বলে শুনেছি।

কিন্তু মহাপীঠ না উপপীঠ তা নিয়ে একটা বিবাদ আছে।

কী রকম ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

শিবচরিতের মতে নলহাটী একটি উপপীঠ। সতীর শিরানলি এখানে পড়েছিল। দেবী শেফালিকা আর ভৈরব যোগীশ। এই উপপীঠের তালিকায় নলস্থান নামে একটি জায়গাও আছে। সেখানে সতীর ডান গণ্ডাংশ পড়েছিল। দেবীর নাম ভ্রমরী ও বিরূপাক্ষ ভৈরব। কিন্তু তন্ত্রচূড়ামণির মতে নলহাটী একান্ন পীঠের অন্যতম। সতীর নলা পড়েছিল এইখানে। দেবীর নাম কালিকা ও ভৈরব

যোগেশ। কিন্তু সাধারণের কাছে এটি ললাট পীঠ নামে পরিচিত, দেবী ললাটেশ্বরী ও ভৈরব যোগীশ।

স্বাতি হেসে বলল: এ সব মনে রাখাও শক্ত কথা।

আমিও হেসে উত্তর দিলুম: আরও আছে। ভদ্রেশ্বরে দেবী ভদ্রা বা ভদ্রকালী, রূঢ়ে মঙ্গলচণ্ডিকা, আর কিরীট কোণায় দেবী বিমলা ও ভৈরব সম্বর্ত। শাস্ত্রবাক্য ছাড়াও স্থানীয় লোকের বিশ্বাসে আরও অনেক পীঠস্থান আছে। কাটোয়ার কাছে ক্ষীর-গ্রামে নাকি সতীর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ পড়েছিল। দেবী যোগাদ্যা ও ভৈরব ক্ষীর খণ্ডক। তেমনি লাভপুরে পড়েছিল অধঃ ওষ্ঠ। দেবী ফুল্লরা ও বিল্লেশ ভৈরব। কোপাইয়ে কঙ্কাল পড়েছে। দেবী বেদগর্ভা, আর ভৈরব রুরু। নন্দীপুরে দেবী নন্দিনী, ভৈরব নন্দীকেশ্বর। সতীর হাড় পড়েছিল সেখানে। তারাপুর চক্ষুপীঠ নামে পরিচিত। শাস্ত্রে এই স্থানের নাম তারা, দেবী তারিণী ও ভৈরব উন্মত্ত। সাধক বামাক্ষেপার নামে তারাপীঠ এখন বিখ্যাত হয়েছে।

স্বাতি বলল: বাঁশবেড়ের নাম করলে না?

বললুম: বংশবাটি কোন পীঠস্থান নয়, কিন্তু হংসেশ্বরীর তেরটি চূড়াবিশিষ্ট ছ তলা মন্দির দেখবার মতো। শবরূপী শিবের উপরে উপবিষ্ট দেবী নীলবর্ণ। বাসুদেবের প্রাচীন মন্দিরে পোড়ামাটির কাজ নাকি অপরূপ সুন্দর।

তুমি দেখো নি?

না। ঘরের খুব কাছে বলেই দেখা হয় নি।

তারপরেই বললুম: ঘরের কাছে এমনি তীর্থস্থান আরও আছে। তার একটি হল বরাকরের কাছে কল্যাণেশ্বরী। চার পাঁচ শো বছর আগে রাজা কল্যাণ সিংহ এই মন্দির নির্মাণ করেন। শোনা যায় যে এক ব্রাহ্মণ নাকি পাশের জলাশয়ে অলঙ্কার পরা দুটি হাত দেখে রাজাকে খবর দিয়েছিলেন, আর রাজা স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবীকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

তারকেশ্বর থেকে কখন ট্রেন ছেড়েছে, আর কতদূর আমরা এসেছি, সেদিকে আমাদের খেয়াল ছিল না। আমরা নিশ্চিন্ত মনেই গল্প করছিলুম। তীর্থস্থানের নাম শেষ হতেই আমি আরও কয়েকটি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক স্থানের নাম বললুম।

একচক্রাপুর নামে একটি জায়গায় নাকি ভীম হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করে হিড়িম্বাকে বিবাহ করেছিলেন। আর মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্ম হয়েছে এইখানে। বশিষ্ঠ মুনিও তপস্যা করেছিলেন বামা-ক্ষেপার তারাপীঠে। কেন্দুবিল্বে কবি জয়দেবের জন্ম। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন রাধা-মাধব। মকর-সংক্রান্তিতে কেঁদুলির মেলায় আজও অসংখ্য লোক গীতগোবিন্দের কবির নামে মহোৎসব পালন করে।

তারপর ?

তারপর নান্নুর শান্তিনিকেতন থেকে বারো মাইল দূরে।

সে আবার কী ?

হেসে বললুম: কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। ভেবো না যে বিদ্যাপতি মিথিলার লোক ছিলেন বলে চণ্ডীদাসও সেই দেশে জন্মেছিলেন। বৃহৎ বঙ্গে সেদিন নবদ্বীপ ও মিথিলায় কোন প্রভেদ হয়তো ছিল না।

স্বাতি বলল: এক দিনে এত জায়গার নাম বললে যে সব গুলিয়ে যাবে। আর কোন্ জায়গা কোথায়, সে সম্বন্ধেও কোন ধারণা হল না।

বললুম: নিজের চোখে না দেখলেও মোটামুটি একটা ধারণা আছে।

তারপরে সেই ধারণার কথা সংক্ষেপে বললুম: বোলপুরে একটি টুরিস্ট সেণ্টার থাকলে বাঙালীর বাঙলা দেখার সুযোগ হত।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: টুরিস্ট বাসে তো এখন অনেক জায়গা দেখানো হচ্ছে!

কলকাতায় বাসে চাপিয়ে কী দেখানো হচ্ছে তা শুনলে আশ্চর্য হবে।

কেন ?

রাজগীর-নালন্দা-গয়া, রাঁচী-নেতার হাট-হাজারীবাগ, হরিণঘাটা-কল্যাণী, ডায়মণ্ড হারবার-কাকদ্বীপ আর শান্তিনিকেতন-দুর্গাপুর-মসেঞ্জোর-বক্রেশ্বর। সম্প্রতি দীঘাও দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। আর কিছু হয়েছে কিনা জানা নেই।

স্বাতি বলল ঃ কাকদ্বীপের গল্প জানি। যাত্রী না হলে বাস ছাড়ে না।

অন্যদিকেও বোধহয় এই রকম। সেই জন্যেই বলছিলুম যে বাঙলা দেখাতে হলে বোলপুরে একটি টুরিস্ট সেণ্টার চাই। বোলপুর মানেই শান্তিনিকেতন। যাত্রীরা দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে এখানে আসবে, তারপরে সিউড়ি থেকে তের মাইল দূরে বক্রেশ্বর দেখবে, বিহার সীমান্ত পেরিয়ে মসেঞ্জোর ড্যাম দেখে আসবে, একটুখানি উত্তরে এগিয়ে তারাপীঠ, নলহাটী, আহমদপুরের পাশে লাভপুর। কাটোয়ার কাছে ক্ষীর গ্রাম, উজানী, কেতুগ্রাম। কেঁদুলি, কোপাই, নান্নুর, নন্দীপুর, একচক্রাপুর—সবই কাছাকাছি।

তারপরে বললুম ঃ উত্তরে নলহাটী গেলে বড়নগরও দেখে আসতে হয়। রাণী ভবানীর বড়নগর আজিমগঞ্জ স্টেশনের কাছে। গঙ্গার এপারে আজিমগঞ্জ, ওপারে জিয়াগঞ্জ। যারা মুর্শিদাবাদ দেখতে যায়, তারা ট্রেনে আর একটু এগিয়ে জিয়াগঞ্জে নৌকোয় চেপে বড়নগর দেখতে আসে।

কী দেখবার আছে ?

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম ঃ যা দেখবার জন্যে আমরা বিষ্ণুপুরে ছুটে যাই, কতকটা তাই। মানে পোড়ামাটির কাজ করা মন্দির যে কত সুন্দর হতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে তার কোন ধারণা হয় না। কিন্তু খুব অযত্নে পড়ে আছে এই সব মন্দির।

রাণী ভবানী তাঁর জীবনের শেষ তিরিশ বছর নিজের বিধবা কন্যা তারাসুন্দরীকে নিয়ে এইখানে বাস করেছিলেন। তাঁর সংকল্প ছিল বাঙলায় বারাণসী নির্মাণের। গড়েও ছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভবানীশ্বর শিবের। রাজরাজশ্বেরী, মদনগোপাল, কালিকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর চার বাঙলা মন্দির। স্টেশন থেকে দেড় মাইল পথ রিক্সায় বা গঙ্গার ধার দিয়ে পায়ে হেঁটে পৌঁছনো যায়। প্রথমেই চার বাঙলা মন্দির, তারপর ভবানীশ্বর, মদনগোপাল, রাজরাজেশ্বরী ও কালিকা। রিক্সায় চেপে এগিয়ে গিয়ে সাগরদীঘি, পথে প্রাসাদোপম বাড়ি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। আর দুঃখ হয় এই ভেবে যে এ সব দেখেছে এমন বাঙালী বাঙলায় কম আছে। আর এ সব যে দেখবার জিনিস এ কথার প্রচারও নেই।

ওপারে মুর্শিদাবাদেরও এই অবস্থা। কত দেখবার জিনিস, অথচ দেখাবার ব্যবস্থা নেই। এপারে আজিমগঞ্জে কিংবা ওপারে মুর্শিদাবাদে যদি একটা টুরিস্ট সেণ্টার থাকত, তাহলে যাত্রীরা গঙ্গা পারাপার করে ছুটো জায়গাই দেখতে পেত অনেক আনন্দে ও আরামে।

স্বাতি কতকটা বিমর্ষ ভাবে বলল: কেন এ ব্যবস্থা হয় না বলতে পার?

বললুম: সরকার বলবেন, বাঙালী এ সব দেখতে চায় না।

নিশ্চয়ই না। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে তো আমরা দেখলাম যে সর্বত্র বাঙালী যাত্রীই বেশি। শুধু একটু থাকবার জায়গা, আর যান-বাহন—এই ব্যবস্থা করা কি খুব কঠিন?

খুব সোজা। কিন্তু জনসাধারণকেও দোষ দিতে হয়।

কেন?

দেখানোরও কাছ থেকে কোন দাবীর কথা শোনা যায় না। থাকলে

অন্যান্য রাজ্যের মতো প্রাইভেট টুরিস্ট বাস চালু হত, আর টুরিস্ট হোটেল। সামান্য ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সন্তোষজনক হত।

কিন্তু স্বাতি আমার কথা মানল না। বলল: সরকারের টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্ট যত দিন থাকবে, তত দিন আমরা তাদের কাছ থেকেই এ সব আশা করব।

২৩

বেলার কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলুম, ক্ষুধার কথাও। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার পরে বুঝতে পারলুম যে আমাদের যাত্রা শেষ হয়েছে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম।

সুবলবাবু রাস্তায় পায়চারি করছিলেন। ব্যস্ত ভাবে কাছে এসে বললেন: খুব ক্ষিধে পেয়েছে তো?

স্বাতি হেসে বলল: না সুবলদা, ক্ষিধের কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম।

না না, এত বেলা হল, নিশ্চয়ই খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

তারপর আমাদের সঙ্গে ভিতরে আসতে আসতে বললেন: এখনকার লোক সব এক রকম। হাওড়া স্টেশন থেকে ফিরে এসে ড্রাইভার বলল, আমাকে অপেক্ষা করতে বলে নি। তা বলবার দরকার কি বাপু! তুমি নিজেই বল না যে আমি এই-খানেই অপেক্ষা করব।

স্বাতি বলল: ওর কিছু দোষ নেই সুবলদা। কতক্ষণে ফিরতে পারব, তার তো ঠিক নেই। তাই আমি অপেক্ষা করতে বলি নি।

সুবলবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন: এইজন্যেই লোকগুলো আস্কারা পেয়ে আরও খারাপ হচ্ছে। মুখ হাত তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিন, টেবিলে আমি খাবার দিতে বলছি।

স্বাতি খুশী হয়ে বলল: লোক পাওয়া গেছে বুঝি?

গর্বিত ভাবে সুবলবাবু বললেন: ওদের সব আড্ডা আমার চেনা। এক আড্ডায় না পেলে আর এক আড্ডা থেকে ধরে আনব। পাকা চাকরির জন্যে লোক পাওয়া যাবে না, এ একটা কথা হল নাকি!

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে একটুখানি হাসল।

বিকেলের দিকে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লুম। সুবলবাবু যে ফ্ল্যাটটি পছন্দ করেছেন সেটি আমাদের দেখতে হবে। ভাড়া বেশ বেশি, তাই নানা রকম দুর্ভাবনা হচ্ছে আমার। স্বাতির হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে আমার ভবিষ্যৎ সে নির্ধারিত করে ফেলেছে। বর্তমান চাকরিটা ছেড়ে কলেজে কাজ করতে হবে। তার জন্যে চিঠিপত্র লিখিয়ে নিয়েছে দুপুরে। বাড়ি পছন্দ হলে উত্তরপাড়ার ঘর ছেড়ে দিয়ে এই ফ্ল্যাটে উঠে আসতে হবে। শান্তির জীবন হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সচ্ছলতা আসবে না।

স্বাতি আমার পাশেই বসে ছিল গম্ভীর ভাবে। হঠাৎ হেসে বলে উঠল: খুব দুর্ভাবনায় পড়েছ বলে মনে হচ্ছে, তাই না?

তার পরিহাস আমি নিঃশব্দে মেনে নিলুম।

স্বাতি বলল: ভয় নেই, আমি পপি নই।

তা জানি।

তবে এমন ভয় পাচ্ছ কেন?

বললুম: অনিশ্চিতের ভাবনা।

স্বাতি আশ্চর্য হবার ভাণ করে বলল: নিজের জন্যে আগে তো এত ভাবতে না!

এখন একজন সঙ্গী আছে যে!

স্বাতি সহসা গম্ভীর হয়ে বলল: তবে তো খুবই ভাবনার কথা।

তারপরেই হেসে বলল: সঙ্গীর ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। সেও একটা কাজ পেয়েছে, তার ভাবনা সে নিজেই ভাবতে পারবে।

সত্যি!

মিথ্যে বলার তো দরকার নেই।

তবে কি—

কথাটা শেষ করতে পারলুম না। তার আগেই আমরা একটা মস্ত বাড়ির সামনে পৌঁছে গেলুম। হালফ্যাসানের এই বাড়িটি অভিজাত এলাকায়। নিচের তলায় গাড়ি রাখবার খোলা জায়গা, লিফ্‌ট্‌ আছে উপরে উঠবার জন্যে। এক টুকরো লনও আছে, আর কিছু ফুলের গাছপালা। বাইরেটা দেখেই স্বাতি বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

খোঁজখবর নিয়ে ভিতরটাও আমরা দেখলুম। দু ঘরের ফ্ল্যাট, বাথরুম রান্নাঘর, আর একটুখানি খাবার জায়গা। স্বাতির ভাল লাগল শোবার ঘরের দেওয়ালের গায়ে ওয়ার্ডরোব ও আলমারি, আর বসবার ঘরে দেওয়ালে গাঁথা বই রাখার ব্যবস্থা দেখে। রান্নাঘরে ভাঁড়ার রাখার র‍্যাক ও খাবার জায়গায় দেওয়ালে গাঁথা সাইডবোর্ড। প্রয়োজনীয় আসবাব কেনবার দরকার নেই, আর সেই সব আসবাবে ঘরও ভরে যাবে না। বেশ খুশি খুশি ভাবে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : পছন্দ হয়েছে তো ?

বললুম : ভাড়া কম হলে পছন্দ হত।

স্বাতি বলল : তোমার সঙ্গতি আমি জানি। তোমাকে ভিক্ষে করে খেতে হবে না।

আমার আপত্তি যে খাটবে না, আমি তা বুঝতে পেরেছিলুম। তাই আর কথা বললুম না।

স্বাতি নিচে এসে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে নিজের ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখল। তারপরে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল : একটা কথা বলব ?

হেসে বললুম : কথা বলবার জন্যে কি অনুমতি নিতে হবে ?

স্বাতি বলল : রাগ করবে না বল ?

না।

মান যাবে না বল ?

অসম্মানের কথা বললে নিশ্চয়ই যাবে।

গাড়িতে উঠে স্বাতি বলল: বেশ। তাহলে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। আমার কাছ থেকে উপহার নিতে তোমার আপত্তি আছে?

আছে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: আছে!

গম্ভীর ভাবে বললুম: কুমারী মেয়ের কাছে নেওয়া-দেওয়ার ব্যাপারে শাস্ত্রে বারণ আছে।

কেন?

একবার শুরু হলে তার শেষ থাকে না।

না থাকলই বা।

মেয়ের বাপ-মায়ে যদি আদালতে টেনে নিয়ে যায়! না বাবা, ও সবে আমি রাজী নই।

স্বাতি বলল: তবে ঠিক আছে। তোমার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করছি।

কী ব্যবস্থা?

ভাড়া।

বাড়ি তো ভাড়া হয়েই গেল!

স্বাতি রেগে গিয়ে বলল: বাড়িতে কি কম্বল বিছিয়ে শোবে?

আমি খুব গর্বের ভাণ করে বললুম: আমার উতোরপাড়ার ঘরে একটা কাঁঠাল কাঠের তক্তাপোশ আছে।

তবে আর কি, একটা ট্রাক ভাড়া করে ঐটেই নিয়ে এস।

বলে একটা দোকানে আমাকে নিয়ে এল। বলল: দরকারী ফার্নিচার এখন ভাড়া করেই চালাও।

একখানা ছোট খাট আর সোফা-সেট একটা ভাড়া করা হল। স্বাতি বলল: ঠিকানা লিখে রাখুন। আর কোন্ দিন কখন পৌঁছতে হবে, টেলিফোনে বলব।

বাইরে বেরিয়ে স্বাতি বলল: এইবারে নিশ্চিন্ত মনে একটু বেড়ানো যাক।

লেকে যাবে, না গঙ্গার ধারে?

স্বাতি সকৌতুকে বলল: তোমার সঙ্গীকে নিয়ে ঐ সব জায়গাতেই যেয়ো। আর পাশাপাশি বসে আকাশের দিকে চেয়ে—

বলে হাসতে লাগল।

এই পরিহাসের কী উত্তর দেব ভেবে পেলুম না।

স্বাতি বলল: চল, ঠনঠনের কালীবাড়িতে একটা প্রণাম করে উত্তর দিকে এগিয়ে যাই।

এইবারে আমি বললুম: অতি ভক্তি কিন্তু চোরের লক্ষণ।

স্বাতি হেসে বলল: চোরের বাড়িতেই সিঁদ কাটছি।

চোরাই মালের জন্যে?

নিজের সম্পত্তি উদ্ধার করব।

বলে হাসতে লাগল। আর এক সময় ড্রাইভারকে বলল ঠনঠনে কালীবাড়ির দিকে এগোতে।

গাড়ি থেকে নেমে আমরা কালীদর্শন করলুম। শিবমন্দিরের একটি পাথরে লেখা আছে—শঙ্করের হৃদয় মাঝে কালী বিরাজে। এই শঙ্কর হলেন শঙ্কর ঘোষ। স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি এই শিব ও কালীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তারপরে আমরা এগিয়ে গেলুম উত্তর দিকে। স্বাতি বলল: উত্তর কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি আমাদের দেখা হয় নি।

যেমন?

ভয় নেই, চিৎপুরের নাখোদা মসজিদে তোমাকে নিয়ে যাব না।

তাতে ভয় পাবার কী আছে?

ভয় পাবে আবার কলকাতা দেখাতে শুরু করছি ভেবে। নাখোদা মসজিদের ছবি নিশ্চয়ই দেখেছ?

বললুম : দেখেছি।

মস্ত বড় মসজিদ। তিন চার তলার উপরে বড় বড় গম্বুজ আর উঁচু উঁচু মিনার। একসঙ্গে প্রায় দশ হাজার লোক নমাজ পড়তে পারে। অনেকে বলে, সিকান্দ্রায় আকবর বাদশাহের সমাধির মতো এই মসজিদের স্থাপত্য। কিন্তু জায়গাটা নির্জন নয় সেই রকম। চিৎপুর দিয়ে গাড়ি ঘোড়া ট্রাম চলে ঘড় ঘড় করে, আর পথের দু ধারে নানা রকম শৌখিন জিনিসের দোকান।

স্বাতি বলল : তাহলে বল কোথায় তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি ?

বললুম : মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের মার্বেল প্যালেস দেখাতে ?

আমি ভেবেছিলাম জোড়াসাঁকোর কথা বলবে। কিন্তু ওসব জায়গাতেও তোমাকে নিয়ে যাব না।

কেন ?

মার্বেল প্যালেসের ঐশ্বর্য তোমার ভাল লাগবে না।

কিন্তু রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর নানা দেশ থেকে নানা জিনিস সংগ্রহ করে এনেছিলেন—রোম থেকে ফোয়ারা, নেপল্‌স্‌ থেকে মূর্তি, জেনেভা থেকে ঘড়ি, প্যারিস থেকে ছবি, আর—

বল। রুবেন্‌স্‌ ও জশুয়া রিনল্ড্‌সের আঁকা কয়েকখানা মূল্যবান ছবি আছে শুনেছি। কিন্তু এ সবের চেয়ে বড় হল গত শতাব্দীর ইতিহাস। বাঙলার নব-জাগরণের কথা মনে পড়ে যাবে।

স্বাতি বলল : ঘরে বসে এক দিন এই আলোচনা করব।

চিৎপুর রোড ধরে জোড়াসাঁকোর দিকেও আমরা এগোলুম না। অনেক দিন আগে নাকি এখানে পাশাপাশি দুটো সাঁকো ছিল খালের উপর। গঙ্গা আরও কাছে ছিল বলে গঙ্গার জল আসত খাল দিয়ে। গঙ্গা এখন সরে গেছে, খালের বদলে নর্দমা হয়েছে রাস্তার নিচে। সাঁকো না থাকলেও জোড়াসাঁকো নাম আছে। আর জোড়াসাঁকো বললে আমরা ঠাকুরবাড়ি বুঝি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যেখানে জন্মেছিলেন সেই বাড়ি। এখন সেখানে

একটি লাল পাথরের বাড়িতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল : বুঝতে পারলে না তো।

বললুম : না।

আজ তোমাকে পরেশনাথের মন্দির দেখাব।

বলে ড্রাইভারকে সেই দিকে যাবার নির্দেশ দিল।

পরেশনাথের মন্দিরের নামে আমার পরেশনাথের শোভাযাত্রার কথা মনে পড়ল। প্রায় দেড় শো বছর ধরে জৈনদের এই শোভা-যাত্রা বের হচ্ছে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। এর চেয়ে বড় শোভাযাত্রা কলকাতায় আর বেরোয় না। মহিস্থরের দশেরার মতো কলকাতায় এর কদর। বড়বাজার এলাকায় কটন স্ট্রিটে আছে শান্তিনাথের মন্দির। এইখান থেকে শোভাযাত্রা বেরিয়ে বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রীটে দাদাবাবিতে তার শেষ হয়। এইখানেই পরেশনাথের মন্দির।

দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকে বিরাট উঁচু দেবরাজ ইন্দ্রের ধ্বজা, তারপরে সুসজ্জিত হাতি ঐরাবত। নহবৎখানাও চলে সঙ্গে সঙ্গে। রথযাত্রায় জগন্নাথের মতো ধর্ম নাথকে নিয়ে এই শোভাযাত্রা। এর আয়োজন করেন শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়।

এই প্রসঙ্গে বেলগাছিয়ার জৈনমন্দিরের কথাও আমার মনে পড়ে গেল। লাল পাথরের মন্দিরটি পথে যেতে যেতেই দেখা যায়। এটি দিগম্বর সম্প্রদায়ের মন্দির কিনা জানি না।

আমরা বিডন স্ট্রীট ধরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড পেরিয়ে বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রীটে ঢুকে পড়লুম। স্বাতি হঠাৎ আপসোস করে বলে উঠল : তোমাকে একটা দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির দেখাতে ভুলে গেলাম।

কলকাতায় দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির !

ঠিক এক রকম। ছবি তুললে বুঝতে পারবে না যে এটি কলকাতার মন্দির। বিবেকানন্দ রোড ধরে যেতে যেতে ঐ এলাকাতেই দেখেছিলাম। সেই দিনই ভেবেছিলাম যে তোমাকে এক দিন দেখিয়ে দেব।

বললুম: কলকাতার মন্দির, এক দিন দেখলেই হবে। পুষ্করে আছে, বৃন্দাবনেও আছে, কলকাতায় থাকবে না কেন!

আমাদের গাড়ি এসে পরেশনাথের মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম। আর আশ্চর্য হলুম দেখে যে এখানে একটি নয়, তিন চারটি মন্দির আছে কাছাকাছি। কাচের মন্দিরে দশম তীর্থঙ্কর শীতলনাথ। অষ্টম তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভুও আছেন। চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামী আছেন একটি সাদা মন্দিরে। আর শ্বেত-পাথরের মন্দিরে দাদাবাবি। একজন গুরুর পায়ের ছাপ। মূল মন্দিরটি মণিমাণিক্য দিয়ে এমন সুন্দর করে সাজানো যে মনে হবে কোন স্বপ্নলোকে এসে উপস্থিত হয়েছি। নীল জলাশয়ের ধারে সুন্দর বাগান। সেইখানে দাঁড়িয়ে স্বাতি বলল: একটু বোসো এইখানে।

সত্যিই বসতে ইচ্ছা করে।

স্বাতি বলল: লেকের চেয়ে গঙ্গার ধারের চেয়ে কি এ জায়গা ভাল নয়?

প্রতিবাদ না করে মেনে নিলুম তার কথা।

স্বাতি হেসে বলল: এখানে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হবে না। এখানে তোমার মন যাবে আড়াই হাজার বছর আগের যুগে, যখন ভারতের অধিবাসীরা এক সঙ্গে দেখেছিল দুজন মহাপুরুষকে—বর্ধমান মহাবীর আর গৌতম বুদ্ধকে। পরেশনাথের মন্দিরে এসে তুমি তাদের একজনকে দেখতে পাবে। বুদ্ধের চেয়েও দৃঢ়স্বরে ইনি বলেছিলেন, অহিংসাই পরমধর্ম।

২৫

ফেরার পথে আমি বললুম : কলকাতা যে বৌদ্ধদেরও একটি তীর্থস্থান তা জান তো ?

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : কলকাতা কী করে বৌদ্ধতীর্থ হবে !

যেমন করে সাঁচী হয়েছে ঠিক তেমনি করে।

তারপরে তাকে সেই গল্পটি সংক্ষেপে বললুম।

পুরনো তক্ষশীলা ও ভট্টিপ্রলু বা ঐ রকম নামের কোন জায়গায় বুদ্ধের তিনটি অস্থি পাওয়া গেলে ভারত সরকার স্থির করল যে সেই অস্থি মহাবোধি সোসাইটির হাতে দেওয়া হবে। কিন্তু তা রাখবার জন্যে বিহার নির্মাণ করতে হবে তিনটি। একটি তক্ষশীলায়, সারনাথে একটি, আর একটি এই কলকাতায়। অনেক চেষ্টায়, অনেকের দানে কলকাতায় এই চেতবিহার স্থাপিত হল। অজন্তা গুহামন্দিরের মতো এই বিহারের নক্সা তৈরি করেছিলেন জন মার্শাল, আর বিনে পয়সায় কাজ করেছিলেন শিল্পী এম. এম. গাঙ্গুলী।

বেশি দিনের পুরনো কথা নয়। পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি আগে এই চেতবিহারের উদ্বোধন হয়েছে। বাঙলার বাঘ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি। অ্যানি বেসান্ত ও অনাগরিক ধর্মপালকে নিয়ে তিনি শোভাযাত্রা করে গেলেন লাটভবনে। পরনে তাঁর গরদের জোড়, খালি পা। ইংরেজ রাজত্বে সেদিন প্রথম ভারতীয় এই বেশে লাটভবনে প্রবেশ করলেন বুদ্ধের অস্থি সংগ্রহে। লাটসাহেবের হাত থেকে অস্থি নিয়ে সেই অস্থি রাখা হল শ্রীধর্মরাজিকা চেতবিহারে। কলকাতাও একটি বৌদ্ধতীর্থে পরিণত হল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ধরে আমরা ফিরছিলুম। এই রাস্তার

উপরেই সায়েন্স কলেজ ও বোস ইনস্টিটিউট। কিন্তু আমার মনে পড়ল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কথা। সেও এই অঞ্চলে। খবরের কাগজে এই পুরনো প্রতিষ্ঠানটির দুরবস্থার কথা পড়েছি। দুঃখ হয়েছে এই ভেবে যে এটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অনেক মনীষীর নাম জড়িয়ে আছে। তাঁদের নাম আমরা ভুলে যাই নি, ভুলব না কোন দিন।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল : এবারে কী ভাবছ বল তো ?

বললুম : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার গল্প মনে পড়ছে।

তারপরেই বুঝতে পারলুম যে এ গল্পও সে শুনতে চাইছে। বললুম : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ গত শতাব্দীর শেষের দিকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সারস্বত সমাজের। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাঙলার সাহিত্যিকদের একত্র করার। প্রথম অধিবেশনে সহযোগী সভাপতি হয়ে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বললেন, এই সমাজের নাম হোক অ্যাকাডেমি অব বেঙ্গলি লিটারেচার। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হল না, আর সমাজও বন্ধ হয়ে গেল।

বছর দশেক পরে গ্রে স্ট্রীটে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুরের বাড়িতে বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচারের প্রতিষ্ঠা হল। পরের বছরই তাঁর বাঙলা নাম হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। রমেশচন্দ্র দত্ত হয়েছিলেন প্রথম সভাপতি, আর সহ-সভাপতি নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ। আর লিওটার্ড সাহেবের পর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী হয়েছিলেন সম্পাদক।

রাস্তার দিকে চেয়ে বললুম : বাঁ দিকে একটু নজর রেখে চল। বাড়িটা দেখিয়ে দেব।

তারপরেই সেই পুরনো দোতলা বাড়িটি দেখতে পেলুম। সংস্কারের অভাবে জীর্ণ দেখাচ্ছে। কিন্তু একদিন মহাসমারোহে

এই ভবনের উদ্বোধন হয়েছিল এই শতাব্দীর প্রথম দিকে। উমিচাঁদের বাগান ছিল এইখানে। কাশিমবাজারের মহারাজা এই জমি দিয়েছিলেন, আর দোতলা তৈরি করে দিয়েছিলেন লালগোলার মহারাজা। সেকালের বহু ধনী ব্যক্তির দানে এই পরিষৎ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এর লাইব্রেরি, এর পুঁথি ও চিত্রসংগ্রহ খুবই অমূল্য। অনেক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে পরিষৎ বাঙলা সাহিত্যের স্থায়ী উপকার সাধন করেছে।

সম্প্রতি শুনতে পাচ্ছি যে একালের লেখকেরা বাঙলা অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানে আধুনিক সাহিত্যের লালনপালন হবে, আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তার পুরনো পুঁথি নিয়ে বেঁচে থাকবে জীবন্মৃত অবস্থায়।

কলকাতায় একটি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎও আছে। এই অঞ্চলেই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে তার তিনতলা বাড়ি। একটি গ্রন্থাগার ও চতুষ্পাঠী আছে, মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থাও আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে কলকাতার বাঙালীর আগ্রহ আমরা দেখতে পাই নে।

শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলুম। রাস্তার দিকে চেয়ে স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল : এই দিকটা এবারে জমজমাট হয়ে উঠবে।

কেন ?

বিধাননগর যেভাবে গড়ে উঠছে, তাতে কিছুদিন পরে এই অঞ্চলটাই হয়তো পুরনো কলকাতার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

বললুম : সে কথা জোর করে বলা যায় না।

কেন ?

বাঙলার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় যখন কল্যাণী গড়ে তুলেছিলেন, তখনও অনেকে এই কথাই ভেবেছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে কল্যাণীর উন্নতি আর হল না।

স্বাতি বলল : কিন্তু বিধাননগর কলকাতারই অঙ্গ বলে ক্রমশ উন্নতি হবে। শুনতে পাচ্ছি, দ্বিতীয় দফায় পাতালরেলও চলবে।

কথায় কথায় আমরা শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে গেলুম। স্বাতি বলল : ডান দিকে মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে এগিয়ে চল। মহাবোধি সোসাইটিতে যাব।

এ জায়গাটায় সারাক্ষণই ভিড়। বাইরে থেকে যাত্রী সারাক্ষণ কলকাতায় আসছে, আর কলকাতা থেকে যাত্রী যাচ্ছে বাহিরে। ট্রেনে কোন দিকেই জায়গা পাওয়া যায় না, আর কোন সময়েই ভিড় কমে না এই জায়গায়। মহাত্মা গান্ধী রোড ধরতে আমাদের বেশ খানিকটা সময় লাগল।

এই অবসরে আমার আর একটি পুরনো প্রতিষ্ঠানের কথা মনে পড়ে গেল।

স্বাতি বলল : তুমি বোধহয় অন্য কিছু ভাবছ!

বললুম : এশিয়াটিক সোসাইটির কথা মনে পড়েছে। এমন পুরনো প্রতিষ্ঠান কলকাতায় আর নেই। প্রায় দু শো বছর আগে এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের জজ স্যর উইলিয়াম জোন্স। তিরিশ জন ইংরেজ তখন এই সভার সদস্য ছিল। আর সভা বসত হাইকোর্টে জুরিদের ঘরে।

স্বাতি আশ্চর্য হল আমার কথা শুনে। তাই দেখে বললুম : অনেকদিন পর্যন্ত এ দেশের লোকের সদস্য হবার অধিকার ছিল না। কোন চাঁদাও ছিল না। পরে চাঁদার ব্যবস্থা হয় স্বর্ণমুদ্রায়। হাইকোর্টের অ্যাডভোকেটদের যেমন ফী ছিল গিনিতে, তেমনি এশিয়াটিক সোসাইটির চাঁদাও গিনির মূল্যে দিতে হত। বছর চল্লিশেক পরে তারা ভারতীয় সদস্য নির্বাচন করে।

এতক্ষণ পরে স্বাতি বলল : আশ্চর্য!

বললুম : কাজও তারা আশ্চর্য রকমের করেছিল। শুধু ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির কথা নয়, সমস্ত এশিয়ার কথাই তারা ইয়োরোপে

পৌঁছে দিয়েছিল। বহু মুদ্রা শিলালিপি পুঁথি ও চিত্র সংগ্রহ করে, বহু গ্রন্থ প্রকাশ করে তারা যে সে যুগে এক অভাবনীয় কাজ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বোধহয় অনেকেই জানে না যে মহিস্থরের টিপুসুলতানের একটি ভাল লাইব্রেরি ছিল। সেটি এখন এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়িতে আছে। আর এই সোসাইটির সংগ্রহ নিয়েই কলকাতার মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

স্বাতি বলল : পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড়ে সোসাইটির স্থন্দর বাড়ি দেখেছি।

বললুম : সে ওদের নতুন বাড়ি। ওদের পুরনো বাড়ি ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতোই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নতুন বাড়ি হল না কেন ?

আভিজাত্যের অভাবে তার আকর্ষণ নেই বলে। এক সময় এশিয়াটিক সোসাইটির নাম হয়েছিল রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি। চাঁদা দিয়ে মেম্বার হয়ে লোকে নামের পিছনে লিখত এম. আর. এ. এস.। বিলেতের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি আপত্তি করে বলল তাদের সোসাইটির মান খাটো হচ্ছে, কলকাতার সোসাইটিকে তাই 'অফ বেঙ্গল' কথাটা লিখতে হবে। কৌশলে এই নাম চালু করা হয়েছিল।

একটা গলির মতো পথ ধরে আমরা কলেজ স্ট্রীটের উত্তর-পূর্ব কোণে পৌঁছে গেলুম। একটুখানি এগিয়েই বাঁ দিকে মহাবোধি সোসাইটি ভবন। রাস্তার ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা নেমে পড়লুম।

বাহিরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দেখলুম এই বাড়িটি। অজন্তার কোন গুহার মতো নয়। আবার কিছু মিলও আছে। সামনের দরজা বন্ধ বলে ভিতরে ঢুকতে পারলুম না। দরজার দু ধারে দেওয়ালের লেখা পড়লুম। এক ধারে চেতবিহারের প্রতিষ্ঠাতাদের

নাম, অন্য ধারে বুদ্ধের উপদেশ—প্রাণী হত্যা কোরো না, চুরি কোরো না, মিথ্যা বোলো না, পিশুনবাক্য প্রয়োগ কোরো না, কর্কশ কথা বোলো না, বৃথা গল্প কোরো না, রাগ কোরো না, কর্মফলে বিশ্বাস কোরো। সুকর্মের দশটি নির্দেশও আছে—যোগ্য ব্যক্তিকে দান কোরো, নৈতিক বিধান মেনো, সুচিন্তার উন্নয়ন কোরো, অপরের কাজে লাগো এবং সেবা কর, পিতামাতা গুরুজনদের সম্মান এবং শুশ্রূষা কর, নিজের গুণের ভাগ অপরকে দাও, অপরের গুণের ভাগ গ্রহণ কর, সত্যবাদ শোন, সত্যবাদ প্রচার কর, আত্মবিশ্বাস শোধন করে নাও।

স্বাতি অনেকক্ষণ ধরে এই উপদেশগুলি পড়ল। তারপরে বলল: বুদ্ধকে আমরা নানা জায়গায় দেখেছি। আজ প্রথম জানলাম যে কলকাতা শহরেও তিনি আছেন।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করল: এর পাশেই তো তোমার প্রকাশকের অফিস!

বললুম: সন্ধ্যা ছটায় অফিস বন্ধ হয়ে গেছে।

স্বাতি বলল: এস, গোলদীঘির ভিতরে গিয়ে একটু বসি।

চল।

বলে তাকে অনুসরণ করে কলেজ স্কোয়ারের ভিতরে ঢুকে পড়লুম। ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম যেমন লালদীঘি, তেমনি গোলদীঘি নাম কলেজ স্কোয়ারের। কিন্তু দীঘিটি গোল নয়, এও চতুষ্কোণ। ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম এখন বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ হয়েছে, কলেজ স্কোয়ারের নামও বদলেছে কিনা জানি না। বদলানো উচিত নয়। কলকাতার অনেক পুরনো স্কুল কলেজ তো এরই চারি ধার ঘিরে আছে। কলেজ স্কোয়ারই এর সার্থক নাম।

নিরিবিলিতে একটা বেঞ্চের উপরে বসে স্বাতি বলল: এর ভেতরে কিছু দেখবার নেই?

আছে বৈকি। এই ধারে প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত বাঙালী

সৈনিকের স্মৃতিস্তম্ভ, ওধারে ডেভিড হেয়ার সাহেবের সমাধি, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে মন আমার বিষণ্ণ হয়ে গেল। এখন যেখানে বিরাট বাড়িটা তৈরি হয়েছে, সেখানেই ছিল পুরনো সিনেট হাউস। সেই গোল থামওয়ালা বাড়িটার ছবি দেখতে পাই, কিন্তু বাড়িটা ভেঙে ফেলে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। কেন জানি না আমার মনে হয় যে ঐ পুরনো বাড়ির সঙ্গে এই পুরনো প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহ্যও যেন অনেক পরিমাণে খর্ব হয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই মহাজাতি সদনের কথা আমার মনে পড়ল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউএর উপরে এই সুন্দর বাড়িটির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর দু বছর আগে। নেতাজীর স্বপ্ন ছিল এই সংস্কৃতি ভবন। কিন্তু দু বছর পরে তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। নেতাজী রাজদ্রোহী, এই অপরাধ। দেশ স্বাধীন হবার পরে বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় এর নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়। মাত্র বছর পনেরো আগে দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়েছে মহাজাতি সদনের।

মহাজাতি সদনের ভিৎ স্থাপনের দিন নেতাজী ও রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, আমি তা কোন সাময়িকপত্রে পড়েছিলুম। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগস্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে আসছেন' তাঁদের জন্যে একটি গৃহের প্রয়োজন আছে বলে নেতাজী বলেছিলেন, 'নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি স্বাবলম্বন, গণ-আন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না।...বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত একটা তুচ্ছ আপোস করে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার —স্বাধীনতা—হেলায় ছেড়ে দেবে না। যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি, তা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র—আমরা চাই এক

নতুন সমাজ ও এক নতুন রাষ্ট্র, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলি।'

এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এখান থেকে এই প্রার্থনা-মন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাক—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

সেই সঙ্গে এ কথা যোগ করা হোক—বাঙালীর বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালীর বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তিসাধনায় বাঙালী স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।'

আমি যে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম, স্বাতি তা লক্ষ্য করে বলল: এবারে বোধহয় অন্য কিছু ভাবছ!

বললুম: মহাজাতি সদনের কথা মনে পড়েছে, মহাবোধি সোসাইটির মতো সেখানেও নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

তুমি গিয়েছ ভিতরে?

একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলুম। নিচের তলায় একটি মস্ত প্রেক্ষাগৃহ, বোধহয় হাজার দেড়েক লোক বসতে পারে। ময়দানের কাছে তৈরি নতুন রবীন্দ্রসরণির চেয়েও বড়, তিনতলা বাড়ি। উপরে নিচে অনেক ঘর আছে। বিধানচন্দ্র রায়ের নামে লাইব্রেরি। আর সবচেয়ে আকর্ষণের জিনিস হল নেতা ও শহীদদের দু শোরও বেশি ছবি। নানা রকম সেমিনার এখানে নিত্য লেগে আছে।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কোন খবর আমরা রাখি নে। খবরের কাগজে শুধু সিনেমা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন দেখি।

বললুম : সংস্কৃতির মরণ নেই বলেই তো বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবেও চিরকাল সভ্যতার মতো, ধর্মের মতো তার আয়ু।

স্বাতি নিঃশব্দে রইল খানিকক্ষণ, তারপরে বলল : আজ আমরা বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মন্দির দেখলাম। হিন্দুর মন্দির ও খ্রীষ্টানের গির্জাও দেখেছি। আর কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠান কি কলকাতায় নেই ?

বললুম : নিশ্চয়ই আছে। ইহুদীর কথা জানি, তাদের একটা সিনাগগ আছে ক্যানিং স্ট্রীট এলাকায়। সামনের সূর্য সেন স্ট্রীট কলুটোলা স্ট্রীট ধরে সোজা এগিয়ে গেলেই ক্যানিং স্ট্রীট।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : জুদের সিনাগগ আছে কলকাতায় !

বললুম : তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে !

আর আমরা কোচিনে গিয়ে সিনাগগ দেখলাম !

হেসে বললাম : ব্রাহ্মসমাজ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে, আর পার্সিদেরও একটা অগ্নিমন্দির আছে। মনে হচ্ছে যে এজরা স্ট্রীট ধরে চলতে চলতে এই মন্দিরটি একবার দেখেছিলুম। শুনেছিলুম, রাণী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে সেই বাড়িতে পবিত্র আগুন অনির্বাণ জ্বলছে।

স্বাতি বলল : একদিন দেখতে হবে এই সব।

বললুম : কলকাতায় থিওসফিকাল সোসাইটিও দেখতে হবে— সর্বধর্মের সমন্বয় স্থান।

স্বাতির চোখে বিস্ময় দেখে বললুম : বেঙ্গল থিওসফিকাল সোসাইটি।

মাদ্রাজে আমরা এই সোসাইটি দেখেছিলাম, আর এর প্রতিষ্ঠার কথাও শুনেছিলাম তোমার কাছে।

মনে পড়েছে সেই কথা। রাশিয়ার ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি ও আমেরিকার কর্নেল অল্‌কটের কথাও বলেছিলুম। ম্যাডাম এই থিওসফিকে বলেছেন Divine Wisdom, আর জি. এস. অরুণডেল বলেছেন God's knowledge of Himself. ধর্মকে জানার জন্য দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় হল থিওসফি।

ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি নাকি একদিন আবিষ্ট অবস্থায় হিমালয়ের ঋষিসংঘের আদেশ পেয়ে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথমে নিউ ইয়র্কে কর্নেল অল্‌কটের সহায়তায়। তারপর ম্যাড্রাসের আ্যাডিয়ারে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করে দুজনেই এসেছিলেন কলকাতায় প্রায় নব্বুই বছর আগে। বেঙ্গল থিওসফিকাল সোসাইটির প্রথম সভাপতি হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, যিনি টেকচাঁদ ঠাকুর নামে লেখেন বাঙলার প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'।

এখনও এই সোসাইটির লাইব্রেরিতে ফ্রী রিডিং রুম আছে, নানা বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সভাসমিতি হয় ও মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয় ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির—White Lotus Day. সমস্ত ঘর সাজানো হয় শাদা পদ্ম দিয়ে। গীতাপাঠ ও দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য অনুষ্ঠান এই উৎসবের অঙ্গ।

অ্যানি বেসান্তের নাম এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভারতের আধ্যাত্মিক কথার উপরে তিনি তিন শো তিরিশটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শোনা যায় যে তাঁর গীতার অনুবাদ বরফের দেশ আইসল্যাণ্ডের গুহাবাসীও পরম শ্রদ্ধায় পাঠ করে থাকে।

আমি নিঃশব্দে এই সব কথা ভাবছিলুম।

স্বাতি বলল: সেদিন তুমি কী বলেছিলে বোধহয় ভুলে গেছ। বলেছিলে, নিষ্ঠার সঙ্গে সকল দেশের ধর্ম ও দর্শনের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আপন আপন ঐতিহ্যের প্রতি শুধু শ্রদ্ধাই বাড়ে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির উপরে আস্থাও আসে। বলেছিলে,

ব্রহ্মজ্ঞান বড় কথা। কিন্তু আমরা সকলেই অনুভব করি যে আমাদের প্রতি দিনের জ্ঞানের বাইরে আরও কিছু জানবার জিনিস আছে। যা জানতে পারলে জীবন্মৃত্যুর রহস্য সরল হয়ে যেত, একটা পরিপূর্ণ জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের উপলব্ধি হত।

স্বাতির স্মৃতিশক্তি দেখে আমি আশ্চর্য হলুম। মনে হল, আমার কথাগুলিই যেন সে আবৃত্তি করে শোনাল।

স্বাতি বলল ঃ বল না তারপর কী বলেছিলে! মনে পড়ছে না!

এক মুহূর্তের জন্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল ঃ মানবাত্মার সেই শাশ্বত প্রার্থনার মন্ত্র শুনিয়েছিলে—

অসতো মা সদ্ গময়

আবিষ্টের মতো আমি বললুম ঃ

তমসো ময় জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

—অসত্য থেকে আমায় সত্যে নিয়ে যাও। আঁধার থেকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মূর্তি, তারই দ্বারা আমায় সর্বদা রক্ষা কর।

২৫

কলেজ স্কোয়ারে আমরা বেশিক্ষণ বসি নি। বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিটের বইএর দোকানগুলো বন্ধ হবার আগেই ফিরে এসেছিলুম।

সুবলবাবু আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ি ফিরতেই বললেন: আজও বার বার টেলিফোন আসছে।

স্বাতি বলল: পপি টেলিফোন করছে বুঝি?

আর সেই ভদ্রলোকও।

বলে সুবলবাবু আমার দিকে তাকালেন।

বুঝতে পারলুম যে পপি স্বাতিকে চাইছে, আর উমাশঙ্কর আমাকে। আর ঘরে ঢোকবার আগেই টেলিফোনে আবার রিং হতে লাগল। স্বাতি এগিয়ে গেল টেলিফোন ধরতে।

কথা যে পপির সঙ্গে হল তা বুঝতে অসুবিধা হল না। আর ভোরবেলাতেই যে আমাদের দীঘা যাবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকতে হবে, তাও বুঝতে পারলুম।

আর টেলিফোন রাখবার পরেই আবার তা বেজে উঠল। স্বাতি ফিরে আসছিল। আবার রিসিভারটা তুলে ধরল। তারপরে আমাকে ডেকে বলল: তোমার টেলিফোন।

হ্যাঁ, ঠিক বুঝেছিলুম। উমাশঙ্কর অত্যন্ত কাতরস্বরে আমাকে বলল: ব্রাদার, আমাকে রক্ষা করতে হবে।

কেন, কী হয়েছে?

অসুখ-বিসুখ নয় ব্রাদার, চাকরিটা বাঁচাতে হবে।

বলেন কি, আমি আপনার চাকরি বাঁচাব!

আর কে বাঁচাবে বলুন! চাকরির মর্ম শুধু আপনিই বুঝবেন, মেয়েরা বুঝবে না।

বললুম : কী হয়েছে বলবেন তো ?

উমাশঙ্কর এবারে ঘটনাটা বলল। তার বস্ আজও ফেরে নি, ছুটি পায় নি উমাশঙ্কর। অথচ পপি নাছোড়বান্দা, বলছে যে তার জন্যে সে নাকি মুখ দেখাতে পারবে না। মানে, কথা দিয়ে কথা রাখবার জন্যে দীঘা যেতেই হবে। এতে যদি চাকরি যায় তো সে চাকরি যাওয়াই উচিত—এমন গোলামি করা ভাল নয়।

জিজ্ঞাসা করলুম : তা আমাকে কী করতে হবে ?

পপিকে বলুন, আপনার শরীর খারাপ, কাল যেতে পারবেন না। আমি কথা দিচ্ছি ব্রাদার, পরশু আপনাদের ঠিক নিয়ে যাব।

কেমন এক রকমের মায়া হল ভদ্রলোকের উপরে। বললুম : চেষ্টা করছি।

হাতে আকাশের চাঁদ পাবার মতো খুশী হল উমাশঙ্কর। বলল : মিনিট দশেক পরেই আপনাকে ফোন করছি।

আচ্ছা।

বলে টেলিফোন রেখে দিলুম।

স্বাতি একটা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে খানকয়েক চিঠিপত্র নাড়া-চাড়া করে দেখছিল। এগিয়ে এসে বলল : কী হয়েছে ?

ব্যাপারটা বললুম তাকে। স্বাতি হাসল, কিন্তু বড় বিষণ্ণ মনে হল এই হাসি। বলল : আমি ব্যবস্থা করছি।

তারপরে টেলিফোনে ডাকল পপিকে, বলল : কিছু মনে করিস না ভাই, কাল আমাদের যাওয়া হবে না, পরশু যেতে পারি। কাল এমন একটা জায়গায় যেতে হবে যেখানে না গেলেই নয়। না, অন্যের কথা বলছি না। এ আমার নিজেরই কথা।

বলে টেলিফোন রেখে দিল।

বললুম : ব্যাপার কী বল তো ?

স্বাতি বলল : কাল একটা গানের জলসায় নিমন্ত্রণ আছে, আমার ওস্তাদের বাড়ি। সেখানে যেতেই হবে।

তারপরে বলল : আজও বাবা-মার কোন চিঠি এল না। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছেন কিনা বুঝতে পারছি না।

বললুম : নিশ্চয়ই পেয়েছেন।

তারপরেই উমাশঙ্করের টেলিফোন এল। তাকে আমি যখন স্বাতির কথা বললুম, সে বলল : কাল ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে আসব।

কিন্তু তার আনন্দ যে বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, তা কিছু পরেই জানা গেল। উমাশঙ্কর আবার আমাকে ডাকল, বলল : সকালে আমি পায়ের ধুলো নিতে ঠিকই আসব, কিন্তু আপনারা বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকবেন।

সে কি!

ঠিকই বলছি ব্রাদার। আপনারা না গেলে পপি আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। সে নিঃসন্দেহ যে আমি কলকাঠি নেড়েছি।

বললুম : আপনার চাকরির কী হবে?

সে তো পরের কথা। আগেরটা আগে সামলাই।

কিন্তু—

আর কিন্তু নয়। কথা দিন আপনি।

বললুম : স্বাতিকে একবার জিজ্ঞেস করি।

উমাশঙ্কর কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল : তিনি যে কত দয়ালু তা বুঝতে আমার বাকি নেই। আমার বিপদ বললেই তিনি রাজি হয়ে যাবেন।

তবু একটু ধরুন।

আমি ধরব না। কাল ভোরবেলায় এসে আমি তাঁর পায়ে ধরে সেধে নিয়ে যাব ব্রাদার। আপনি তাঁকে একটু বলে রাখুন।

বলে সে টেলিফোন ছেড়ে দিল।

স্বাতি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল : কী বলছিল উমাশঙ্করবাবু ?

বললুম : কাল আমাদের যেতেই হবে।

ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে স্বাতি বলল : আমি জানতাম।

জানতে ?

পপি আমার কথা বিশ্বাস করে নি। ও ঠিকই সন্দেহ করেছিল।

কিন্তু তোমার নিমন্ত্রণটা তো মিথ্যা নয় !

না। পরে একদিন তোমাকে ওস্তাদের কাছে নিয়ে যাব। খুব গুণী লোক। খানিকক্ষণ তাঁর কাছে বসলে অনেক জিনিস জানতে পারবে।

বললুম : নিশ্চয়ই যাব।

রাতের আহারের পর স্বাতি বলল : যদি হাল্কা কথা বলতে পার তো তোমার কাছে কিছুক্ষণ বসতে পারি।

তুমি কি আমাকে ভয় পাও ?

স্বাতি গম্ভীরভাবে বলল : অনেকেই পায়।

আমি অনেকের কথা জানতে চাইছি না, আমি বলছি তোমার কথা।

উত্তরটা স্বাতি এড়িয়ে গিয়ে বলল : বাবা-মা এসে পড়লে তোমার জন্যে পপির মতো একটি মেয়ে খুঁজতে বলব।

তাঁরা আসছেন বুঝি ?

কত দিন আর দিল্লীতে থাকবেন !

তাহলে আমিও তোমার একটা উপকার করতে পারি।

কী ?

বললুম : উমাশঙ্কর কাল তোমার পায়ের ধুলো নিতে আসবে। তোমার পায়েই যাতে পড়ে থাকে সে ব্যবস্থা করতে পারি।

কেমন করে ?

খুব সোজা কাজ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে নারদ-নারদ বললেই হল।

স্বাতি হেসে বলল : স্বাতি তাহলে নারদকেই জড়িয়ে ধরবে।

আমিও হেসে বললুম : তারপরে নারদের বাপ খোদ সৃষ্টি-কর্তাকে। এখনও বুড়োর রসকষ একটুও শুকোয় নি।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপরে বলল : আমরা এই শতাব্দীর বাঙালী—কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি জানি নে।

বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

বললুম : গোদো আসছে।

সে আবার কে ?

যাকে জানি নে, কেউ কোন দিন দেখে নি, তারই নাম গোদো। পৃথিবীর লোক সেই গোদোর আগমনের অপেক্ষাতেই আছে।

তোমার কথা ঠিক হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে।

বললুম : ওয়েটিং ফর গোদো হল স্যামুয়েল বেকেটের একটি ছোট নাটক। গোদো তার নেপথ্য নায়ক। আমাদের গীতার নায়ক বলেছেন, সম্ভবামি যুগে যুগে। কিন্তু গোদো এ কথা বলে নি, অন্য সব লোক বলেছে যে গোদোর আসবার সময় হয়েছে। নাট্যকারকে লোকে জিজ্ঞেস করেছে, কে এই গোদো ? নাট্যকার হেসে উত্তর দিয়েছেন, তা জানলে তো তাকেও মঞ্চে আনতুম।

স্বাতি বলল : মজার কথা তো !

শুধু মজার কথা নয়, সত্যি কথা। পৃথিবীর লোক এখন অন্ধ-ভাবে একটা পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কোন্ পথ, কোথায় যাবার পথ, তার হদিস নেই। কিন্তু একটা নতুন পথের দরকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। ছটফট করছে তরুণেরা, বুড়োরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। আর জনসাধারণ গা ভাসিয়ে দিয়েছে স্রোতে। আমরা ভগবানে বিশ্বাসী, তাই আমরা ভাবছি, তাঁর আসবার সময় হয়েছে, তিনি এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর নাস্তিকরা ভাবছে, তারাই পরিবর্তন আনবে, তাদেরই ওপর পরিবর্তন আনার দায়িত্ব।

আমরা বলছি, চুপ করে অপেক্ষা কর, তারা মানছে না। বলছে, অনেক সয়েছি, আর সইব না। কিন্তু সইতে না চাইলেই কি পৃথিবীটা বদলাবে? সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

স্বাতি বলল : বাঙলায় এই প্রশ্ন আজ ভয়ঙ্কর ভাবে জেগেছে। ছেলেমেয়েরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে।

বললুম : এটা খুবই সাময়িক। এই পাগলামি থাকবে না, কিন্তু প্রশ্নটা থেকে যাবে। এ চিরকালের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জন্ম হয়েছে বৈষম্য থেকে। এক দিন বর্ণের ভেদ ছিল, ধর্মের ভেদ ছিল, সামাজিক ভেদ। এখন অর্থের ভেদই একমাত্র ভেদ। মানুষ তার বাঁচার অধিকারে মানুষের ভেদবুদ্ধি আর সইবে না। গরিবী হটাতে না পেরে কি সরকার গরিবকে হটাবে! গরিবরা তাহলে সরকারকেই হটাবার জন্যে সংঘবদ্ধ হবে। আন্দোলন দৃঢ়তর হবে, কিন্তু দেশের কল্যাণ তাতে হবে না।

কল্যাণ কী করে হবে তা বলতে পার?

সেই কথা বলবে গোদো।

সে তো পৃথিবীর কথা বলবে। বাঙলার কথা বলবে কে? বাঙলা যেদিন জেগেছে, সেদিন থেকে তো বাঙলাই ভারতকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে।

বললুম : এ কথা তো ইতিহাসে পরিণত হচ্ছে। একালের ভারতবাসী এ কথা না মানলেও ভবিষ্যতের ভারতবাসী মানতে বাধ্য হবে। কিন্তু—

আমি থামতেই স্বাতি বলল : কিন্তু কী?

বললুম : বাঙালী সেই গৌরবের অধিকার থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। এক দিন দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিল, সত্যাগ্রহ নয়, মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতে হবে। পরম আত্মত্যাগে সেই পথ দেখিয়েছিল ভারতকে। আজও তার সেই পথ দেখাবার দিন এসেছে। বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তিই স্বাধীনতা নয়, অর্থনৈতিক মুক্তিই প্রকৃত

স্বাধীনতা। কী ভাবে সেই মুক্তি আসবে, বাঙালী কি সেই পথ দেখাতে পারবে না !

স্বাতি আমার দিকে তাকাল এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে। মনে হল, সে বুঝি আমাকেই এ ভার নিতে বলছে। আমি ভয় পেয়ে গেলুম। তাড়াতাড়ি বললুম: জানি না, কে এই ভার নিতে পারবে !

২৬

অন্য দিনের মতো শুয়েই আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারলুম না। এক রকমের অদ্ভুত যন্ত্রণা আমার বুকের মধ্যে গুমরে উঠল। এ কিসের যন্ত্রণা প্রথমে তা বুঝতে পারি নি। মন স্থির হবার পরে বুঝতে পারলুম না যে বাঙলার এক ঐশ্বর্যময় অতীতের কথা আমার মনে পড়ে গেছে।

কিন্তু যন্ত্রণা কিসের! সেই ইতিহাস তো যন্ত্রণাদায়ক নয়। তবে কি আমার মন সেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করতে চেষ্টা করেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে!

সে তো বেশিদিনের পুরনো কথা নয়। বাঙলার নব-জাগরণের কথা, আজও আমরা ভুলি নি। দেড় শো বছর আগে যে ঘুম ভেঙেছিল, এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেও তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই জাগরণের ইতিহাস বাঙালী ভুলতে পারবে না, ভুললে বাঙালী তার নিজেরই অস্তিত্ব হারাবে।

দেড় শো বছর আগের সেই ঐতিহাসিক ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। সতীদাহ হচ্ছে গঙ্গার ধারে। মস্ত বড় করে চিতা সাজানো হয়েছে। তার এক ধারে শোয়ানো হয়েছে মৃত স্বামীকে। তারপর আগুন দেওয়া হয়েছে চিতায়। চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠবার পরে বিধবা স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে চিতায় শুইয়ে দেওয়া হল। বাঁশ দিয়ে চেপে ধরা হল চারি ধার থেকে, যাতে আগুনের জ্বালায় ছুটে বেরিয়ে আসতে না পারে। প্রবল শব্দে বাজতে লাগল ঢাক ঢোল ও কাঁশি। বিধবার করুণ আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল সেই শব্দে। বিধবার সতী নাম হল, পুণ্য হল আত্মীয় পরিজনের। সেকালের বিচারে হিন্দুধর্মের জয়জয়কার হল

কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে সেই সতীর ছোট ভাই এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখলেন। বেদনায় তাঁর বুক ভরে গেল। জাতিতে ব্রাহ্মণ তিনি, গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারে বড় হয়েছেন। বাঙলা ও ফার্সি শিখেছেন দেশে, আরবী শিখেছেন পাটনায় মৌলবীর কাছে, কাশীর পণ্ডিতের কাছে শিখেছেন সংস্কৃত, ইংরেজীও শিখেছেন। কিন্তু এই ঘটনাকে পুণ্য বলে সমর্থন করতে পারলেন না। পর পর তিনখানি বই লিখলেন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে। বিধর্মী বলে নিন্দিত হলেন সমাজে—সমাজদ্রোহী তিনি। পরবর্তী কালে তিনিই হলেন সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায়। কিন্তু তাঁর যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে নয়, পাণ্ডিত্য দিয়ে পণ্ডিতদের জয় করেও নয়। বড়লাট বেন্টিঙ্ককে বুঝিয়ে তিনি আইন পাশ করিয়েছিলেন। সতীদাহপ্রথা নিবারণ হয়েছিল আইনের জোরে।

হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্যে তিনি এক নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। তার নাম ব্রাহ্মধর্ম। খ্রীষ্টান মিশনারীরা যখন এ দেশের লোককে নানা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়কে, তারা হিন্দুদের পৌত্তলিকতারই নিন্দা করত। রামমোহন বললেন, হিন্দুধর্মেও পৌত্তলিকতা নেই, বেদান্তের মতে ঈশ্বর নিরাকার। আমরাও সেই নিরাকার ঈশ্বর মানব। ব্রাহ্মসমাজে তিনি বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রচলন করলেন খ্রীষ্টানদের অনুকরণে। সংস্কার-মুক্ত শিক্ষিত বাঙালীরা এই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন। উত্তরকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি মহাত্মারা এই ধর্মমতকে খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

রামমোহন দশটি ভাষা জানতেন—বাঙলা সংস্কৃত ফার্সি আরবী উর্দু হিব্রু গ্রীক ল্যাটিন ফরাসী ও ইংরেজী। বাঙালীকে ইংরেজী শিখতে উৎসাহিত করে ইংরেজ রাজত্বে তাদের প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়েছিলেন। আবার নিজে বাঙলা ভাষায় বই লিখে বাঙলা

গদ্যকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা গদ্যের জন্ম হয়েছে রামমোহনের হাতে, আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের হাতে লালিত হয়ে সেই গদ্য সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়েছে।

প্রয়োজনমতো রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। নিজে পত্রিকা প্রকাশ করে মিশনারীদের বিরুদ্ধে লিখতেন, আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যেও বড়লাটকে পত্রাঘাত করতেন। তাঁর রাজা উপাধি ইংরেজের দেওয়া নয়। দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন। আর তাঁরই প্রতিনিধি হয়ে তিনি গিয়েছিলেন বিলেতে। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ধর্ম ও রাজনীতির জ্ঞানের জন্য সেখানে তিনি প্রচুর সম্মান পেয়েছিলেন। শুধু ইংলণ্ডের রাজা নয়, ফ্রান্সের সম্রাট লুই ফিলিপও তাঁকে সম্মান করে একত্র আহার করেছিলেন। ইংলণ্ডেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। স্টেপলটোন গ্রোভে তাঁর সমাধি।

সমসাময়িক না হলেও রামমোহনের পরেই দ্বারকানাথ ঠাকুর। বিশ বছর পরে জন্ম, আর তের বছর পরে তাঁরও মৃত্যু হয়েছে ইংলণ্ডে। তাঁর প্রিন্স উপাধি ইংরেজের দেওয়া নয়, বাদশাহের দেওয়াও নয়। বিদেশের লোক তাঁর আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে এই উপাধি দিয়েছিল। দেশের জন্যে তাঁর অবদান খুব বেশি নয়। শুধু চারজন ছাত্রকে চিকিৎসা-বিদ্যা শেখাবার জন্যে বিলেতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর মড়া কাটতে যখন তাদের সংস্কারে বাধছিল, তখন নিজে দাঁড়িয়ে তাদের সংস্কার-মুক্ত করেছিলেন।

বিদেশে তাঁর সম্মানের অন্ত ছিল না। রোমে পোপের সঙ্গে দেখা করেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে ছবি উপহার দেন, ফ্রান্সের সম্রাট ও ইটালির রাজার সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়। প্রথমবার তিনি বিলেত থেকে ফিরে আসেন, মৃত্যু হয় দ্বিতীয় বারের বিদেশ সফরের সময়।

রামমোহন ও দ্বারকানাথ প্রথম ভারতীয় যাঁরা বিদেশে গিয়ে

ভারতের মান বাড়িয়েছেন। শুধু ভারতীয়ের নয়, বাঙালীরও। বাঙালীরা তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরকাল স্মরণ করবে।

এর পরেই এল বাঙলার নব-জাগরণের যুগ। আধ্যাত্মিক জগতে এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ; শিক্ষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; সাহিত্যের দরবারে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিজ্ঞানের অঙ্গনে জগদীশচন্দ্র বসু; রাজনীতির ময়দানে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁরা ধূমকেতুর মতো একা এলেন না, তাঁরা এলেন গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে বাঙলার আকাশ উজ্জ্বল করে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই সব মহাপুরুষদের জন্ম হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। এক নেতাজী ছাড়া আর সবাই পঞ্চাশ-ষাট বছরের একটা বিশেষ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একজন আর একজনকে দেখেছেন, অনুপ্রেরণা পেয়েছেন জ্যেষ্ঠের কাছে, নিজেও বড় হয়েছেন।

তারপর স্বাধীনতা এল। সেই স্বাধীনতা দেখবার জন্যে বেঁচে ছিলেন মাত্র একজন। বিপ্লবী অরবিন্দ যোগাসনে বসে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব হতে দেখলেন—ঋষি অরবিন্দকে আমরা স্বাধীনতার পরে হারিয়েছি। আর সবচেয়ে কনিষ্ঠ নেতাজীকে আমরা হারিয়েছি কিনা, আজও তা সঠিক ভাবে জানি না।

এই নেতাজীর পরে বাঙলা কি ফুরিয়ে গেল! আর কোন নেতার জন্ম হবে না! সভ্যতার বিচিত্র বিকাশে জীবনে আরও কত নূতন দিক উন্মুক্ত হয়েছে—এ কালের বাঙালী কি কোন দিকেই বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে না!

আবার সেই যন্ত্রণা হচ্ছে বুকের ভিতর। মনে হচ্ছে, আমার

হৃৎপিণ্ডটা কেউ বুঝি চেপে ধরেছে, কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে, যন্ত্রণায় দম বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি উঠে পড়লুম। আমি জানি, এ বেদনা শারীরিক নয়, এ যন্ত্রণার উৎস আমার মন। মনকে শান্ত করতে হবে।

বিছানার পাশে টেবিলের উপরে স্বাতি জল রেখে গিয়েছিল। এক নিঃশ্বাসে সেই জল খেয়ে ফেললুম। তারপরে খোলা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম।

হেমন্তের আকাশ এখন নির্মেঘ। তারার আলোয় চারি দিক উজ্জ্বল হয়ে আছে। মিষ্টি বাতাস বইছে ঝির ঝির করে। কোন শব্দ নেই। কলকাতা শহর এখন ঘুমোচ্ছে।

এক তলার এই জানালায় দাঁড়িয়ে একটুখানি আকাশ আমি দেখতে পাচ্ছি। সামনের রাস্তার উপরের আকাশটুকু। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, সেই আকাশে একটা আলোর শিখা দেখতে পেলুম। আলো নয়, আগুনের শিখার মতো লক লক করে কেঁপে উঠল। তারপরেই নিবে গেল। আরও কিছুক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপরে ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম বিছানায়।

কিন্তু ঘুম এল না। ঘুমের বদলে নানা ভাবনা এল মনে। দেখতে দেখতেই সেই এলোমেলো ভাবনা আগুনের শিখার মতো লক লক করে উঠল নিজেরই মনে। এক দিন বুঝি বাঙলার আকাশেই এই আগুন জ্বলে উঠেছিল। অনেক চেষ্টা করেও ইংরেজ প্রভু সেই আগুন নেভাতে পারে নি।

বাঙলায় তার নাম হয়েছিল অগ্নিযুগ। বাঙালী ছেলেরা চল্লিশ বছর ধরে এই বিপ্লব বাঁচিয়ে রেখেছিল। মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব যোগ দিয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রয়াস স্থায়ী হয় নি। বাঙলার মতো এই বিপ্লবকে শতাব্দীর গোড়া থেকে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যেতে পারে নি।

এই অগ্নিযুগের প্রথম অধ্যায় হল ১৯০৫ থেকে ১৯০৮-৯ সাল

পর্যন্ত। ভারতের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় এই অধ্যায়ে। তার পরের অধ্যায় ১৯১০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল হল তৃতীয় অধ্যায়। এই সময়েই বিপ্লবী দল ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে মিলিত ভাবে ভারতব্যাপা অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে, এই সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে তারা জার্মানীর সাহায্যলাভও করেছিল।

তারপরে চট্টগ্রামের অধ্যায় ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র চলে এর পরের অধ্যায়ে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। আর সব শেষের অধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। নেতাজী অলৌকিক ভাবে ভারত থেকে অন্তর্ধান হয়ে যুদ্ধরত জার্মানীতে ভারতের মুক্তির জন্যে সেনাদল গড়লেন। প্রাচ্যের প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারীর সহায়তায় আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠন করে মণিপুর অভিযানে এলেন। স্বাধীন ভারতের পতাকা স্থাপন করলেন ভারতের ভূমিতে।

১৯৪২এ মহাত্মা গান্ধী ইংরেজকে বলেছিলেন, 'ভারত ছাড়ো', কিন্তু নেতাজী ভারতবাসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, 'দিল্লী চলো'। কোন আবেদন নিবেদন নয়, কোন বোঝাপড়া নয়, শক্তি সঞ্চয় করে 'দিল্লী চলো', স্বাধীনতা আমরা কেড়ে নেব। বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বাস করতেন—

ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে
আসবে সবাই আপনি সেজে
এক সঙ্গে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে।

বাঙলার ছেলে সেদিন বিশ্বাস করত—

আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি

কে পালাবে মা ফেলে ?
যায় যেন জীবন চলে।

তারা গাইত—

ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে, দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর !
শুধু মায়ের চরণে নম্রশির !

গাইত—

মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল।

আর কবির সেই অমৃতময় আশ্বাস—

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়।

সত্য হয়েছে কবির সেই ভবিষ্যদ্বাণী। এখন আমরা কোন্ ভবিষ্যতের জন্য প্রহর গণনা করব !

কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বড় অন্ধকার মনে হচ্ছে ঘরের ভিতরটা। বাহিরের আকাশেও কি এখন কোন আলো নেই। তবে আমি একটু আগে কিসের আলো দেখলুম ! সে কি আগুন ! বাঙলা কি আজ কোন নতুন অগ্নিযুগের তপস্যায় নিরত আছে !

জানি নে, ভাবতে পারি নে। ভয় করে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে।

২৭

দরজায় করাঘাত শুনে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিয়ে দেখলুম, প্রসন্ন আলোয় চারি দিক জেগে উঠেছে। আর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে স্বাতি। বলল : আর কতক্ষণ ঘুমোবে ?

লজ্জিত ভাবে বললুম : খুব দেরি হয়ে গেছে বুঝি ?

স্বাতি বলল : না, দেরি হয় নি। তবে তৈরি হয়ে বেরোতে হবে কিনা, তাই ডেকে দিলাম। একটু পরেই ওরা এসে পড়বে।

আমি এখুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

বলে বাথরুমে যাবার উদ্যোগ করে দেখলুম যে স্বাতি চলে যায় নি। আমাকে তাকাতে দেখে বলল : তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাও। তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেব।

নিজের জিনিসপত্রের কথা আমি অনেক দিন ভাবি নি। দার্জিলিঙের হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে আনবার সময় এ ভার সে স্বেচ্ছায় নিয়েছিল। আজও এ ভার তারই হাতে আছে। তাই বললুম : এ সব কাজের ভার নিজের হাতে আর নিতে চাই নে।

স্বাতি এবারে ঘরের ভিতরে ঢুকে বলল : খুব মজা পেয়েছ, না ! দীঘা থেকে ফিরে এসে কী করি, দেখো।

বলে সব গোছাতে লেগে গেল। আর আমি তার দিকে একটা কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের কাজে চলে গেলুম।

আমরা দুজনে যখন চা খেতে বসেছি, তখন উমাশঙ্কর হুড়মুড় করে এসে পড়ল। একা এল। সঙ্গে পপি নেই। তাই দেখে স্বাতি বলল : পপি কোথায় ?

উমাশঙ্কর বলল : আপনাদের নিয়ে তার কাছে যাব।

কেন, এখনও তৈরি হতে পারে নি বুঝি ?

না, তা নয়। মানে—

মানে কী ?

মানে, ওর বাবা-মা ঠিক আপনাদের মতো প্রগ্রেসিভ নন। মানে—

স্বাতি হেসে বলল : বুঝেছি।

উমাশঙ্কর আশ্বস্ত হয়ে বলল : বুঝবেনই তো। পপি আমাকে চুপি চুপি সাবধান করে দিয়েছিল।

বুঝতে আমারও অসুবিধা হল না যে উমাশঙ্করের সঙ্গে পপিকে একা ছেড়ে দিতে তার মা-বাবার আপত্তি ছিল। স্বাতির সঙ্গে যাচ্ছে বলেই তাঁরা রাজী হয়েছেন। আর স্বাতি তাকে তুলে দিতে গেলে নিশ্চিন্ত হবেন তাঁরা।

স্বাতি বলল : আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন, কিছু খান আমাদের সঙ্গে !

না না, আমি খেয়েই আসছি।

বলে উমাশঙ্কর বসে পড়ল। তারপরে বলল : তবে আপনার সন্দেশ একটা খেতে পারি।

স্বাতি ফ্রিজ থেকে সন্দেশ বার করল, আর একটা চায়ের পেয়ালাও এগিয়ে দিল।

একটা গোটা সন্দেশ একবারে মুখে পুরে উমাশঙ্কর খানিকক্ষণ ধরে সেটা সামলাল। তারপরে বলল : আপনার বাড়ির সন্দেশটা বেশ ভাল।

স্বাতি হেসে বলল : এ বাড়ির তৈরি সন্দেশ নয়, সন্দেশ বাজারের। মোড়ের দোকানের সামনে একবার দাঁড়াবেন, খোলা থাকলে কিনে নেব।

উমাশঙ্করের গাড়ির পিছনে জিনিসপত্র আমরা তুলে নিলুম। দু দিনের মতো জামাকাপড় আর টুকিটাকি জিনিস। স্বাতি এ সব

গুছিয়েই রেখেছিল। উমাশঙ্কর খুশী হয়ে বলল: বেশ লাইট চলেন তো আপনারা!

দেখতে পেলুম যে তার নিজের জিনিস অনেক বেশি। গাড়ির মাথাতেও জিনিস নেবার জন্যে কেরিয়ার লাগানো আছে।

মোড়ে এসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে স্বাতি এক বাক্স সন্দেশ কিনল। বলল: চলুন এবারে।

উমাশঙ্কর উর্ধ্বশ্বাসে পপির বাড়ি পৌঁছে গেল। কিন্তু গাড়ি থেকে নামল না। স্বাতিকে বলল: আপনি যান, আপনাকে দেখলে ওঁরা খুশী হবেন।

স্বাতি আমার দিকে একবার তাকাল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে পপিদের বাড়িতে ঢুকে গেল। এ বাড়ি যে তার চেনা তা বুঝতে পারলুম তাকে স্বচ্ছন্দে ভিতরে যেতে দেখে। উমাশঙ্কর বলল: ব্যাপারটা বুঝুন ব্রাদার, সামনের সপ্তাহে কি এ সব চলবে!

স্বাতির ফিরতে একটু সময় লাগল। পিছনে পপি। মস্ত একটা সুটকেশ নিয়ে একটা চাকরও আসছে। পপির হাতের ব্যাগটাও আজ বড়। স্বাতিকে কিছু বলতে বলতেই আসছে। দু একটা কথা আমি শুনতে পেলুম: এতে লজ্জা পাবার কী আছে! দু দিন পরে তো বিয়ে হচ্ছেই, হবু বরকে নিয়ে বিয়ে দেখতে বললে অমন সঙ্কোচের কী আছে!

স্বাতির কানের পাশ দুটো আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। বেশ আরক্ত হয়ে উঠেছে। সে কোন উত্তর দিল না।

পপি বলল: মঙ্গলবারে সন্ধ্যায় লগ্ন। বিকেলই বলতে পারিস। সময়মতো সাজাতে না এলে মা খুব ভাবনায় পড়বেন।

স্বাতি এ কথারও জবাব দিল না।

পপিকে দেখতে পেয়ে উমাশঙ্কর লাফিয়ে নেমে পড়েছিল। চাকরের হাত থেকে সুটকেশ নিয়ে গাড়িতে সাজিয়ে রাখল। তারপরে পপিকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালাল হাওড়ার দিকে।

স্বাতি পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করল: আপনি কদিন ছুটি নিয়েছেন ?

উমাশঙ্কর গম্ভীর ভাবে বলল : তিন দিনের দরখাস্ত রেখে এসেছি।

আমি বললুম : ছুটি নিশ্চয়ই মঞ্জুর হবে !

উমাশঙ্কর তেমনিভাবেই জবাব দিল : না হলে মেডিকেল সার্টিফিকেট দেব।

পপির প্রশ্নও আমার কানে এল। সে জানতে চাইল : অফিসে ট্যাঙ্ক্ ভরে নিয়েছ তো !

নিয়েছি।

বলে একখানা টুরিস্ট প্যাম্ফলেট বার করল। একবার চোখ বুলিয়েই পিছনে আমার হাতে দিয়ে দিল।

প্যাম্ফলেটখানা উল্টেপাল্টে আমি দেখে নিলুম। দীঘায় যাবার পথ আছে অনেক। ট্রেনে গেলে খড়্গপুরে নেমে সাতাত্তর মাইল বাসে যেতে হয়, কিংবা আরও কয়েকটি স্টেশন এগিয়ে কণ্টাই রোডে নামলে বাসের পথ বাইশ মাইল সংক্ষেপ হয়।

আমরা মোটরে যাচ্ছি। মোটরে যাবারও তিনটি পথ আছে। সব চেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ হল দেউলটি কোলাঘাট খড়্গপুর হয়ে। রূপনারায়ণ নদীর উপর পুল হবার পরে নৌকোয় গাড়ি পার করতে হয় না। মোট দূরত্ব দেড় শো মাইল। টুরিস্ট বাসে সকাল সাতটায় বেরোলে দুপুর একটাতেই পৌঁছনো যায়।

দ্বিতীয় পথটি খড়্গপুরে গেছে চাঁপাডাঙা আরামবাগ বিষ্ণুপুর হয়ে। দূরত্ব দু শো বাইশ মাইল। কিন্তু সব সময়ে এ পথে যাওয়া যায় না। বর্ষার পরে পুলের উপর দিয়ে মুণ্ডেশ্বরী ও দারকেশ্বর নদী পেরোনো যায়।

তৃতীয় পথটি গেছে আরও ঘুরে—বর্ধমান দুর্গাপুর হয়ে বিষ্ণুপুরের উপর দিয়ে। এতে দু শো চুরানব্বুই মাইল ছুটতে হয়। তবে

হাতে সময় থাকলে বাঙলার অনেক কিছু দেখে যাওয়া যায় থেমে থেমে।

দুর্গাপুরে নতুন ইস্পাতনগরী তৈরি হয়েছে। বাঙলার পুরনো ইস্পাতনগরী আসানসোলের কাছে বার্নপুরে। চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন তৈরির কারখানা আর রূপনারায়ণপুরের কেব্‌ল্ ফ্যাক্টরিও আসানসোলের কাছে। বাঙলার শিল্পোন্নতি দেখতে হলে এ দিকে এক দিন থাকতে হবে।

দুরন্ত দামোদর নদের ধারে দুর্গাপুরের নতুন শহর। মস্তবড় ব্যারেজের উপর দিয়ে ওপারে যেতে হয়। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের শেষ প্রকল্প এটি। এর উপরে পাঞ্চেত ছিল মাইথন বোকারো কোণার তিলাইয়া। ড্যাম ও পাওয়ার স্টেশন আছে এই সব জায়গায়। আর দুর্গাপুর থেকে খাল গেছে গঙ্গা পর্যন্ত। এই জলপথে নৌকো চলবে, চাষের জলও বইবে। ভারত সরকারের সঙ্গে বাঙলা ও বিহারের যুক্ত প্রচেষ্টায় দামোদর বাঁধা পড়েছে।

মাইথনের ড্যাম দেখার কথা আমার মনে পড়ল। বাঙলা ও বিহার সীমানায় বইছে বরাকর নদী। এপারে বরাকর, ওপারে কুমারডুবি, মাঝখানে মাইথন ড্যাম। পাঞ্চেতও কাছে। ওদিকে গেলে কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরও দেখে আসা যায়।

এই প্রসঙ্গে ময়ূরাক্ষীর কথাও আমার মনে পড়ল। বাঙলার নদী ময়ূরাক্ষী, কিন্তু তাকে বাঁধা হয়েছে বিহারের মসেঞ্জোরে। সিউড়ি থেকে পঁচিশ মাইল দূরে সাঁওতাল পরগণায় এই ড্যাম, আর সিউড়ির কাছে ব্যারেজ। এর নাম ক্যানাডা ড্যাম কেন হল অনেকেই তা জানে না। এটি নির্মাণের জন্যে ভারত ক্যানাডার সাহায্যই শুধু পায় নি, এটির উদ্বোধন করেছিলেন ক্যানাডার বিদেশ মন্ত্রী লেস্টার পিয়ার্সন। নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়ে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন।

উমাশঙ্কর আজ নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছে। কলকাতার পথে

এখন বেশি ভিড় নেই। অল্প সময়েই সে হাওড়ার পুল পেরিয়ে পশ্চিমের সোজা পথ ধরল। সোজা খড়্গপুরে যাবে।

দুর্গাপুর হয়ে গেলে আমরা এই নতুন শহরটা দেখতে পেতুম। আমাদের চোখের সামনেই এই শহরটা গড়ে উঠেছে। কলকাতা থেকে এক শো মাইল দূরে, কিন্তু কলকাতার লোক গ্যাস পাচ্ছে এই দুর্গাপুর থেকে। আরও অনেক কলকারখানা আছে সেখানে। সে সব দেখতে গেলে এক দিন থাকতে হয়। কয়লাখনি দেখা যায় রাণীগঞ্জ এলাকায়। আর চিত্তরঞ্জনের স্টীম ইঞ্জিনের কারখানায় এখন ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে। দুর্গাপুরে শুনেছি চশমার কাচও তৈরি হয়।

কিন্তু এ সব দেখতে না পাবার জন্যে আমার কোন দুঃখ হল না। শিল্পের উন্নতি এমন দ্রুত হচ্ছে যে আজকের প্রচেষ্টা কাল আর আগ্রহ জাগাবে না। ভারত এখন রকেট ছুঁড়তে শুরু করেছে। এক দিন আমরাও চাঁদে যাবার চেষ্টা করব, চাঁদ থেকে মঙ্গল গ্রহে।

পিছন ফিরে পপি হঠাৎ প্রশ্ন করল: আপনি এমন গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন কেন?

এমন একটা প্রশ্নের জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। বললুম: কিছু বলার কথা খুঁজে পাচ্ছি না বলেই চুপ করে আছি।

স্বাতি বলল: কিছু ভাবছ নিশ্চয়ই?

বললুম: দেহটা স্থির হলেই মনের কাজ বাড়ে। দেহটাকে তো আর সামলাতে হয় না, তাই নানা ভাবনায় অস্থির হয় মন।

পপি বলল: বেশ মজার কথা তো!

বললুম: ভাবছিলুম, এ পথে না গিয়ে আরামবাগের পথে গেলে কেমন হত।

উমাশঙ্কর বলল: লাঞ্চের আগে দীঘায় পৌঁছতে পারতুম না। কিন্তু পথে কয়েকটি ভাল জায়গা দেখা হত।

কী রকম?

বলে উমাশঙ্কর আগ্রহ প্রকাশ করল।

বললুম : বিষ্ণুপুর আর জয়রামবাটি-কামারপুকুর।

পপিই আশ্চর্য হল বেশি। বলল : সে সব জায়গায় আবার দেখবার কী আছে!

উমাশঙ্কর বলল : বিষ্ণুপুর নামটা শোনা শোনা লাগছে।

আর স্বাতি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল : তোমার দেখা আছে তো?

এক সঙ্গে তিনজনের উত্তর দেওয়া কঠিন কাজ। তবু বললুম : বিষ্ণুপুরের পুরনো মন্দিরগুলো দেখেছি। কিন্তু সময়ের অভাবে জয়রামবাটি-কামারপুকুরে যাওয়া হয় নি। ভেবেছিলুম ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর সারদা মায়ের জন্মভূমি আরামবাগের পথে দেখে আসব। কিন্তু বিষ্ণুপুর থেকে ফিরে এসে শুনলুম যে এ পথে সব সময় যাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরে গেলে সেখান থেকেই বাসে যাওয়া সুবিধে। আর তা না হলে নিজের গাড়িতে আরামবাগ হয়ে বিষ্ণুপুরে যাবার পথে দেখে যাওয়া চলে।

পপি বা উমাশঙ্করের কোন আগ্রহ দেখলুম না। আর কোন প্রশ্ন তারা করল না। স্বাতি বলল : তোমার দেখা থাকলে তোমার কাছেই জেনে নিতাম।

দেখা না থাকলেও আমার কিছু জানা ছিল। জয়রামবাটি আর কামারপুকুর কাছাকাছি দুটি গ্রাম। দামোদরের তীরে জয়রামবাটি বাঁকুড়া জেলায়, আর হুগলী জেলায় কামারপুকুর। মাঝখানের দূরত্ব তিন মাইল।

এক দিনের ঘটনা মনে পড়ছে। সিওড় গ্রামে কীর্তনের আসর বসেছে। আশপাশের গ্রাম থেকে এসেছে অনেক লোক। এই গ্রামে মামার বাড়ি বলে ছ বছরের মেয়ে সারদা এসেছেন জয়রামবাটি থেকে। যে মহিলার কোলে বসে কীর্তন শুনলেন, কীর্তন শেষ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এত লোকের মধ্যে তোর কাকে বিয়ে করতে সাধ হয় রে?

দু হাত তুলে সারদা যাকে দেখালেন, তিনি হলেন কামারপুকুরের পাগলা ছেলে গদাধর। গদাধর তখন দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পূজা করতেন। কিন্তু মন সারাক্ষণ উদাস। লোকে বলে পাগল। মা চন্দ্রা দেবী বললেন, ছেলের বিয়ে দিতে হবে। সেজদা রামেশ্বর বললেন, সেই চেষ্টাই করছি। আর এই কথা শুনে গদাধর বললেন, জয়রামবাটি গাঁয়ে রাম মুখুজ্জের বাড়িতে বিয়ের পাত্রী কুটো বাঁধা আছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এ সেই মেয়ে সারদা, কীর্তনের আসরে যিনি গদাধরকে পছন্দ করেছিলেন। মায়ের পছন্দ হল মেয়ে, দুজনের বিয়ে হয়ে গেল।

জয়রামবাটিতে এখন সারদা মায়ের বিরাট মন্দির তৈরি হয়েছে। গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠা হয়েছে মায়ের মর্মরমূর্তি। নিত্যপূজা হয়। নাটমন্দির আছে। প্রতি বছর দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ায় হয় মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব। এ ছাড়াও এই গ্রামে আছে সিংহবাহিনীর মন্দির।

কামারপুকুরে সদর রাস্তার পাশেই রামকৃষ্ণদেবের মন্দির। বিশ বছর আগে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নাটমন্দির আছে। এখানেও দুর্গাপূজা হয়।

শুনেছি তাঁর জন্মস্থানের উপরেই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বাড়ির ঢেঁকিশালে তাঁর জন্ম। জন্মের পরে গড়াতে গড়াতে তিনি পাশের উনুনে চলে যান। ধান সিদ্ধ হত এই উনুনে। শেষ রাতে উনুনে আগুন ছিল না, ছিল ছাই। সেই ছাই লাগল শিশুর গায়ে। এই ঢেঁকিশালেই তৈরি হয়েছে ঠাকুরের ছোট মন্দির। বেদীর উপরে তাঁর পাথরের মূর্তি, আর বেদীর গায়ে ক্ষোদিত হয়েছে ঢেঁকি, উনুন আর প্রদীপ।

আরও দুটি মন্দির আছে এই গ্রামে। রঘুবীরের মন্দির আর শিবের মন্দির। ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় রঘুবীরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি খড়ের ঘরে। এক দিন গ্রামে ফেরবার

সময় নাকি একটা গাছতলায় তিনি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন রঘুবীরকে। ঘুম ভাঙার পরে পাশেই একটি শিলা দেখতে পেলেন, তার মাথায় একটি সাপ ফণা ধরে আছে। 'জয় রঘুবীর' বলতেই সাপ সরে গেল। আর ক্ষুদিরাম সেই শিলা এনে নিজের গৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন। এটিও এখন পাকা মন্দির হয়েছে খড়ের ঘরের মতো আকারের।

এই শিবের মন্দিরের সম্বন্ধেও একটি গল্প আছে। ঠাকুরের মা নাকি অনুভব করেছিলেন যে এক দিন এই শিবের জ্যোতি এসে তাঁর শরীরে প্রবেশ করে। তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আর তার পরেই বুঝেছিলেন যে তিনি এবারে মা হবেন।

ঠাকুর ও তাঁর আত্মীয়পরিজনের স্মৃতিজড়িত আরও অনেক জায়গা আছে কামারপুকুরে। ঘুরে ঘুরে সেই সব দেখতে হয়। হুড়মুড় করে এ সব জায়গা দেখবার নয়।

এই তো সেদিন আমরা দক্ষিণেশ্বরে গেলুম। দক্ষিণেশ্বর দেখা হলো। কিন্তু রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে দেখতে পেলুম না, সারদা মাকেও না। তাঁদের দেখতে হলে চোখ বন্ধ করে মন মেলতে হত।

ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকেন, আর সারদা মা নিজের গাঁয়ে। তার কাছে খবর পেঁ ৗছেছে যে স্বামী মস্ত বড় সাধক হয়েছেন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তাঁর অনেক প্রতিপত্তি। এমন স্বামীর সেবা করতে পারবেন না! এ ভারি দুঃখের কথা। এক দিন বাবার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন।

ঠাকুর বললেন, কি গো, আমায় কি তুমি মায়ায় বদ্ধ করতে এসেছ?

তরুণী সারদা বললেন, না, তা কেন! আমি তোমার সহধর্মিণী। তোমার ধর্মপথে সহায়তা করতেই আমি এসেছি।

ঠাকুর পরম সমাদরে তাঁকে নিজের ঘরে স্থান দিলেন, নিজের শয্যায়।

অনেক দিন পরে এক দিন বলেছিলেন, ও যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে তখন আমায় আক্রমণ করত, তাহলে আমার সংযমের বাঁধ ভাঙত কিনা কে বলতে পারে! বিয়ের পরে মা জগদম্বাকে ব্যাকুল হয়ে ধরে পড়েছিলাম। বলেছিলাম, মাঁ, আমার স্ত্রীর ভেতর থেকে কাম ভাব একেবারে দূর করে দে। ওর সঙ্গে একত্রে বাস করে এ সময়ে বুঝেছিলাম, মা আমার সেই কথা সত্যিই শুনেছিলেন।

পদসেবা করতে করতে সারদা মা এক দিন জিজ্ঞেস করলেন, ওগো, ঠিক করে বল তো, আমায় তোমার কী মনে হয়?

ঠাকুর বললেন, মন্দিরে যে মায়ের পূজো হয়, সে-ই মা-ই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন এবং আজকাল নহবতে বাস করছেন। আবার তিনিই এখন কচ্ছেন আমার পদসেবা। আনন্দময়ী মায়ের প্রত্যক্ষ মূর্তি বলেই যে তোমায় সর্বদা আমি দেখি।

এই মাতৃভাবেই ঠাকুর নিজের শয়নঘরে ষোড়শী পূজা করেছিলেন ফলহারিণী কালীপূজার দিন। নতুন কাপড় পরে ফুলচন্দনে সেজে পূজার বেদীতে বসেছিলেন সারদা মা। আর পূজারী ঠাকুর মা-মা বলে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। সারদা মায়েরও তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে অবতার বলেছিলেন এক ভৈরবী। তাঁর গলায় রঘুবীর চক্র লুকনো থাকত। এক দিন পঞ্চবটীতে ইষ্টের জন্যে ভোগ রেঁধে ভৈরবী ধ্যানে বসেছিলেন। ঠাকুর সেই ভোগ খেয়ে ফেলে লজ্জায় বললেন, তাই তো! কে জানে বাপু, কেন এত বেসামাল হয়ে এ কাজ করে ফেললুম।

কিন্তু ভৈরবী বললেন, এ কাজ তো তুমি কর নি বাবা! যিনি তোমার ভেতরে আছেন, তিনিই যে করেছেন। ধ্যানে যাকে দেখেছি, এ যে তাঁরই কাজ! কেন এরূপ হল, তাও বুঝেছি। আর আমার পূজোয় কাজ নেই, পূজো এবার সার্থক হয়েছে।

বলে তাঁর রঘুবীর চক্র গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। আর তার পরেই ঘোষণা করলেন, রামকৃষ্ণ অবতার—এবারে নিতায়ের খোলে, চৈতন্যের অবতরণ!

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি ডাকতে বললেন। আর ছেলে-মানুষের মতো ঠাকুর বললেন মথুরবাবুকে, বামনী এত সব কথা জোর দিয়ে বলছে, তা একটা মীমাংসার জন্যে তাদের ডাকো না বাবু।

মীমাংসা হল। সভার শেষে ঘোষণা করা হল, ঠাকুর ঈশ্বরের অবতার।

কিন্তু ঠাকুর উৎফুল্ল হয়ে মথুরবাবুকে বললেন চুপিচুপি, ওগো, এ সব বলে কী! যা হোক বাবু, রোগটোগ নয়—শুনে কিন্তু মনটায় আনন্দ হচ্ছে।

শেষশয্যায় শুয়ে নিজের দেহটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, ওরে, যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সে-ই ইদানীং এই খোলটার ভেতর—তবে এবারে গুপ্ত ভাবে আসা। যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজরাজ্য পরিদর্শন। যেমনি জানাজানি কানাকানি হয়, অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেই রকম!

এই রামকৃষ্ণ সত্যিই ঈশ্বরের অবতার ছিলেন, না তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অবতারের আসেন বসিয়েছেন, তা নিয়ে আজও অনেকের সংশয় আছে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্যই রামকৃষ্ণ, এ কথাও বলে অনেকে।

কিন্তু বিবেকানন্দ কেন তাঁর শিষ্য হলেন! ঈশ্বরকে দেখিয়েছেন বলে! সেও তো তর্কের কথা! বেদান্তের পণ্ডিত বিবেকানন্দ কী দেখেছিলেন ঠাকুরের মধ্যে!

অশিক্ষিত ঠাকুর এক দিন সর্ব জীবে দয়ার কথা শুনে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। তারপরেই রেগে বললেন, জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা। কীটাণুকীট তুই! জীবকে আবার দয়া

কি করবি? দয়া করবার তুই কে? না না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।

বিবেকানন্দ বললেন, কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের এই কথায় পেলাম। বেদান্তজ্ঞান শুষ্ক কঠোর বলেই আমরা জানি। ভক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে ঠাকুর এ বেদান্তকে কি সরস কি মধুর করে তুললেন। ঠাকুর যা বললেন, তাতে বোঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়। সংসারে সব কাজে তা অবলম্বন করা যায়।

তিনি লিখলেন—

বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

পৃথিবীর লোককেও তিনি এই কথাই বললেন। এ তাঁর নিজের কথা নয়, এ কথা তাঁর অশিক্ষিত গুরু রামকৃষ্ণের।

২৮

নিঃশব্দে আমরা চলেছিলুম। দেড় শো মাইল পথ এমনি করেই আমাদের ছুটতে হবে। উমাশঙ্করের যে তাড়া আছে, তা তার গাড়ি চালানোর ধরন দেখেই বুঝতে পারছিলুম। দুপুরের আহারের আগেই সে পৌঁছতে চায়। সরকারী বাস সাতটায় ছেড়ে বেলা একটায় পৌঁছয়। আমাদের রওনা হতে কিছু দেরি হয়ে গেছে। কাজেই তাকে এখন একটু বেগে ছুটতে হচ্ছে। কথা বলার উৎসাহ তার দেখতে পাচ্ছি না।

তার বিমর্ষতার অন্য কারণও থাকতে পারে। ছুটি পায় নি, বাধ্য হয়ে তাকে আসতে হচ্ছে। এ রকম ঘটনা প্রথম নয় বলে সন্দেহ হচ্ছে। এর আগেও হয় তো এ রকম ঘটনা ঘটেছে এবং তার পরিণামের ভয়েই সে এখনও সহজ হতে পারে নি।

স্বাতিও আজ চুপ করে আছে। ইচ্ছা করেই যে কথা বলছে না, তা বুঝতে পারি। মামা-মামীর সঙ্গে হলে প্রশ্নে ও পরিহাসে সে আমাকে অস্থির করে দিত। এদের সামনে সে আমাকে কথা বলাতে চায় না।

শেষ পর্যন্ত পপিই কথা বলল। স্বাতিকে বলল: তোমরা কি ঝগড়া করে বেরিয়েছ নাকি ?

স্বাতি যে সচেতন ভাবেই চলেছিল, তা তার উত্তর শুনেই বুঝতে পারলুম। বলল: তোমাদের সঙ্গে তো ঝগড়া করি নি!

ঠিক ধরেছি তাহলে।

বলে পপি আমার দিকে চেয়ে বলল: আপনিও দেখছি উমার মতো। অপছন্দের কথা বললেই গাল ফুলে ওঠে।

স্বাতি বলল: আমার বিপদ অন্য রকমের।

কী রকম ?

বলছে, আর চাকরি করবে না। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বসে আছে।

সে কি !

আমার অবস্থাটা একবার বুঝে দেখ। কিছুতেই রাজী করাতে পারছি না।

পপি চিন্তিত ভাবে বলল : চাকরি ছেড়ে কী করবেন ভাবছেন ?

বললুম : চাকরি তো ছাড়ি নি, ফার্ম নোটিস দিচ্ছে।

কেন ?

সে কথা স্বাতিকেই জিজ্ঞেস করুন।

স্বাতি বলল : কাজ না করলে রাখবে কেন তারা ! ফার্ম তো দানছত্র খোলে নি যে বসিয়ে বসিয়ে পয়সা দেবে !

উমাশঙ্কর গম্ভীর ভাবে বলল : অনেকেই এ কথা বোঝে না।

স্বাতি বলল : আপনিই বলুন, এই দুর্দিনে একটা চাকরি গেলে আর একটা কি সহজে জোটানো যাবে ! আর সত্যি কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে—

ভবিষ্যৎটা অমাবস্যা।

বলে উমাশঙ্কর একটা ঝাঁকি দিয়ে গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

স্বাতি যে পপিকে কিছু উপদেশ দেবার চেষ্টা করছে, তা বুঝতে পেরেছিলুম। কিন্তু যাকে দেবার চেষ্টা করল, সে ঠিক বুঝল না। বলল : অমাবস্যার ভয়েই উমার পূর্ণিমা কোন দিন এল না।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল। বুঝতে পারলুম যে সে হাল ছেড়ে দিচ্ছে। পপির চৈতন্যোদয় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এক সময় উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল : আপনাদের কি এ পথে যাবার ইচ্ছা ছিল না ?

বললুম : না না, তা নয়। বলছিলুম, অন্য পথে গেলে উপরি লাভ হত।

উমাশঙ্কর বলল : যদি বলেন তো বিষ্ণুপুরের উপর দিয়েই ফিরতে পারি।

পপি বলল : সাধু সন্ন্যাসীর ব্যাপার আমার ভাল লাগে না।

আর স্বাতি তখনই বলল : বিষ্ণুপুর তো তোমার দেখা বললে!

তবে আর কি!

বলে পপি নিশ্চিন্ত হল।

আর তাকে নিশ্চিন্ত হতে দেখে স্বাতি আমাকে বলল : বিষ্ণুপুরের নামে আমার গানের কথা মনে হচ্ছে।

হেসে বললুম : বিষ্ণুপুর চিরকাল তার গানের জন্যেই বেঁচে থাকবে। যদুভট্ট থেকে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সঙ্গীতাচার্য এই বিষ্ণুপুর ঘরানার মান বাড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের কৃতিত্বও কম নয়। তাঁরাও যে সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন তার অনেক কাহিনী আছে।

অন্য দিন অন্য সময় হলে স্বাতি আমাকে এই সব কাহিনী বলবার জন্যে নিশ্চয়ই অনুরোধ করত। কিন্তু আজ কোন প্রশ্ন করল না। আমি নিজেই বললুম : রাজাদের পড়তির সময়েই তাঁরা সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ দেখিয়ে গিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের সভায় গান গাইতেন সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ বাহাদুর খান। রাজা তাঁকে মাসে পাঁচ শো টাকা মাইনে দিতেন। পাঁচ শো টাকার দাম তখন এত বেশি যে লোকে অবাক হত এই মাইনের কথা শুনে।

পপি আশ্চর্য হয়ে বলল : টাকা দিয়ে লোকে গায়ক রাখত!

বললুম : তা না করলে দেশ থেকে শিল্প-সংস্কৃতি অনেক আগেই

উঠে যেত। বাঙলায় বিষ্ণুপুরের রাজারাই কয়েক শতাব্দী ধরে সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

মনে পড়ল যে এক সময় সাহেবদের আঁকা মানচিত্রে দুটি শহর দেখানো হত মোটা অক্ষরে—কলিকাতা ও বিশেনপুর। দু শো বছর আগে লণ্ডন থেকে যে হিস্ট্রি অব দি ঈস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া প্রকাশিত হয়েছিল, তারই সঙ্গে ছিল এই মানচিত্র। সাহেবদের বিশেনপুরই হল বিষ্ণুপুর। প্রবাদ আছে যে এই বিষ্ণুপুর একদা ইন্দ্রভবনের মতোই মনোরম ছিল।

বিষ্ণুপুরের রাজবংশ খুব প্রাচীন বলে সকলের ধারণা। এঁরা নাকি এগারো শো বছর রাজত্ব করেছেন। এক পণ্ডিতের লেখা একখানি ইতিহাসে এই কথা পাওয়া যায়। এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠার কথাও আছে এই ইতিহাসে। জয়পুর রাজবংশের এক শাখা বৃন্দাবনের নিকটে কোথাও রাজত্ব করতেন। তিনি সপরিবারে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। বৃন্দাবন থেকে জগন্নাথক্ষেত্র পুরীর পথে এই বিষ্ণুপুরের নিকট অরণ্যের মধ্যে এক পান্থনিবাসে রানীর একটি পুত্র-সন্তান হল। রাজা তাঁদের ফেলে এগিয়ে গেলেন। রানীর কথা পাওয়া যায় না। ছেলেটি বড় হল এক ব্রাহ্মণের গৃহে। তিনিই এই মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ, বিষ্ণুপুর তাঁরই রাজ্যের রাজধানী।

অনেকে বলেন যে মল্লরাজাদের প্রথম রাজধানী ছিল প্রদ্যুম্নপুরে। চতুর্দশ শতাব্দীতে এই রাজধানী উঠে আসে বিষ্ণুপুরে। প্রদ্যুম্নপুরই এখন পাণ্ডুয়া নামে পরিচিত—হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া এখন পাঠানদের পরিচয় বহন করছে।

বীর হাম্বীর এই রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর রাজত্বকাল ষোড়শ শতাব্দী। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে। নবাবের পুত্র দায়ুদ খান তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। বীর হাম্বীর তাঁকে পরাজিত করে রাজ্যের খ্যাতি বৃদ্ধি করেন। তাঁর

চার স্ত্রী ও বাইশটি পুত্র ছিল। বাঙলায় তখন চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব-ধর্ম প্রবল হয়ে উঠেছে। বৃন্দাবন থেকে শ্রীনিবাসাচার্য এক লক্ষ বৈষ্ণব গ্রন্থ আনছিলেন। বীর হাম্বীরের কৌশলে সেই বই লুঠ হয়ে যায়। তারপরে তিনিই বৈষ্ণব হয়ে বিষ্ণুপুরে কয়েকটি বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধাড়ি হাম্বীর ছিলেন পাগল, আর ধাড়ি হাম্বীরের একমাত্র ছেলে কালারাম ছিলেন বোবা ও কালা। রানী তাই দেবর দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছিলেন।

এই রাজবংশের আর একজন রাজার নাম আছে নানা কিংবদন্তীতে। তিনি হলেন গোপাল সিংহ। হরিভক্তি প্রচারের জন্যে তিনি রাজ্যের সকল প্রজাকে প্রতি দিন এক হাজার বার হরিনাম জপের আদেশ দিয়েছিলেন, তা না করলে কারাবাস। আজও অনেকে বলেন 'হরি সিংহের বেগার'।

তাঁর রাজত্বকালের আর একটি ঘটনা হল মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ। মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত পরাজিত হয়েছিলেন এই যুদ্ধে। বিষ্ণুপুরে আমি একটি বিরাট কামান দেখেছিলুম, তার নাম দলমাদল কামান। লম্বায় সাড়ে বারো ফুট, আর ব্যাস প্রায় এক ফুট। এটি তৈরি করতে সে যুগে নাকি সোয়া লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের লোকে বিশ্বাস করে যে মারাঠা সৈন্যের হাত থেকে রাজ্য-রক্ষার জন্য রাজার কুলদেবতা মদনমোহন স্বয়ং এই কামান দেগে ভাস্কর পণ্ডিতকে জয় করেছিলেন।

গোপাল সিংহ তাঁর আটত্রিশ বছরের রাজত্বকালে আরও অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করে বিষ্ণুপুরকে আরও সুন্দর করেছিলেন।

বিষ্ণুপুরের পতিঘাতিনী সতীর কিংবদন্তী, লালবাঈএর গল্প এ কালের বইএও পড়েছি। দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ রাজা শোভা সিংহকে পরাজিত করে মুসলমান নর্তকী লালবাঈকে এনেছিলেন নিজের রাজ্যে। একটি মহল দিয়েছিলেন, লালবাঁধ নামে পুষ্করিণী করেছিলেন

লালবাঈএর নামে। তারপরে নিজে মুসলমান হবার সংকল্প প্রকাশ করতেই পাটরানী রাজাকে হত্যা করেন। আর লালবাঈকে লালবাঁধের জলে ডুবিয়ে মেরে নিজে স্বামীর চিতায় সহমরণে যান। এখনও লোকে বিষ্ণুপুরে গেলে নানা জায়গায় এই পতিঘাতিনী সতীর কাহিনী শুনতে পায়।

স্বাতি আস্তে আস্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করল: বিষ্ণুপুর তোমার কেমন লেগেছিল?

বললুম: ভাল।

স্বাতি আরও কিছু শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে রইল। তাই দেখে বললুম: অনেক দিন আগে গিয়েছিলুম বিষ্ণুপুরে। সব কথা এখন ভাল মনে পড়ছে না।

তুমি ভুলে গেছ!

নিজেই আশ্চর্য হচ্ছি এই জন্যে। কার সঙ্গে গিয়েছিলুম সে কথাও মনে পড়ছে না। শুধু এই কথা মনে আছে যে প্রায় শেষ রাতে অন্ধকার থাকতে বিষ্ণুপুর স্টেশনে নেমেছিলুম। শীতের সকাল। একটুখানি আলো ফুটতেই একখানা রিক্সা ধরে বেরিয়ে পড়েছিলুম। স্টেশন থেকে শহরের মধ্যে দিয়ে অনেক আঁকা-বাঁকা গ্রামের পথেও ঘুরেছিলুম। দলমাদল কামান দেখেছিলুম, রাসমঞ্চ, তিন চার রকমের মন্দির। একটা পথের শেষ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছিলুম। তারপরে রাজবাড়ি দুর্গ লালবাঁধ—এই সব দেখেছিলুম। কিছু কিছু মন্দিরের নামও মনে আছে—মদনমোহন মদনগোপাল কালাচাঁদ শ্যামরায় রাধেশ্যাম জোড়বাঙলা মন্দির। লালবাঁধের মতো কৃষ্ণবাঁধ যমুনাবাঁধ শ্যামবাঁধ কালিন্দীবাঁধ। দুর্গ ও দুর্গদ্বারের কথা ভাল মনে পড়ছে না।

আশ্চর্য!

বললুম: বিষ্ণুপুর থেকে একটা ট্রেন ধরে বাঁকুড়াও গিয়েছিলুম। এক্তেশ্বর শিবের মন্দির দেখেছিলুম সেখানে।

তারপরে রাতের ট্রেন ধরে বিষ্ণুপুরের ওপর দিয়েই হাওড়ায় ফিরেছিলুম।

তারপরেই প্রশ্ন করলুম : মাটির ঘোড়া দেখেছ?

স্বাতি উত্তর দিল : না।

এই অঞ্চলের মাটির ঘোড়া বিদেশ থেকে ডলার আনছে দেশে। এখন শুনছি কাঠেরও ঘোড়া তৈরি হচ্ছে। সরকারী বিজ্ঞাপনে দেখতে পাওয়া যায়, আর কলকাতার দু-একটা দোকানে।

স্বাতি আর কোন কথা বলল না। কিন্তু আমার ভাবনা শেষ হল না। বিষ্ণুপুরের মন্দিরের কথাই আমি ভাবতে লাগলুম। এখানকার মন্দির-স্থাপত্যের কথা। যে সব মন্দির দেখেছিলুম তার আকার-আকৃতি আমি ভুলে যাই নি। বাঙলার কুঁড়ের মতো আকার দেখেছি, দেখেছি চার চালার উপরে উঁচু শিখরযুক্ত মন্দির। জোড়-বাঙলার মন্দিরটিও মনে আছে --পাশাপাশি সংলগ্ন দুটি কুঁড়ের মাঝে ছোট একটি শিখর। আর পঞ্চরত্ন মন্দির পাঁচটি শিখরবিশিষ্ট।

মল্লরাজারা অষ্টম শতাব্দীতে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথ নিজে একজন মল্লবীর ছিলেন বলেই বোধহয় আদিমল্ল উপাধি পেয়েছিলেন আদিবাসী রাজার কাছে। মল্ল শকের প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু সে যুগে কোন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায় না। যতদূর জানি বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর শিবের মন্দিরটিই সব চেয়ে পুরনো। ১৬২২ বা ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল শৈব বীর সিংহের আমলে। বীর হাম্বীর বৈষ্ণব হবার পরে অনেক বিষ্ণুমন্দির তৈরি হয়। তখন মদনমোহন হলেন রাজাদের কুলদেবতা। কিন্তু মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল এই শতাব্দীর শেষের দিকে। ইঁটের তৈরি এক রত্ন-মন্দির বাঙলার নিজস্ব রীতিতে তৈরি। লালজীউ ও রাধেশ্যামের মন্দিরও একই রকমের। কিন্তু ইঁটের বদলে লেটেরাইট পাথরে তৈরি। এই পাথরকে বোধহয় মাকড়া পাথর বলে। গ্রামের পথে এগিয়ে যেতে যেতে এই ধরনের আরও অনেক পুরনো মন্দির

দেখেছিলুম। দু-একটি নাম মনে আছে—নন্দলাল মন্দির, আর পথের শেষপ্রান্তে কালাচাঁদ মন্দির। পঞ্চরত্নের নমুনা হল শ্যামরায় ও মদনগোপালের মন্দির। একটি ইঁটের ও অপরটি মাকড়া পাথরের।

রাসমঞ্চের কথাও আমি ভুলি নি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটি চতুষ্কোণ গৃহ, তার শিখর হল ত্রিকোণ পিরামিডের মতো। মাটির উপরে উঁচু ভিৎ আছে, আর পাশাপাশি দশটি প্রবেশ দ্বার। দ্বারের উপরে মন্দিরের মতো চূড়া। শুনেছিলুম যে বীর হাম্বীর এই মঞ্চটি নির্মাণ করেছিলেন রাসযাত্রা উৎসবের জন্যে। বিষ্ণুপুরের সমস্ত মন্দির থেকে সে সময় কৃষ্ণের সমস্ত বিগ্রহ এনে এইখানে রাখা হত।

মনে আছে যে জোড়বাঙলার মন্দিরটি দেখতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। দূরে দাঁড়িয়ে মন্দিরটি দেখলেই মন ভরে না। ভিতরে দেবতাও নেই যে সেখানে সময় লাগবে। মন্দিরটি দেখতে হয়েছিল দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে। এমন সুন্দর সূক্ষ্ম পোড়া-মাটির কাজ এর আগে আমি দেখি নি, পরেও না। দেওয়াল ও থামের গায়ে উপরে নিচে এত সব চিত্র উৎকীর্ণ আছে যে সেখান থেকে চোখ ফেরানো যায় না। একটি নৌযুদ্ধের চিত্র আছে। শোনা যায় তা নাকি যবদ্বীপে বোরোবুদুর মন্দিরের মতো।

দুর্গের পাশ দিয়ে যাবার সময় রিক্সাওয়ালা আমাদের গুম ঘর দেখিয়েছিল। রাজার বিচারে শাস্তি হলে সেইখানে বোধহয় মানুষকে গুম করে দেওয়া হত। কী ভাবে সেই কাজ করা হত, সে কথাও বলেছিল রিক্সাওয়ালা। কিন্তু আজ তা মনে পড়ছে না।

তার বদলে রাধেশ্যামের মন্দিরের কথা মনে পড়ছে। বিষ্ণুপুরের সব মন্দিরে এখন দেবতার বিগ্রহ নেই। বিগ্রহগুলি এই রাধেশ্যামের মন্দিরে এনে রাখা হয়েছে। নিত্যপূজা হয় এই মন্দিরে।

মদনমোহনের মন্দিরেও বিগ্রহ আছে। নিত্যপূজা হয়। কিন্তু সে নাকি নকল মদনমোহন। আসল মদনমোহন আছেন কলকাতার বাগবাজারে। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন কী করে বাগবাজারে গেলেন সে গল্পও শুনেছিলুম। অর্থাভাবে রাজা দামোদর সিংহ কলকাতার গোকুল মিত্রের নিকট এক লক্ষ টাকায় বিগ্রহ বাঁধা রেখেছিলেন। বিষ্ণুপুর রাজ্যের তখন শেষ অবস্থা। রাজার দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। তবু অনেক চেষ্টা করে রাজা তাঁর কুল-দেবতাকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করলেন। মন্ত্রীকে টাকা দিয়ে কলকাতায় পাঠালেন। গোকুল মিত্র টাকা নিলেন, কিন্তু বিগ্রহ ফেরত দিলেন না। মামলা হল সুপ্রীম কোর্টে। হেরে গিয়ে গোকুল মিত্র নকল মদনমোহন দিলেন বিষ্ণুপুরের রাজাকে। আসল মদনমোহন নাকি বাগবাজারেই প্রতিষ্ঠিত রইলেন। এ হল গল্প। সত্য না মিথ্যা, তা মদনমোহনই জানেন।

সেদিন বিষ্ণুপুর আমার কাছে একটি অনাদৃত গ্রাম বলে মনে হয়েছিল। বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটি-কামারপুকুর যাবার চেষ্টা করে জেনেছিলুম যে বাস আসে বাঁকুড়া থেকে। সে বাস বিষ্ণুপুরের উপর দিয়ে যায়। বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, তা না হলে বাঁকুড়ায় গিয়ে এই বাস ধরতে হবে। ট্রেনে চেপে বাঁকুড়ায় গিয়েছিলুম। কিন্তু খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে ট্রেনেই ফিরে আসতে হয়েছিল।

বিষ্ণুপুরে তখন থাকার জায়গা খুঁজে পাই নি। ভাল খাবার জায়গারও অভাব দেখেছি বলে মনে পড়ছে। এখন আর নাকি সে সবের অভাব নেই। সরকারী টুরিস্ট লজ হয়েছে, ডর্মিটরি ও অন্যান্য ব্যবস্থা। হোটেলও আছে শুনছি। বিষ্ণুপুরকে কেউ গ্রাম বলে না, বলে শহর। কিন্তু টুরিস্টের কাছে এই শহর এখন কত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে জানি না।

আমরা বিষ্ণুপুরে যাচ্ছি না। যাচ্ছি সমুদ্রের ধারে দীঘায়।

২৮

কেন জানি না আমার মনে হচ্ছিল যে উমাশঙ্করের মন আজ ভাল নেই। খুব কম কথা বলছিল, আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও নয়। কিন্তু এই দীঘায় যাবার কথায় সে-ই সব চেয়ে বেশি খুশী হয়েছিল, বলতে গেলে লাফিয়ে উঠেছিল এই প্রস্তাবে। অবশ্য এ কথাও মনে পড়ল যে পপিকে নিয়ে একা যাবার ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু পপির পরামর্শেই আমাদের সঙ্গে নিতে হয়েছে। তা না হলে পপির বাবা-মা নাকি দুজনকে একা যেতে দিতে চাইতেন না। পপি যে স্বাতির সঙ্গে যাচ্ছে, এ কথাও প্রমাণ করেছে তাদের বাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমে স্বাতি গিয়ে তাকে ডেকে এনেছে। এ সবই তাদের কৌশল। কিন্তু তবু উমাশঙ্কর কেন মনমরা হয়ে আছে বুঝতে পারছি না।

স্বাতির কথাও মনে হল। আমার দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে সে দিল্লী থেকে ছুটে এসেছে দার্জিলিঙে। তার পর থেকেই এক সঙ্গে আছে। মামা মামী কী ভেবে তাকে ছেড়ে দিলেন জানি না। মামার কথা জানি। তাঁর মত উদার। অন্তত এই ব্যাপারে। কিন্তু মামীর দুর্ভাবনার কথাও তো আমি জানি। প্রতি পদক্ষেপে তিনি ভয় পেতেন। আজ কী মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন জানি না। স্বাতির উপরে তাঁর বিশ্বাস কি বেড়েছে! না, স্বাতিকে স্বাধীনতা দিতে তিনি বাধ্য হয়েছেন!

সহসা পপিকে আমি উসখুস করতে দেখলাম। মনে হল তার হাতের ব্যাগটা সংগ্রহ করে সেটা খুলল। তারপরেই দেখলাম যে একমুঠো টফি বার করে পিছনে স্বাতির দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল: একটা মুখে দে।

আমার দিকেও এগিয়ে দিল। তারপরে একটার কাগজ খুলে উমাশঙ্করের মুখে পুরে দিল। নিজের মুখেও পুরল একটা। বুঝতে পারলুম যে চুপ করে বসে থাকতে তার বিরক্তি বোধ হচ্ছে। তাই সময় কাটাতে চাইছে মুখ চালিয়ে।

এক সময়ে উমাশঙ্করকে আমি বললুম: বিশ্রামের দরকার থাকলে আমরা কোন চায়ের দোকানে বসতে পারি।

পপি যেন আঁৎকে উঠে বলল: পথের ধারের এই সব চায়ের দোকানে!

আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলুম। তাই কোন উত্তর দিলুম না। কিন্তু পপি প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলল: হরিব্ল্।

স্বাতি বলল: চায়ের দোকানে কেন চা খাবে! পছন্দমতো একটা গাছতলায় দাঁড়ালেই সে ব্যবস্থা করা যাবে।

উমাশঙ্কর আশ্চর্য হয়ে বলল: গাছতলায় চা!

স্বাতি বলল: গাছতলার চা নয়।

তবে?

আমি চেয়ে দেখলুম যে স্বাতির সঙ্গে কোন ফ্লাস্ক নেই। অথচ কেন সে এ কথা বলল তা বুঝতে পারলুম না।

উমাশঙ্কর তখনি দাঁড়াল না। রূপনারায়ণের উপরে নতুন পুল পেরিয়ে গিয়ে একটা পছন্দমতো জায়গায় দাঁড়াল। রাস্তার পাশে বেশ একটুখানি ছায়া, কিন্তু কাছাকাছি কোন দোকানপাট নেই। স্বাতির দিকে ফিরে বলল: এইবারে আপনার ম্যাজিক দেখব।

উমাশঙ্করের কথা শুনেই স্বাতি নেমে পড়ল। বলল: আপনার গাড়ির বুট খুলতে হবে।

বলে পিছনে চলে গেল।

স্বাতির সঙ্গে কী জিনিসপত্র ছিল, আমি তা মনে করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু তার আগেই স্বাতি একটা বড় ফ্লাস্ক বার করে

আনল। উমাশঙ্কর গাড়ির পিছনটা বন্ধ করে এসে বলল: পাকা গিন্নী। ব্যাগের মধ্যে লুকনো ছিল এই ফ্লাস্ক।

দুটো ঢাকনা ছিল ফ্লাস্কে। সেই ঢাকনায় চা ঢেলে স্বাতি একটা উমাশঙ্করের হাতে দিল, আর একটা দিল পপির হাতে। আমাকে বলল: সন্দেশের বাক্সটা খোলো।

উমাশঙ্কর একটু ইতস্তত করে বলল: কিন্তু আপনারা খাবেন কিসে?

স্বাতি বলল: তার জন্যে ভাবনা নেই। চা দিয়েই কাপ ধুয়ে নেওয়া যাবে।

পপি তার চায়ে চুমুক দিয়ে বলল: এখান থেকে দীঘা কত দূর?

উত্তর দিল উমাশঙ্কর, বলল: খড়্গাপুর থেকে আটাত্তর মাইল জানি। খড়্গাপুর এখান থেকে কত দূরে তা বলতে পারব না।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম: পথের হিসেব শুনলে খুব উৎসাহ পাওয়া যাবে না। হাওড়া-খড়্গাপুরের মাঝপথে হল এই কোলাঘাট। আমরা মাইল পঁয়ত্রিশেক এসেছি।

তারপরেই বললুম: এর পরেই মেচাদা। তমলুকে যেতে হলে মেচাদায় বাস ধরতে হয়। তমলুক আউট এজেন্সির বাস পাঁশকুড়া মেচাদা হয়ে তমলুকে যায়। তমলুক থেকেও দীঘা যাওয়া যায়।

আমরা সে পথে যাচ্ছি না কেন?

বলে স্বাতি উমাশঙ্করের দিকে তাকাল।

উমাশঙ্কর তখন একটা গোটা সন্দেশ মুখে পুরেছিল। সেটা সামলে নিয়ে কোন রকমে বলল: মানে, ওদিক দিয়ে যে যাওয়া যায়—

আমি বললুম: ও পথও ভাল বলে শুনেছি। এই মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি নামে একটা শহর আছে। সমুদ্রের কাছাকাছি। তমলুক থেকেই যেতে হয়। আবার খড়্গাপুরের পরে কণ্টাই রোড স্টেশনে নেমেও কাঁথি আসা যায়। কাঁথির ওপর দিয়ে দীঘা যেতে হয়।

পপির মনোযোগ এদিকে ছিল না। কিন্তু উমাশঙ্কর বলল: তাই নাকি!

বললুম: খড়্গপুর গেলে আমাদের কণ্টাই রোডে এসে কাঁথির পথ ধরে দীঘা যেতে হবে। তমলুক হয়ে গেলে বোধহয় পথও অনেক সংক্ষেপ হয়।

স্বাতি কোন কথা না বলে উমাশঙ্করের মুখের দিকে তাকাল। আর উমাশঙ্কর ভয়ে ভয়ে বলল: তমলুকের নামে আমার একটা – মানে –

বলুন।

মানে ভয় আছে।

কেন?

মানে সে এক বীভৎস অভিজ্ঞতা।

পপি এইবারে সচেতন হয়ে বলল: তুমি সেখানে গিয়েছিলে নাকি?

গিয়েছিলুম বৈকি। তখন একটা ওষুধের ফার্মে— মানে-

বলেই উমাশঙ্কর থেমে গেল। আমি হেসে বললুম: বুঝেছি।

বুঝবেন বৈকি। ডাকবাংলোয় জায়গা না পেয়ে উঠেছিলুম একটা নাম-করা হোটেলে। তার পরে যে অভিজ্ঞতা হল--মানে বমি। তার পরে তো মনে হল কলেরাই হয়েছে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: হোটেলের খাবার খেয়ে?

তা হলে তো সবারই হত। আমার একার হল কেন!

তবে?

এলার্জি। ডাক্তার বলেছিলেন, নোংরামি দেখে এলার্জি হয়েছিল। একটা ট্যাক্সি নিয়ে পালিয়ে এসেছিলুম।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম: কী দেখেছিলেন তমলুকে?

একটা পুরনো মন্দির, আর ভাঙা রাজবাড়ি একটা।

স্বাতি বলল: কোন্ রাজার বাড়ি?

তা বলতে পারব না।

তারপরেই বলল : আসুন, আপনার ফ্লাস্কটা তুলে রাখা যাক।

চা খাওয়া আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। গাড়ির পিছনে ফ্লাস্ক তুলে রেখে আবার আমরা যাত্রা করলুম। তমলুকের দিকে নয়, খড়্গাপুরের দিকে।

তমলুক আজ একটি অনাদৃত স্থান। উমাশঙ্কর তাই এই তমলুকের নামে নাক সিঁটকে অবহেলায় তাকে পাশ কাটিয়ে গেল। কিন্তু পুরাকালে কোন যাত্রী এ রকম করতে পারত না। জাহাজে করে বিদেশ থেকে এসে তমলুকেই অনেক যাত্রীকে নামতে হত। চীনা যাত্রী আই-সিং সপ্তম শতাব্দীতে এই বন্দরে এসেই নেমেছিলেন। ফা হিয়েন হিউএন চাঙ এসেছিলেন এখানে। কোরিয়ার হুয়েন লুনও এসেছিলেন। সম্রাট অশোকের তৈরি স্তূপ ছিল এইখানে। বৌদ্ধ বিহার ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগেই এই স্থানের খ্যাতি পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তখন তার নাম তমলুক ছিল না। নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে তাম্রলিপ্তের নাম আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

বেদে এ নাম নেই, রামায়ণেও নেই। অনেকে তাই মনে করেন যে রামায়ণের কালে এ অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে ছিল। আবার অনেকে বলেন, তা নয়। তাম্রলিপ্ত সে যুগে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল বলেই তার স্বতন্ত্র উল্লেখ নেই রামায়ণে। কিন্তু মহাভারতের নানা স্থানে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। সভাপর্বে দেখতে পাই যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীম তাম্রলিপ্তের রাজাকে জয় করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। দ্রোণ পর্বে তাঁকে ম্লেচ্ছদের রাজা বলা হয়েছে। এ কথা কেন প্রচলিত হয়েছিল তারও একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তমসা মানে অজ্ঞানতা বা অন্ধকার লিপ্ত থেকে নাকি তাম্রলিপ্ত নামের উৎপত্তি। তার মানে এ দেশের লোক পাপে লিপ্ত হত,

কিংবা ধর্ম মানত না বলেই ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হয়েছিল। মহাভারতের দ্রোণ পর্বেই আবার দেখা যায় যে পরশুরামের হাতে নিহত হয়েছিল তাম্রলিপ্তের ক্ষত্রিয়রা। এ হল সত্যযুগের কথা। সত্যযুগে তাম্রলিপ্তে ক্ষত্রিয় ছিল, ম্লেচ্ছ ছিল না।

একটি গল্প আছে কাশীরামদাসের মহাভারতে। মূল মহাভারতে এ গল্প নেই, আছে জৈমিনি ভারতে। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় তাম্রলিপ্তের রাজা ছিলেন ময়ূরধ্বজ। তাঁর পুত্র তাম্রধ্বজ যজ্ঞের অশ্ব বেঁধে কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জুন পরাজিত ও মূর্ছিত হলেন। এই সংবাদ পেয়ে হরিভক্ত রাজা তাঁর পুত্রকে ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু সংজ্ঞা লাভের পর কৃষ্ণ ও অর্জুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এলেন রাজার কাছে। বললেন, তোমার এক পুত্র এখন সিংহের মুখে, তাকে ফিরে পেতে হলে তোমার অর্ধেক শরীর দান করতে হবে। রাজা বললেন, তথাস্তু। স্ত্রী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজকে বললেন, আমাকে দ্বিখণ্ড কর। রাজার আত্মত্যাগে মুগ্ধ হলেন কৃষ্ণ। আর কৃষ্ণের স্বরূপ দেখে রাজা তাঁর রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করলেন। তমলুককে জৈমিনি বলেছেন রত্নগড়, আর রত্নাবতীপুর বলেছেন কাশীরামদাস।

এই গল্পে যা প্রমাণ হচ্ছে তা হল মহাভারতের কালে বাঙালীর বাহুবল দানশীলতা ও ধর্মানুরাগ। রাজা ময়ূরধ্বজের পরে ময়ূরবংশের রাজারা তাম্রলিপ্তে রাজত্ব করেছিলেন অনেক দিন। এই বংশের শেষ রাজার নাম হল নিঃশঙ্কনারায়ণ। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে তাম্রলিপ্তের রাজা হয়েছিলেন কালু ভুঁইয়া নামে একজন সর্দার। তিনিই তমলুকের কৈবর্ত বংশের আদি-পুরুষ। তারপরে কায়স্থ রাজারা তমলুকে রাজত্ব করেছেন।

আমরা মেচাদা স্টেশন পাশে ফেলে সোজা এগিয়ে গেলুম, দক্ষিণে তমলুকের পথ ধরলুম না। এমনি করে পাঁশকুড়া স্টেশনও

পেরিয়ে খড়্গপুর পৌঁছব। কিন্তু আমার মন পড়ে রইল তমলুকের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে।

তাম্রলিপ্তের নামে পুরাণের গল্পও শুনেছি। কল্কি অবতারে যুদ্ধক্লান্ত বিষ্ণুর দেহ থেকে এক ফোঁটা ঘাম পড়ায় এই জায়গা তাম্রলিপ্ত নামে পবিত্র হয়েছে। পুরনো সংস্কৃত গ্রন্থ দিগ্বিজয় প্রকাশে এর নামমাহাত্ম্য নিয়েও একটি গল্প আছে—সূর্য যেখানে সমুদ্রে লিপ্ত হয়েছেন, সেই তীর্থের নাম তাম্রলিপ্ত। কপালমোচন এর অন্য নাম। দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পরে শিবের পাপক্ষালন হয়েছিল তাম্রলিপ্তের বর্গভীমা ও জিষ্ণুনারায়ণের মন্দিরের মাঝে এক জলাশয়ে স্নান করে।

অভিধান চিন্তামণিতে তমলুকের আরও অনেক নাম আছে। কল্কিরূপী বিষ্ণুর নামে বিষ্ণুগৃহ। সমুদ্রের কূলে অবস্থিত ছিল বলে নাম হয়েছিল বেলাকূল। এই প্রসঙ্গে আরও একটি নাম মনে পড়ছে। এক সময় নাকি দীঘার নাম ছিল বীরকুল। বড়লাট হেস্টিংস সাহেবের লেখাতেই এই নাম পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও তমোলিপ্তি তামলিপ্তি দমলিপ্ত তমালিকা তমালিনী প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়।

অনেকে মনে করেন যে উত্তরে দ্রাবিড় সভ্যতার শেষ ঘাঁটি ছিল তাম্রলিপ্ত। আর তামিল শব্দটি এই তাম্রলিপ্ত থেকেই এসেছে। আর্যরা ঈর্ষায় এই দ্রাবিড়-সভ্যতার রাজ্য ও প্রধান নগরকে তমোলিপ্ত ও দেশবাসীকে ম্লেচ্ছ বলেছেন। কল্কি অবতারে বিষ্ণু এই দৈত্য বা ম্লেচ্ছ জাতিকে বিতাড়িত করার পরেই বিষ্ণুগৃহ নাম রাখেন। সে নাম স্থায়ী হয় নি। পুরনো তাম্রলিপ্ত নামই আবার আমরা উদ্ধার করেছি।

কিন্তু এ সবই পুরাণের কথা। এ সব কথায় আমাদের বিশ্বাস কম। আমরা ইতিহাসে বিশ্বাস করি—বিদেশীদের লেখা ইতিহাসে। সে ইতিহাসেও তাম্রলিপ্তের কথা আছে। টলেমি বলেছেন তমা-

লাইটেস, আর মেগাস্থিনিসের কথায়—তলাক্তি। তারপরে চীনা পরিব্রাজকেরা এসেছেন একে একে। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা হিয়েন এসে বললেন, তা-মো-লি-তি গঙ্গার মোহনায় একটি সমৃদ্ধ বন্দর। চব্বিশটি সংঘারাম ও বহু বৌদ্ধের বাস ছিল সেখানে। বছর দুয়েক এইখানে কাটিয়ে সিংহলে যাবার জন্যে তিনি এই বন্দরেই জাহাজে চড়েছিলেন, আর চোদ্দ দিন চোদ্দ রাত পরে পৌঁছেছিলেন সিংহলে। একদা এই বন্দর থেকেই বিজয় সিংহ তাঁর বিজয়-সেনানী নিয়ে লঙ্কা জয়ের অভিযান করেছিলেন। আর সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বোধিবৃক্ষের চারা নিয়ে সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে গিয়েছিলেন।

হিউএন চাঙ এসেছিলেন ফা হিয়েনের দু শো বছর পরে। তান-মো-লি-তিকে তিনি সমুদ্রের ধারে দেখেছিলেন। বন্দরের সমৃদ্ধি ও মুক্তার ব্যবসাও দেখেছিলেন। আর দেখেছিলেন দশটি সংঘারাম ও পঞ্চাশটি হিন্দু মন্দির।

এই সব বিবরণ পড়ে মনে একটা খটকা লাগে। বর্তমান তমলুক গঙ্গার মোহনায় নয়, সমুদ্রের ধারেও নয়। তমলুক রূপনারায়ণের তীরে। এই রূপনারায়ণ মাইল বারো দূরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। তাই দেখে কানিংহাম সাহেব বলেছেন, প্রাচীন তাম্রলিপ্ত ও বর্তমান তমলুক একই স্থান। তমলুকের মাটি খুঁড়ে পুরাকালের তাম্রলিপ্তের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে।

পাঁশকুড়া কখন পেরিয়ে গিয়েছি—খেয়াল করি নি। গাড়িতে কেউই কথা বলছিলুম না। হঠাৎ স্বাতির কথায় তার দিকে ফিরে তাকালুম। স্বাতি বলল: তুমি কি তমলুকের কথাই এখনও ভাবছ?

হেসে বললুম: করার মতো কাজ আর কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

পপি আমাদের কথা শুনতে পেয়েছিল। বলল: কেন, চোখ বুঁজে একটু ঘুমিয়ে নিতে তো পারেন!

বললুম: চোখ বুঁজলেই সুকুমারের কথা মনে পড়ে যাবে।

সে কে ?

আমার এক নবীন বন্ধু।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : কই, তার কথা তো তোমার কাছে কখনও শুনি নি !

বললুম : শুনবে কী করে ? তার সঙ্গে তো এখনও দেখাই হয় নি।

তবে তাকে বন্ধু বলছ কেন ?

চিঠির বন্ধু। আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল, এ পথে এলে যেন তাকে একটা খবর দিই। যত্ন করে তমলুক আমাকে সে দেখিয়ে দেবে—মহাভারতের যুগের তাম্রধ্বজ রাজার রাজবাড়ি—

উমাশঙ্করও যে আমাদের কথায় কান রেখেছিল তা বুঝতে পারলুম তার কথা শুনে। পরম বিস্ময়ে বলে উঠলেন : বলেন কি !

বললুম : সেই ইঁটের বাড়ি এখন ভেঙে পড়েছে, আর আগাছায় ভরে গেছে চারি দিক।

তারপর ?

বর্গভীমার মন্দির, মহাপ্রভুর মন্দির। আর পাশেই ময়নাগড়ে লাউসেনের রাজবাড়ি। লাউসেনের নাম শুনেছ তো ?

বলে আমি স্বাতির দিকে তাকালুম।

স্বাতি অসঙ্কোচে বলল : না।

বললুম : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে আমরা যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পরিচয় পাই, সেই কাব্যের নায়ক লাউসেন ছিলেন ময়নার রাজা। রাজবাড়ির চারি দিকে পরিখা খুঁড়ে তিনি বর্গীর আক্রমণ রোধ করেছিলেন। তমলুক থেকে বাসে চেপে আধ ঘণ্টার পথ এগিয়ে গেলে মহিষাদলের প্রাচীন রাজবাড়িও দেখা যায়। আর—

বল।

পাঁশকুড়ার কাছেও নাকি একটি সুন্দর প্রাচীন মন্দির আছে।

সামনে থেকে উমাশঙ্কর বলল : এ সব কথা আগে বললেন না কেন ?

বললুম : পুরাকালের নিদর্শন দেখতে সকলের ভাল লাগে না। তাদের ভাল লাগবে আরও কিছু এগিয়ে হলদিয়ার নতুন বন্দর।

নূতন তাম্রলিপ্তের পত্তন হচ্ছে হলদিয়ায়।

স্বাতি নীরবে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে বলল : বর্গভীমার মন্দিরের সম্বন্ধে কিছু বলবে না ?

বললুম : শোনা কথা বলতে পারি।

তাই বল।

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম : অনেকে উপপীঠ বলেন, কিন্তু সত্যি কিনা জানি না। বর্গভীমা কালীর উগ্র রূপ। তাঁর ভৈবব ভূতিনাথ। দেবী জাগ্রত বলে সকলের বিশ্বাস। কালাপাহাড় নাকি এই দেবীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ধ্বংসের কথা ভুলে গিয়ে ফার্সিতে এক দলিল লিখে দিয়ে গেছেন। মারাঠা বর্গীরাও তমলুকে এসে অত্যাচারের কথা ভুলে যেত। পূজা করত বর্গভীমার।

শুনেছি একটা উঁচু জায়গায় এই মন্দির। ধাপে ধাপে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের দরজায় পোঁছতে হয়। বাঙলার স্থাপত্য নেই মন্দিরে, বরং উড়িষ্যার মন্দির-শৈলী লক্ষ্য করা যায়। লোকে বলে বিশ্বকর্মার তৈরি।

একটা কিংবদন্তীর কথাও আমার মনে পড়ল। ধনপতি সদাগর একজন লোকের হাতে একটি সোনার ভৃঙ্গার দেখতে পেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলেন যে এখানকার এক কুণ্ডের জলে পিতল ডোবালে সোনা হয়। সদাগর অমনি বাজারের সব পিতলের বাসন কিনে জলে ডুবিয়ে সোনার বাসন করলেন। তারপরে সিংহলে গিয়ে সেই বাসন বিক্রি করে আনলেন টাকা। সেই টাকায় দেবীর মূর্তি তৈরি করে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন।

কিন্তু এ গল্প আমি গাড়িতে বললুম না। এ গল্প সবাই বিশ্বাস করবে না।

৩০

খড়্গাপুরে আমরা উমাশঙ্করের প্রয়োজনে দাঁড়ালুম। একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল: গাড়িকে একটু জল খাওয়ানো যাক।

বলে গাড়ির বনেট খুলে দিল।

পাশের একটা দোকানে আলুকাবলির মতো খাবার দেখে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: খুব বেশি নোংরা নাকি?

আমি বললুম: এটুকু নোংরা না হলে স্বাদ ভাল হয় না।

পপি বলল: কী বল্ তো?

আঙুল দিয়ে স্বাতি দোকানটা দেখাল। আর পপি আঁৎকে উঠে বলল: হরিবল্!

কিন্তু স্বাতি ভ্রূক্ষেপ না করে আমাকে বলল: এস।

গাড়ি থেকে নেমে উমাশঙ্করকেও নিমন্ত্রণ জানাল নিঃশব্দে। কিন্তু পপি গাড়িতে বসেই এমন একটা কটাক্ষ করল যে উমাশঙ্কর এক কাপ গরম চা খাবারও সাহস পেল না। আলুকাবলি খেলুম আমরা দুজনে। তারপরে ফিরে এসে স্বাতি বলল: কোকাকোলায় গলাটা ভিজলে ভাল লাগবে।

উমাশঙ্কর তার গাড়িকে জল খাইয়ে এই রকমেরই একটা আদেশের অপেক্ষা করছিল। মুহূর্তের মধ্যে কোকাকোলা এনে হাজির করল।

গাড়ি চালাতে বসে উমাশঙ্কর বলল: আর ভাবনা নেই। অর্ধেক পথ আমরা পেরিয়ে এসেছি। এবারে সোজা দীঘায় গিয়ে থামব।

খড়্গাপুরে আমরা রেলের কারখানা দেখলুম না, ইণ্ডিয়ান

ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনলজিও না। দোকানে জিজ্ঞাসা করে উমাশঙ্কর দীঘার পথের হদিশ জেনে নিয়েছিল। দেখতে দেখতেই শহর ছাড়িয়ে সেই পথেই অনেকটা এগিয়ে এল। বেশ ভাল পথ, যানবাহনও বেশি নয়। খুব দ্রুত এগিয়ে চলল দীঘার দিকে।

পপি বলল: এই জার্নিটা বেশ টিডিয়স।

স্বাতি বলল: পথের আনন্দও আছে।

গরম লাগছে না?

বলে পপি তার ছোট রুমাল দিয়ে গলা ও ঘাড়টা মুছল।

স্বাতি তার কপালের চুল সরিয়ে বলল: বাতাসও লাগছে।

আমি বেশ সতেজ বোধ করছিলুম। সরকারী পুস্তিকায় দীঘার সম্বন্ধে যে নতুন কথা পড়েছিলুম, তা মনে পড়ে গেল। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে আমরা দীঘার নাম শুনছি। ভাবছি যে স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায় বুঝি কল্যাণী ও বিধাননগরের মতো দীঘাও আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি যে দীঘা আবিষ্কার করেন নি তা জানা যায় বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের লেখা পড়ে। সিড্‌নি গ্রিয়ার নামে এক ভদ্রলোক 'দি লেটার্স অব ওয়ারেন হেস্টিংস টু হিজ ওয়াইফ' নামক বইএ প্রকাশ করেছেন যে বীরকুল নামে একটি জায়গাকে বড়লাট ব্রাইটন অফ দি ঈস্ট বলেছেন। বলেছেন চমৎকার স্বাস্থ্যকর জায়গা, মাছধরা ও শিকারের জায়গা আছে আশেপাশে। সেখানকার সমুদ্রসৈকতে যানবাহন চলবার অতি সুন্দর পথ আছে, আরও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে লোকজনও যাচ্ছে অনেক। দু শো বছর আগে তিনি লিখেছিলেন যে সম্ভ্রান্ত লোকের থাকবার ও মনোরঞ্জনের জন্যে কিছু ঘরবাড়ি তৈরির প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান দীঘা হল এই বীরকুল পরগণায়। ওয়ারেন হেস্টিংস নিজের জন্যে এখানে একটি বাড়িও তৈরি করেছিলেন। কলকাতা থেকে জনসাধারণ কী ভাবে এখানে আসত তা জানা যায় না, কিন্তু

১৮২৩ সালের পরে এই দীঘা যে পরিত্যক্ত হয়েছিল তা জানা গেছে। এখন আবার নতুন করে গড়ে উঠছে দীঘা।

বাঁধানো সড়ক ধরে আমরা বেগে ছুটে চলেছি। সকালের বাতাস এখন অনেক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের ধারে হয়তো উত্তাপ আরও বাড়বে। সেই আশঙ্কা করে পপি বলল: সমুদ্রের ধারে এখন কেমন লাগবে কে জানে!

উমাশঙ্কর উত্তর দিল: এ সময়ে আমাদের ঘরে এসে ঢুকতে হবে।

স্বাতি বলল: এমন জায়গায় আমরা উঠব যে ঘরে বসেই যেন সমুদ্র দেখতে পাই।

তারপরেই বলল: অনেক দিন সমুদ্র দেখি নি, তাই না?

আমি প্রতিবাদ করে বললুম না যে গত দু বছরে আমরা ভারতের নানা স্থানে সমুদ্র দেখেছি। শুধু বঙ্গোপসাগর নয়, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরও দেখেছি।

কখনও আমরা এমনি টুকরো কথা বলে সময় কাটাচ্ছি, কখনও বা চোখ বুঁজে নিঃশব্দে চলেছি অনেকক্ষণ। উমাশঙ্কর অক্লান্ত ভাবে গাড়ি চালিয়ে চলেছে। আমি গাড়ি চালানো জানলে তাকে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলতে পারতুম। কিন্তু তা সম্ভব নয় বলে সে কথা আর বললুম না। কণ্টাই রোড স্টেশন ছেড়ে গিয়েছিলুম অনেকক্ষণ আগে। এবারে কাঁথি শহরেই পৌঁছে গেলুম। বাজারের মধ্য দিয়ে পথ কয়েক মাইল এগিয়েই সমুদ্রের ধারে পৌঁছেছে। তারই নাম দীঘা।

উমাশঙ্কর একবার পপির মুখের দিকে তাকাল।

আর পপি বলল: তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল।

আমি বললুম: একটু বিশ্রাম নেবেন না?

না না, গরমে ঘেমে উঠেছি আমি।

বলে পপি উমাশঙ্করকে থামতে দিল না।

তারপরে বাজার পেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে পৌঁছে বলল: একটা ভাল জায়গায় দুখানা ঘর নিতে হবে। কাল ব্যবস্থা করে এসেছ তো?

উমাশঙ্কর একটু বিব্রত ভাবে বলল: মানে—

মানে বুঝেছি।

না না, মানে—

মানে কোন ব্যবস্থাই কর নি। আসবার ইচ্ছা তো ছিল না, তাই ঠিকই করেছ।

পাশ থেকে উমাশঙ্করের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। সে কী বলবে বোধহয় ভেবে পেল না। অভিযোগটা তাই তাকে মেনে নিতে হল। স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল। এ হাসির অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। উমাশঙ্করের অবস্থা দেখে হাসছে, না পপির ব্যবস্থার কথা ভেবে, সে তা বুঝতে দিল না। আমি জানি যে একখানা ঘরে পপিদের হয়তো চলবে, কিন্তু স্বাতির চলবে না। সে আমাকে তার ঘরে স্থান দেবে না। না দেওয়াই উচিত। তার ব্যবস্থায় আমি এত দিন প্রতিবাদ করি নি। প্রতিবাদ করার ইচ্ছাও হয় নি। বরং তার ব্যবস্থা মেনে নিয়ে আনন্দ পেয়েছি মনে। জীবনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও সে আনন্দ আমার অক্ষয় হয়ে থাকবে। শেষের কবিতার সেই দুটি ছত্র আমার মনে পড়ে গেল—

বিস্মৃতি প্রদোষে হয়তো দিবে সে জ্যোতি
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হারা স্বপ্নের মূরতি।

সহসা মনে হল যে স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি সামলে নিলুম নিজেকে।

দেখতে না দেখতেই আমরা দীঘার লোকালয়ের ভিতরে এসে পৌঁছে গেলুম। রাস্তার ধারের একটা বড় বাড়ির গেটের ভিতরে উমাশঙ্কর ঢুকে পড়ল। বাড়ির বাইরেটা দেখেই পপি খুশী হয়ে উঠল। বলল: ভেতরের ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই ভাল হবে।

সত্যিই ব্যবস্থা ভাল। কিন্তু ঘরের জন্যে বচসা হল খানিকটা। কলকাতা থেকে ব্যবস্থা করা হয় নি কেন, কেন আগাম টাকা জমা দেওয়া হয় নি, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই উমাশঙ্কর প্রায় কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলেছিল। স্বাতির মধ্যস্থতায় ব্যবস্থা হল। বলল: বেশি দিন আপনাদের জ্বালাব না। মাত্র এক দিন। আগাম টাকা এইখানেই জমা করে দিচ্ছি।

পপি আশ্চর্য হয়ে বলল: মাত্র এক দিন!

স্বাতি বলল: উনিও তো ছুটি পান নি, কাল আমাদের ফিরে যাওয়াই উচিত।

উমাশঙ্কর যেন কৃতার্থ হল এই কথা শুনে। কিন্তু কোন কথা বলার সাহস পেল না। কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষেপে উঠল আর একটা কথা শুনে। ঘরের জিনিসপত্রের জন্যে নাকি কসান মানি জমা রাখতে হবে। তা ফেরত পাওয়া যাবে যাবার সময়।

কী, আমরা কি চোর!

বলে গর্জে উঠেছিল উমাশঙ্কর। কিন্তু স্বাতি তার আগেই তার ব্যাগ খুলে টাকা বার করে দিয়েছিল। আর পপি চেঁচিয়ে উঠেছিল, করছ কী! টাকা বার করবে, না ঝগড়া করবে!

কিন্তু উমাশঙ্কর টাকা দেবার আর সুযোগ পেল না। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল: এখানে আপনি আর কোন খরচা করতে পারবেন না। কথা দিন আমাকে।

স্বাতি কোন কথা না দিয়ে শুধু হাসল।

জিনিসপত্র নিয়ে আমরা নিজেদের ঘরে গেলুম। স্বাতি উমাশঙ্করকে বলল: দিনের বেলায় এ ঘরটা আপনাদের। কিন্তু রাতে আপনাকে বার করে দিয়ে আমি শোব পপির সঙ্গে।

উমাশঙ্কর এমন ভাবে তাকাল যেন স্বাতির কথার মানে বুঝতে পারে নি। আর পপিও আশ্চর্য হয়েছিল এই প্রস্তাব শুনে। তাই

আমি বুঝিয়ে বললুম : এখন আপনাদের কালরাত্রি চলছে, তাই রাতে আলাদা থাকার নিয়ম। রাতে আপনি আমার সঙ্গে শোবেন।

মনে হল, দুজনেই কিছু ম্রিয়মাণ হল। কিন্তু প্রতিবাদ করল না কেউ।

খেয়েদেয়ে আমরা বিশ্রাম করলুম সারা দুপুর। পাশের ঘরে উমাশঙ্কর নাক ডাকিয়ে ঘুমোল। গাড়ি চালিয়ে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। পপিরও সাড়া পাই নি। সেও বোধহয় ঘুমিয়েছিল। কিন্তু স্বাতি আমাকে ঘুমোতে দিল না। বলল : দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস ভাল নয়।

বললুম : এ তো শাস্ত্রের কথা।

স্বাতি বলল : স্বাস্থ্যের কথাও বটে, শরীরে চর্বি জমে, মাথাতেও।

হেসে বললুম : মাথায় চর্বি জমার কথা তোমার কাছেই আজ প্রথম শুনলুম।

স্বাতি বলল : মিলিয়ে দেখো, বুদ্ধি ভোঁতা হয় কিনা।

বললুম : তোমার কথাই আমি মেনে নিচ্ছি। এখন কী করতে হবে বল।

স্বাতি বলল : রোদ পড়লে বেরিয়ে পড়ব সমুদ্রের ধারে। এই সময়টা সমুদ্রের কথা শুনব।

সমুদ্রের কি কোন কথা আছে! সমুদ্র শুধু ডাকে। আর এই ডাক শুনে এত দিন বাঙলার মানুষ যেত উড়িষ্যায়—পুরী কিংবা গোপালপুর অন সী। অল্প দিন থেকে আমরা দীঘায় আসছি। কিন্তু পুরীর মতো সহজে আসতে পারছি না। রাতে খেয়ে গাড়িতে উঠে ঘুমিয়ে ভোরবেলায় এখানে নামতে পারলে আরও বেশি লোক এখানে আসত, আরও তাড়াতাড়ি বাড়ত এই শহর।

স্বাতি বলল : এখন তো সুবিধে হয়েছে। মোটরেই চলে আসা যায়।

বললুম : মোটরে এতটা পথ যাতায়াত আমরা সুবিধার মনে করি না। তাহলে তো দক্ষিণে সুন্দরবনের দিকেও যেতে পারতুম।

সত্যিই, সুন্দরবনের কথা আমরা ভাবি না কেন!

কে বলল ভাবি না! সুন্দরবনকে তো একটা নতুন জেলা করা হচ্ছে। আর সে অঞ্চলেও নাকি কয়েকটি টুরিস্ট সেণ্টার তৈরি হয়েছে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আর আমি বললুম : ডায়মণ্ড হারবার কাকদ্বীপ পর্যন্ত যাচ্ছে সরকারী টুরিস্ট বাস। তারও দক্ষিণে কয়েকটি জায়গার নাম আজকাল কাগজে দেখতে পাচ্ছি—বকখালি নামখানা ফ্রেজারগঞ্জ গঙ্গাসাগর।

স্বাতি বলল : এক গঙ্গাসাগর ছাড়া আর কোন নাম আমি শুনি নি।

বললুম : দক্ষিণে আমাদের রেললাইন কতদূর গেছে জান তো?

না। দক্ষিণে বালিগঞ্জ পর্যন্ত আমাদের যাতায়াত, তাও ট্রেনে যাই নি। তবে শুনেছি বালিগঞ্জ নামে একটা স্টেশন আছে।

পার্ক সার্কাস ও কালিঘাটেও স্টেশন আছে। শিয়ালদহে এখন তিনটি স্টেশন—নর্থ মেইন ও সাউথ। উত্তর দিক থেকে লোকাল ট্রেন আসে নর্থ ও মেইন স্টেশনে, দূর পাল্লার ট্রেনগুলো মেইন স্টেশন থেকে যাতায়াত করে। আর সাউথ স্টেশন হল দক্ষিণে যাবার জন্যে। শিয়ালদহ থেকে বজবজ হল ষোল-সতেরো মাইল দূরে—পার্ক সার্কাস বালিগঞ্জ কালিঘাটের উপর দিয়ে এই ট্রেন যায়। অন্য লাইন বালিগঞ্জ থেকে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে যায় প্রায় সাঁইত্রিশ মাইল দক্ষিণে। এই লাইনে ঢাকুরিয়া যাদবপুর বাঘাযতীন গড়িয়া। পরের স্টেশন সোনারপুর জংশন থেকে ক্যানিং যাওয়া যায়, আর লক্ষ্মীকান্তপুর যেতে হয় বারুইপুর জংশন থেকে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ও সব জায়গায় তুমি গেছ?

বললুম : না। তবে একবার যাবার ইচ্ছা আছে। ট্রেনে নয়, মোটরেও নয়। জাহাজে, গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত দেখে আসবার ইচ্ছা।

আমাকে সঙ্গে নেবে তো ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম: একা কি ভাল লাগে! তা লাগলে এক দিন দেখেই আসতুম।

সুন্দরবন অঞ্চলের মানচিত্র আমি দেখেছিলুম। চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ হল সুন্দরবন। লোকে বলে সুন্দরীগাছের বন, কিন্তু আমার মনে হয় সমুদ্রবন বললে আরও ভাল হত। মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার সীমানা দিয়ে বয়ে গেছে ভাগীরথী-গঙ্গা। এধারে ফল্‌তা পয়েন্ট, ওধারে দামোদর এসে গঙ্গায় মিলেছে। আর একটু এগিয়ে রূপনারায়ণ। মনে হয়, গঙ্গাকে ঠেলে নিয়ে গেছে পশ্চিম থেকে পূর্বে। এই বাঁকের উপরেই ডায়মণ্ড হারবার। এর পুরনো নাম হাজীপুর। পুরী যাবার পথে চৈতন্যদেব এসেছিলেন এই হাজীপুরে। তারপর ইংরেজ এসে এখানে বন্দর তৈরি করে নাম দিয়েছিল ডায়মণ্ড হারবার। ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গা প্রায় মাইল তিনেক চওড়া। শুনেছি তার অপরূপ দৃশ্য।

সমুদ্রে পৌঁছবার আগে গঙ্গা আবার পশ্চিমমুখো হয়ে দক্ষিণে নেমেছে। পশ্চিম থেকে হলদি নদী যেখানে এসে মিলেছে, তারই উত্তরে হলদিয়া বন্দর। এ একটা উপদ্বীপের মতো।

কলকাতা থেকে সোজা সড়ক ডায়মণ্ড হারবার কাকদ্বীপের উপর দিয়ে নামখানায় পৌঁছেছে। নামখানা থেকেই সাগরদ্বীপে যেতে হয় নৌকো বা লঞ্চে বড়তলা খাঁড়ি পেরিয়ে। গঙ্গাসাগরের মেলা হয় সাগরদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে। ফ্রেজারগঞ্জ আরও দক্ষিণে, কিন্তু অন্য দ্বীপে। নামখানা থেকেই সেখানে যেতে হয়।

স্বাতি বলল : সুন্দরবনের সম্বন্ধে কিছু বলবে না ?

হেসে বললুম : সুন্দরবনকে বলে দক্ষিণরায়ের রাজ্য। দক্ষিণরায় কে জানো তো ?

না।

দক্ষিণরায় হলেন বাঘের দেবতা। সুন্দরবনের অধিবাসীরাই বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এই দেবতার পুজো করে বনে ঢুকত। দক্ষিণরায় হলেন সুন্দরবনের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা। কিন্তু মুসলমানরা আর একজন দেবতার আমদানি করেছে। তিনিও বাঘের দেবতা, নাম গাজীসাহেব। এক দিন এই দুই দেবতায় তুমুল যুদ্ধ হয়। এক দিকে দক্ষিণরায় ও তাঁর বাহন হীরা বাঘ, অন্য দিকে গাজীসাহেব ও তাঁর বাহন দাউদা। এই দুই দেবতার বিবাদ মেটালেন অর্ধকৃষ্ণ পয়গম্বর। দুই দেবতাই বেঁচে রইলেন সুন্দরবনের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে।

সহাস্যে স্বাতি বলল : বাঘেরা কোনও পক্ষ নেয় নি ?

বললুম : তারা হল রয়েল বেঙ্গল টাইগার। রাজার হুকুমের জন্যে তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে রাজাদের যুদ্ধ দেখেছিল। কিন্তু হাসির কথা নয়, সুন্দরবনের বাঘ এক দিন মানুষের বিভীষিকা ছিল। পুরনো খবরের কাগজ পড়লে তা জানা যায়।

কী রকম ?

এক শো বছরেরও বেশি আগে সংবাদ-প্রভাকরে খবর বেরোত— এক মেজর সাহেব একদল সেনা নিয়ে সারাক্ষণ তোপ দাগার জন্যে বাঘের ভয় খুব বেশি ছিল না। শুধু তিন জন নাবিক ও পঞ্চাশ জন গঙ্গাসাগরযাত্রী বাঘের পেটে গেছে। অজগর-কুমীরের পেটে কজন গেছে তা কাগজে বেরোয় নি। তবে নৌকাডুবিতে অনেক যাত্রী মারা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' মনে আছে ?

আছে।

কিন্তু প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে যাত্রীরা বলেছে যে পয়সায় দুটো

করে ডাব খেয়ে এসেছে। আবার সেই তীর্থস্থানে পকেটমারও পকেট কেটে মিলিটারীর হাতে ধরা পড়েছে।

স্বাতি হেসে বলল : ধন্য আমাদের পকেটমার। নৌকোডুবির ভয় নেই, সুন্দরবনের বাঘেরও ভয় নেই। পকেট মারতে গেছে গঙ্গাসাগরের মেলায়!

বললুম : এও পুরনো আর্ট, এরও একটা ঐতিহ্য আছে।

স্বাতি বলল : গঙ্গাসাগরের কথাও কিছু বল।

বললুম : নিজে যাই নি। কাজেই পরের কাছে শোনা কথা বলতে হবে।

আমার কাছে দুই-ই সমান।

কেন?

তোমার কাছে শুনলেও তা পরের কাছে শোনা কথা।

কিন্তু আমি ঠিক কথা বলছি কিনা তা নিজেও জানি না।

স্বাতি বলল : তাতে ক্ষতি নেই।

আমি বললুম : লাভও কম। যে মন্দির দেখতে পৌষ মাসের মকরসংক্রান্তিতে সারা ভারত ও বিদেশ থেকেও চার পাঁচ লক্ষ যাত্রী প্রতি বছর আসে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে, তার মধ্যে তিনটি মূর্তি আছে শুনেছি। কপিল মুনির মূর্তি নিয়ে কোন বিবাদ নেই। তাঁর বাঁ হাতে কমণ্ডলু ও ডান হাতে জপের মালা। কিন্তু আর দুটি মূর্তি নিয়ে গোলমাল। বইএ পড়েছি যে একটি সমুদ্রের মূর্তি ও আর একটি ভগীরথের। কিন্তু যাত্রীরা ফিরে এসে বলেছেন যে দ্বিতীয় মূর্তি মকরবাহিনী চতুর্ভুজা গঙ্গার, তাঁর কোলে ভগীরথ। আর তৃতীয় মূর্তিটি সগর রাজার, কপিল মুনির মতো তিনিও যোগাসনে ধ্যানমগ্ন।

স্বাতি বলল : এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

কেন?

গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ছিল কপিল মুনির আশ্রম। ভগীরথ যে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের মুক্তির জন্যে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে

এই আশ্রমে এনেছিলেন, সে কথা আমাদের জানা আছে। কপিল মুনি গঙ্গা ও ভগীরথ এখানে প্রধান পুরাণের কথায়, আর সৌন্দর্যের বিচারে গঙ্গা সমুদ্র ও সাগরদ্বীপ।

বললুম: শেষেরটাই সত্য। গঙ্গাসাগর ও কপিল মুনির আশ্রমের টানেই কুম্ভমেলার মতো বিরাট মেলা হয় সাগর-সঙ্গমে। কিন্তু আশ্চর্য হই একটা কথা ভেবে—কপিল মুনির পরিচয় জানবার জন্যে কেউই আগ্রহী নয়।

স্বাতি কোন প্রশ্ন করল না। কিন্তু শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করল তার দৃষ্টি দিয়ে। তাই দেখে বললুম: এই নির্জন সাগর দ্বীপের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে বসে কপিল মুনি জীবের দুঃখ-মোচনের কথাই ভাবছিলেন। সেই চিন্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবার জন্যেই তিনি সগররাজার পুত্রদের উপর রেগে গিয়ে শাপ দিয়েছিলেন। ভস্ম হয়ে গিয়েছিল তারা। কপিল তাঁর ধ্যানে দুঃখ-মোচনের যে উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন তার নাম তত্ত্ব-সমাস। আসুরি মুনি তাঁর কাছে এই সংক্ষিপ্ত জ্ঞান লাভ করে শিষ্যপরম্পরায় তা প্রচার করেন। এই দর্শনের নামই সাঙ্খ্য। ভারতীয় ষড়-দর্শনের অন্তর্গত এই সাঙ্খ্যদর্শন কপিল মুনিরই তপস্যার ফল।

স্বাতি বলল: নতুন কথা শুনলাম।

বললুম: পুরনো কথা। আর একটি পুরনো কথা হল—

সব তীর্থ বার বার।

গঙ্গাসাগর একবার।

কিছু দিন আগেও লোকে এই কথা সত্য বলে বিশ্বাস করত। অগস্ত্যযাত্রার মতো সংসারের মায়া ত্যাগ করেই এই তীর্থে যেত। ফিরে আসতে পারলেই আশ্চর্য হত দশ গাঁয়ের লোক।

স্বাতি একবার জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে তাকাল। আমিও তাকালুম। মনে হল, রোদ আর তত তীব্র নয়। কিন্তু স্বাতি উঠল না, বলল: এ গল্প শেষ হবার পরেই বেরোব।

বললুম ঃ আর বেশি কিছু বলবার নেই। শুধু প্রতাপাদিত্যের কথা বলব। অনেকে মনে করেন যে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল এই সাগরদ্বীপে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই দ্বীপের উত্তরাংশ চিরকালই বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। গ্রামের লোকেরা সেখান থেকে কাঠ মধু আর মোম আহরণ করত, আর দেখত অনেক ভাঙা বাড়ি আর মন্দির। মাটি খুঁড়েও অনেক কিছু নাকি পাওয়া যায়। মুদ্রা তাম্রলিপি এই সব দেখেই লোকে এই সাগরদ্বীপকে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী বলে মনে করেন।

সাগর-সঙ্গমে মায়ের সন্তান বিসর্জনের গল্প বললুম না। বন্ধ্যা নারী মানং করত সন্তান হলে প্রথম সন্তান গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দেবে। সেই নৃশংস প্রথা ইংরেজকে আইন করে উচ্ছেদ করতে হয়েছে দেড় শো বছরের কিছু বেশি আগে।

স্বাতি উঠে দাঁড়াল, বলল ঃ চল,এই বারে বেরিয়ে পড়ি।

তোমার বন্ধুরা ?

বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

স্বাতি একবার বারান্দায় বেরিয়ে ফিরে এসে বলল ঃ ওরা ঘুমোক।

কিন্তু উমাশঙ্করের নাক ডাকার শব্দ আর শুনতে পাচ্ছিলুম না। বেরিয়ে যাবার সময় দেখলুম, তাদের ঘরের দরজাটা বন্ধ।

৩১

রাস্তায় এসে স্বাতি বলল : সমুদ্রের ধারে বসবার আগে শহরটা দেখে নেব।

বললুম : সূর্যাস্তের আগেই সমুদ্রের ধারে ফিরতে হবে।

স্বাতি ঘড়ি দেখে বলল : এখনও তার অনেক দেরি আছে।

সামনে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। আর ডান দিকে একটা পথ অনেক দূর চলে গেছে। বাঁ দিকে কোন পথ নেই। সেদিকে ঘর-বাড়ি আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সরকারী বাসভবন সৈকতাবাসেই শহরের শেষ। সুন্দর দোতলা বাড়ি একেবারে সমুদ্রের ধারে। উপরে নিচে ঘর ভাড়ার কিছু প্রভেদ আছে—নিচে দশ টাকা, উপরে বারো। দুজনের জন্যে সাজানো ঘর। চারজন থাকবার উপযোগী সুইটও আছে।

সদর রাস্তার উপরে লাক্সারি টুরিস্ট লজ পরে হয়েছে। তাই ব্যবস্থা আরও ভাল, ভাড়াও অনেক বেশি। দুজনের জন্য একখানা ঘরের ভাড়া তিরিশ টাকা।

যাঁরা বেশি দিনের জন্যে আসবেন, তাঁদের জন্যে যে নানা রকম সস্তার ব্যবস্থা আছে, তা সরকারী পুস্তিকায় দেখেছিলুম। ডেভেলপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট, সোসাল ওয়েলফেয়ার, কো-অপারেটিভ হেল্‌থ্ রিসর্ট সোসাইটি প্রভৃতি সংস্থার ছোট ছোট বাড়ি আছে। খাট বিছানা বাসনপত্র সবই পাওয়া যায়। এক একটা বাড়ির ভাড়া পাঁচ সাত টাকার মতো। এ ছাড়াও আছে কাফেটেরিয়া ও চীপ ক্যান্টিন। সেখানেও থাকার ভাল ব্যবস্থা আছে। অনেক-গুলি বেসরকারী হোটেলও আছে।

সামনেই একটা রেস্তোরাঁয় আমরা জনকয়েক যাত্রীকে চা খেতে

দেখলুম। স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল : একটু চা খেয়ে নেবে ?

বললুম : তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

রেস্তোরাঁর দরজার দিকে পা ফেলে স্বাতি বলল : এস।

শুধু চা খেয়েই আমরা বেরিয়ে এলুম। কিন্তু ঐ সময়টুকুর বেশ সদ্ব্যবহার হল। জনকয়েক যাত্রীর সঙ্গে আলাপ করে দীঘার অনেক খবর পাওয়া গেল। এমন কি মাইল পাঁচেক দূরে যে চন্দনেশ্বর শিবের মন্দির আছে, সে কথাও জানা গেল। আর কোন্ একটা জায়গায় সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরির ব্যবস্থা আছে। দীঘায় এলে সেখানেও অনেকে যায়।

একটি মেয়ে স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করল : কাজুর গাছ দেখেছেন ?

স্বাতি পুলকিত হয়ে বলল : এখানে কাজুর গাছ আছে নাকি ?

দেখেন নি ?

না।

তবে এক কাজ করুন।

বলে এক ভদ্রলোক আমাকে একটি বাড়ির হদিস দিলেন। বাড়ির গেট খুলে ভিতরে গিয়ে দেখতে হবে। বাইরে মালি থাকলে সে-ই চিনিয়ে দেবে। এখন ফল নেই, শুধু গাছ আর পাতা দেখতে পাবেন।

আর একজন বললেন : কাঁথির বাজারে ফলও পাবেন, খুব শক্ত খোলার ফল।

স্বাতি তৎপর ভাবে বেরিয়ে এসে বলল : তাড়াতাড়ি এস।

বাড়িটি চিনতে আমাদের সময় লাগল না। জনকয়েক যাত্রীকে বেরোতে দেখে আমরা ঢুকে পড়লুম। একটি গাছ না গোটাকয়েক গাছ তা বুঝতে পারলুম না। বেশ বড় একটা ঝোপ, ফলসা গাছের মতো উঁচু। কিন্তু ফুল বা ফল নেই এখন। পরে তা দেখেছিলুম কাঁথির বাজারে। ফেরার সময় একটু ছুটোছুটি করে গোটা দুই

বীজ সংগ্রহ করতে পেরেছিলুম। খুব শক্ত খোলা, তার ভিতরে থাকে কাজু। কিন্তু ফল বোধহয় এখানে কোন কাজে লাগে না। এই ফল থেকে যে ফেনী নামের মন-ভোলানো মদ তৈরি হয়, গোয়ার পানাজিতে আমরা সে কথা শুনেছিলুম।

রাস্তায় ফিরে এসে দু ধারের ঘর বাড়ি দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে গেলুম। এক সময় সেই ঝাউ বনও দেখতে পেলুম। দীঘার এই ঝাউ বনের ছবি আমরা দেখেছি। তার ভিতর দিয়ে পায়ে হাঁটার পথ সমুদ্রের দিকে গেছে। স্বাতি বলল : এই পথেই চল।

মাটির পথ ছেড়ে আমরা বালির পথ ধরলুম। দু ধারে সরু সরু ঝাউগাছ আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিরল-পত্র গাছ। কিন্তু অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই ঝাউ বন। তার পরেই বিস্তীর্ণ সমুদ্রবেলা। খানিকটা শুকনো, তারপরেই ভিজে ভিজে কালো মাটির মত শক্ত বেলাভূমি সুদূরবিস্তৃত। নানা রকমের দাগ দেখছি, মোটরের চাকারও দাগ আছে। মনে পড়ল যে এই সমুদ্রবেলায় ছোট উড়োজাহাজও নামতে পারে। কলকাতার শৌখিন এক সাহেব নাকি মাঝে মাঝেই এখানে আসতেন নিজের উড়োজাহাজে।

অনেকক্ষণ ধরে চারি দিক দেখে স্বাতি বলল : এ রকম বেলাভূমি এর আগে আমরা দেখি নি।

কথাটা মিথ্যে নয়। জলের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে মনে হল যে এই বেলাভূমি বোধহয় মাইল পাঁচেক দীর্ঘ, আর প্রস্থেও কম নয়। এর উপরে জোয়ার-ভাঁটা চলে বলেই নদীর শুকনো বুকের মতো শক্ত। সমুদ্রেরও বড় বড় ঢেউ নেই। অনেক শান্ত সমুদ্র। মনে হল, স্নানের জন্যে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারব, সাঁতার কাটতেও পারব। গভীর জল এখান থেকে অনেক দূরে।

সূর্যাস্তের দেরি ছিল না। পশ্চিমের আকাশে আমরা রঙীন

আলো দেখতে পাচ্ছিলুম। স্বাতি বলল: এস, একটুখানি পরিষ্কার জায়গায় স্থির হয়ে বসা যাক।

বললুম: স্থির হয়ে না বসলে এই বিশাল সমুদ্রকে চেনা যাবে না।

স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বললুম: এক নজরে বিশালকে চেনা যায় না। তার ধ্যানেই জ্ঞান হয়। যিনি সব চেয়ে বিশাল, তাঁকে আমরা কঠোর তপস্যায় লাভ করি।

আশ্চর্য উজ্জ্বল দেখাল স্বাতির মুখ। বলল: এই দিকে এসো।

বলে একটা পরিচ্ছন্ন জায়গায় এসে বসে পড়ল। আমি বসলুম তার পাশে।

নির্জন এই জায়গা। যাত্রীদের আনাগোনা নেই। জেলেরাও এখন মাছ ধরছে না। সমুদ্র আর আকাশ আমাদের সঙ্গী। আকাশের আলো আর সমুদ্রের বাতাস। নিঃশব্দে আমরা কিছুক্ষণ বসে রইলুম।

এক সময়ে আমি বললুম: কিছু ভাবছ বলে মনে হচ্ছে!

স্বাতি বলল: সত্যিই ভাবছি।

তারপরে তার ভাবনার কথা বলল: ভাবছি এই পশ্চিমবঙ্গের কতটুকু আমাদের দেখা হল, আর বাকি রইল কতটুকু!

বললুম: সবই তো বাকি।

স্বাতি প্রতিবাদ করে বলল: না। যে ভাবে আমরা ভারতের অন্য সব রাজ্য দেখেছি, সেই ভাবে দেখার কথা বলছি। কোনও রাজ্যের সব কিছু দেখা তো সম্ভব নয়, মোটামুটি দেখার কথা, চলনসই একটা ধারণা করে নেবার কথা।

বললুম: তাও সম্পূর্ণ হয় নি। ভাগীরথী-গঙ্গার পশ্চিম তীর দিয়ে আমরা কলকাতায় এসেছি, পূর্ব তীরে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত আরও

অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। যত শোনা কথা বলেছি, দেখা কথা তত বলি নি।

স্বাতি বলল: গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের কথাও বল নি।

বললুম: জানি না বলে।

স্বাতি বলল: শান্তিনিকেতনের কথা আমি তোমাকে বলব।

বললুম: খুব মন দিয়ে আমি শুনব।

স্বাতি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল: দুঃখ কিসের জানো? এই শান্তিনিকেতন যাঁর সৃষ্টি, সেই গুরুদেবকে আমরা দেখি নি। তাই সেখানে গেলে মন আমার খুব খারাপ হয়ে যায়।

বললুম: তার আগেরও একটা ইতিহাস আছে। তখন এ জায়গার নাম ছিল ভুবনডাঙা।

স্বাতি বলল: বোলপুর স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতনে যাবার পথের পাশে ভুবনডাঙা নামে একটি গ্রাম এখনও আছে।

বললুম: শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার বোলপুর থেকে রায়পুরে যাচ্ছিলেন একটা নিমন্ত্রণ রক্ষায়। সে পথ ছিল ডাকাতদের আড্ডা ভুবনডাঙার উপর দিয়ে। ধূ ধূ করা নির্জন মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মহর্ষি দুটি ছাতিমগাছের ছায়া দেখে মুগ্ধ হলেন। ভাবলেন যে, ঈশ্বরের উপাসনার জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর নেই। এখানেই তিনি তাঁর আশ্রম স্থাপন করে নাম দিলেন শান্তিনিকেতন।

স্বাতি বলল: সেই ছাতিমতলা এখনও আছে, আর শান্তিনিকেতন নামের পুরনো দোতলা বাড়িও আছে। আশ্রমে প্রবেশের পথে লেখা আছে ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, আর শান্তিনিকেতনে লেখা সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দং।

আমাকে হাসতে দেখেই স্বাতি বলল: অনেকবার দেখেছি বলেই মনে আছে।

তারপরে বলল: বোলপুর স্টেশনে নেমে একটা রিক্সা নিয়ো।

তা না হলে দু মাইল হাঁটতে হবে। বাঁ দিকে ভুবনডাঙা ফেলে এগিয়ে যাবে। তারপরে ডান দিকে পূর্বপল্লীর মাঠ, আর বাঁ দিকে লেখা আশ্রম ও বিদ্যালয় এলাকা। রিক্সা একটুখানি দাঁড় করিয়ে একটা বিজ্ঞপ্তি পড়ে নিও—বুধবার ছুটি। অন্যান্য দিনে দর্শকরা সকাল আটটা থেকে দশটা আর বিকেল দুটো থেকে চারটের ভেতরে যেতে পারেন।

তারপরে স্বাতি সংক্ষেপে আমাকে শান্তিনিকেতনের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির কথা বলল। হিন্দীভবনের ভিতরে দেখতে হয় শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ফ্রেস্কো ও ভিত্তিচিত্রে মধ্যযুগের সন্তদের জীবনকাহিনী। তারপরে চীনাভবনে শিল্পী নন্দলাল বসুর দুখানি বিখ্যাত ফ্রেস্কো—বুদ্ধের তপস্যা ও নটীর পূজা। শিশু-বিভাগ, ছাত্রদের তৈরি ঘর মুকুট, বিদ্যাভবন শিক্ষাভবন পাঠভবন দিনান্তিকা চা-চক্র চৈত্য শ্রীসদন কলাভবন সঙ্গীতভবন। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে কলাভবনে শিল্পী রামকিংকরের ভাস্কর্য দেখতে হয়—সাঁওতাল-পরিবার, ধ্যানী বুদ্ধ, সুজাতা ও ঘরমুখো শ্রমিক। অনির্বাণ শিখা প্রভৃতি আরও অনেকগুলি সুন্দর ভাস্কর্য আছে শান্তিনিকেতনে।

উত্তরায়ণ এলাকায় অনেকগুলি সুন্দর বাড়ি আছে। তাদের নাম উদয়ন কোনার্ক শ্যামলী পুনশ্চ এবং উদীচী। সব চেয়ে পুরনো বাড়ি কোনার্ক, আর নতুন বাড়ি উদীচী, শ্যামলী মাটির বাড়ি। কবি এই সব বাড়িতে অনেক দিন কাটিয়েছেন। বিচিত্রায় কবির সংগ্রহালয় ও প্রদর্শনীগৃহ। উদয়নেও কবির ব্যবহৃত বই ও নানা জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।

স্বাতি বলল: গুরুদেবের স্মৃতি দেখতে হলে ধীরে ধীরে সময় নিয়ে দেখতে হয়। টুরিস্টের মতো তাড়াহুড়ো করে দেখবার জায়গা এ নয়।

বললুম: এ নিয়ম সব জায়গার জন্যেই। চোখে দেখার জন্যে,

সময় লাগে না, সময় লাগে মনে ধরে রাখবার জন্যে। মনের চোখ ক্যামেরার মতো নয় বলেই তার জন্যে সময়ের দরকার।

স্বাতি বলল: শান্তিনিকেতনের প্রতিটি জায়গার বিচিত্র পরিচয় আছে। আম্রকুঞ্জ শালবীথি মাধবীকুঞ্জ সিংহসদন গৌরপ্রাঙ্গণ। আরও কত ঘরবাড়ি, নানা নামের পল্লী, নানা গুণীজনের নিজের বাড়ি। তারপরে শ্রীনিকেতন।

বললুম: সে তো অনেকটা দূরে।

স্বাতি বলল: হ্যাঁ। কালীসায়রের পাশ দিয়ে গেছে শ্রীনিকেতনের পথ। ম্যালেরিয়ায় ভরা সুরুল নামের একটি গ্রাম গুরুদেবের চেষ্টাতেই শ্রীনিকেতন হয়েছে। শ্রীনিকেতনে তৈরি নানা জিনিস এখন কলকাতার বাজারে ছেয়ে গেছে। কিন্তু শ্রীনিকেতনের আসল শিক্ষা হল গ্রামোন্নয়ন।

বললুম: শান্তিনিকেতনে একবার যেতেই হবে।

স্বাতি বলল: এবারের পৌষমেলায় তোমাকে নিয়ে যাব। শুধু মেলা নয়, বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবও দেখতে পাবে ৭ই পৌষের পরের দিন। ৭ই পৌষে এই মেলা কেন হয় জান তো?

আমি স্বীকার করলুম: জানি নে।

স্বাতি বলল: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐ দিন দীক্ষা নিয়েছিলেন। আর অন্য এক ৭ই পৌষ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। এই মেলায় ঘুরে রথ দেখা ও কলা বেচা দুই-ই হবে।

কী রকম?

অনেক নাম-করা লেখক ও গুণীজনকে দেখতে পাবে মেলায়। সেও মেলার একটা আকর্ষণ।

তারপরে বলল: শান্তিনিকেতনে উৎসবের শেষ নেই। নববর্ষ ও রবীন্দ্র-জন্মোৎসব দিয়ে শুরু, তারপর একে একে হলকর্ষণ বাইশে শ্রাবণ ও বৃক্ষরোপণ বর্ষামঙ্গল আনন্দবাজার ও

শারদোৎসব। বছরের শেষে বসন্ত উৎসব ও বর্ষশেষ উৎসব। রবীন্দ্রনাথ অমর হয়ে আছেন এই সব উৎসবের মধ্যে।

আমি বললুম: এ সব না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ অমর হয়ে থাকবেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি রাতারাতি এমন জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন যে বাঙলার সাহিত্যিক আজও এক পা বেশি এগোতে পারে নি।

স্বাতি বলল: অনেকেই তোমার কথার প্রতিবাদ করবে।

বললুম: প্রতিবাদ করলেও আমি তা মেনে নিতে পারব না।

তারপরেই বাঙলা সাহিত্যের শৈশবটা একবার ভেবে নিলুম। আদিযুগে সংস্কৃতে কাব্য রচনা হয়েছে জয়দেবের গীতগোবিন্দ আর সিদ্ধাচার্যের বাঙলা গান। তারপর কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর মৈথিলী পদাবলী সাহিত্য। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব গীতিকাব্য রচনা হয়েছে আর পাঁচালী। বাঙলা গদ্যসাহিত্যের জন্ম হয়েছে কোম্পানীর আমলে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব সহজ করলেন। উপন্যাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র দত্ত স্বর্ণকুমারী দেবী ও দামোদর মুখোপাধ্যায়। কাব্য ও নাটকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র সেন ও বিহারীলাল চক্রবর্তী।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর আর সকলের খ্যাতি ম্লান হয়ে গেল। দেবেন্দ্রনাথ সেন অক্ষয়কুমার বড়াল গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী কামিনী রায় প্রিয়ম্বদা দেবী মানকুমারী বসু রজনীকান্ত সেনকে আর মনে রাখবার দরকার নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নজরুল ইসলাম ও অতুলপ্রসাদ সেনকে আমরা কোন রকমে মনে রেখেছি। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কথাশিল্পীকে আজ কজন মনে রেখেছে। ভালবেসে আঁকড়ে ধরে আছে শুধু শরৎচন্দ্রকে।

তারপরেই তো বর্তমান কাল। এ কালের লেখকদের বিচার কালের কষ্টিপাথরে এখনও হয় নি। তার দেরি আছে। ইংরেজ কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড্ ঠিকই বলেছেন যে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে তার তুষারমণ্ডিত শিখর দেখা যায় না। তা দেখতে হলে অনেক দূরে সরে যেতে হবে। সাহিত্যের বেলাতেও তাই। এ কালের সাহিত্যের বিচার এ কালে কিছুতেই সম্ভব নয়।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: তোমার মন তো এখন আকাশের সূর্যাস্তের দিকে নেই!

আমি লজ্জিত ভাবে বললুম: তাই তো, এবারে যে অন্ধকার নামবে।

স্বাতি হেসে বলল: নামুক। তারার আলোয় আমরা পথ দেখতে পাব।

কিন্তু তোমার বন্ধুরা হয়তো আমাদের অপেক্ষায় আছে।

বোধহয় না।

তবু আমাদের ফেরা উচিত। তাদের দেখতে না পেলে আবার আমরা বেরিয়ে পড়ব।

আপত্তি না করে স্বাতি উঠে দাঁড়াল, বলল: চল।

ফেরার পথে অন্যমনস্ক ভাবে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: আচ্ছা বল তো, সাহিত্যে কি নতুন কিছু করা সম্ভব নয়? মানে, নতুন ধরনের কোন সাহিত্য?

কেন বল তো?

আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

আমার হাসি পেল তার কথা শুনে। কিন্তু হেসে তার স্বপ্ন ভেঙে দিতে ইচ্ছা হল না। নিঃশব্দে আমি তাই পথ চলতে লাগলুম।

৩২

ঝাউ বনের ভিতর দিয়ে আমরা ফিরছিলুম না। ফিরলুম বেলাভূমির উপর দিয়ে। দীঘার সদর রাস্তা যেখানে সমুদ্রে এসে মিলেছে, সেইখানে অনেক যাত্রী ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক সময় আমরাও তাদের সঙ্গে মিলে গেলুম। তারপরে রাস্তায় উঠে বাঁ হাতে একসারি দোকানপাট ফেলে নিজেদের আস্তানায় পৌঁছে গেলুম।

স্বাতি বলল : তুমি এখানেই একটু অপেক্ষা কর, আমি ওদের দেখে আসছি।

বলে তরতর করে উপরে উঠে গেল।

কিন্তু তার কথা না শুনে আমি তাকে অনুসরণ করলুম। আর থমকে দাঁড়ালুম পপিদের ঘরের কাছে গিয়ে।

স্বাতি ভিতরে ঢুকেই বেরিয়ে এল। আর উমাশঙ্করের গলার শব্দ পেলুম। জড়িয়ে জড়িয়ে কী বলল তা বুঝতে পারলুম না। পপির কথাও শুনতে পেলুম।

আমাকে দেখতে পেয়েই স্বাতি বলল : চল।

বাতাসে আমি একটা মদির গন্ধ পেয়েছি। তাই তাকে কোন প্রশ্ন করবার দরকার বোধ করলুম না। বরং আমি আশ্চর্য হলুম স্বাতির গোঁড়ামি দেখে। এ যুগের মেয়ে যুগের হাওয়াকে এমন ভয় করবে কেন!

নিচে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলুম : কোথায় যাবে?

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল : বাসের খোঁজ নেব।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকাতেই স্বাতি বলল : কাল সকালেই এখান থেকে ফিরব।

বলে সরকারী বাসের অফিসের দিকে হাঁটতে লাগল।

তার পাশে চলতে চলতে আমি বললুম: সত্যকে মেনে নিলে মানসিক যন্ত্রণা হয় না।

স্বাতি কঠিন স্বরে উত্তর দিল: আর সত্যে গা ঢেলে দিলে শারীরিক সুখও হয়।

বললুম: বর্তমান বিশ্বে এইটেই হল একমাত্র প্রশ্ন যা ঘটছে তা ঘটা উচিত নয়, কিন্তু কী ভাবে তার প্রতিকার হবে। পুরাতন সংজ্ঞায় যা দুর্নীতি, তাতে গা ভাসিয়ে দেবার অবাধ ছাড়পত্র দিলে কি মানুষ আবার পুরনো পথে ফিরে আসবে? না আইনের কড়াকড়ি দিয়ে রোধ করা যাবে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত?

স্বাতি কোন কথা বলল না। চলতে চলতে আমিই বলতে লাগলুম: পশ্চিমের কয়েকটা দেশে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। সে দেশের লোক বলছে, বিধিনিষেধ তুলে দিয়েই ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে।

তাই বলে কি আমরাও সব তুলে দিয়ে মজা দেখব?

কঠিন স্বর, কঠিন প্রশ্ন। কিন্তু আমি সহজ ভাবেই উত্তর দিলুম: এ আমাদের ভাবনা নয়।

স্বাতির গলার স্বর এক মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেল, বলল: তবে একথা কে ভাববে বল তো?

আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না। আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে স্বাতি বলল: কেউ ভাবছে কি?

তাও জানি নে।

স্বাতি বলল: শুনতে পাচ্ছি, স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরাও আজকাল নানা রকমের নেশা ধরেছে। আর তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ক্রমাগতই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই নতুন সমাজের কাছে আমরা কী আশা করতে পারি বলবে?

আমি তাকে সহজ করবার চেষ্টায় বললুম: গোদো আসছে। গোদো এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্বাতি আমার পরিহাস বুঝতে পেরে আর কোন কথা বলল না।

খড়্গপুরে ফেরার বাসের খবর আমরা জেনে নিলুম। স্বাতি বলল: সকালের চা খেয়েই আমরা ফিরব। আর পরের দিন ভোর-বেলায় বেরোব মুর্শিদাবাদ দেখতে। তোমার কষ্ট হবে না তো?

বললুম: মনের আনন্দে কষ্টের কথা মনেই পড়বে না।

তবে চল, সমুদ্রের ধারে গিয়ে আর একটু বসি।

সমুদ্রের কাছাকাছি এসে রাস্তার ডান ধারে আধো-অন্ধকারে কয়েকটা চায়ের দোকান দেখতে পেলুম। বাইরে চেয়ার ও বেঞ্চিতে বসে কয়েকজন চা খাচ্ছে, চা ও খাবার। স্বাতি সেই দিকে এগিয়ে বলল: এস, আমরাও একটু চা খেয়ে নিই।

চা খেতে খেতেই জানলুম যে সকালে এরা গরম জিলিপি ভাজে, আর সিঙাড়া। স্বাতি বলল: সকালের জলখাবার আমরা এখানেই খাব।

তারপরে আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসলুম।

এক সময় স্বাতি বলল: কলকাতায় থাকলে আজ ওস্তাদের বাড়ির জলসায় আমরা যেতাম। এর চেয়ে তোমার ঢের ভাল লাগত।

বললুম: এখানেও ভাল লাগবে।

স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বললুম: ইচ্ছা করলেই তো তুমি সেই পরিবেশের সৃষ্টি করতে পার! আমি আর এই সমুদ্র—শুধু আমরা দুজনে তোমার গান শুনব।

স্বাতি বলল: আমি তো গান গাই নে।

কিন্তু তোমার মনে যে সুর আছে!

মনের সুর কি গলায় আসে!

যার হাতে সুর আছে, তার গলায়ও আছে। তুমি বাজাতে জান, সেই বাজনা তোমার গলায় গুনগুনিয়ে উঠবে।

খানিকক্ষণ নীরবে রইল স্বাতি। তারপরে বলল : রবীন্দ্রনাথের একটা কথা মনে পড়ছে। আমার ওস্তাদের কাছে শুনেছিলুম।

কী কথা ?

রবীন্দ্রনাথ নাকি পারস্য ভ্রমণের সময় মন্তব্য করেছিলেন যে আমাদের দেশের মার্গ সঙ্গীত যাঁরা গান, তাঁরা কখন থামতে হবে সেই কথাটি বোঝেন না। এটি না বোঝার জন্যেই মার্গ সঙ্গীত এত ক্লান্তিকর।

বললুম : এ কথাটি সব শিল্পকলার ব্যাপারেই খাটে। এই যে আমরা বসে বসে কথা বলছি, কিছুক্ষণ পরে এও ক্লান্তিকর মনে হবে।

কথার প্রসঙ্গ তাই পরিবর্তন করতে হয়।

গানের বেলাতেও তাই। ক্রমাগত 'পপ্ সং' শুনতেও আমাদের ভাল লাগে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় এ কথা খাটে না।

সে রাগরাগিণীর বৈচিত্র্যের জন্যে।

স্বাতি বলল : ঠিক বলেছ। গানে রবীন্দ্রনাথ মার্গ সঙ্গীতকে উপেক্ষা করেন নি, লোকসঙ্গীত ও বিদেশী সুরও নিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ভাব মিলিয়ে গান রচনা করেছিলেন বলেই এ গান এমন মধুর হয়েছে।

তারপরেই বলল : আমার ওস্তাদ কী বলেন জানো ? কোন নতুন কবি যদি গানের কথাগুলি লিখে দেয় তো বিশুদ্ধ মার্গ সঙ্গীতকেও জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব।

বললুম : সবই সম্ভব।

হঠাৎ স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসল : তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে না ?

আমি ! আমি কী সাহায্য করব !

কেন পারবে না ! আমি তোমাকে সেতারে বেহাগ শুনিয়ে-

ছিলাম। আর এই বেহাগের কথা মনে হলেই মনে গুনগুনিয়ে ওঠে—

বলে স্বাতি অত্যন্ত মৃদুস্বরে গাইতে লাগল :

পিয়াকে দরশনওয়া কেয়সে পাওরি!
আলিরি কহ যতনে ম্যয়কো বাতাও।
উড়ি উড়ি কাগোয়া যা দখিনাকো।
খবর লি আওয়ে মেরে প্রীতমকে।

তারপরে গান থামিয়ে বলল : বাঙলায় যদি এই কাকের কথা বার বার বলি, তো কোনও শ্রোতা আমাকে ক্ষমা করবে না। অথচ বাঙলার বড় বড় শিল্পীরা এখনও ধ্রুপদ খেয়াল ও ঠুংরি গাইছেন হিন্দী ভাষায়।

বললুম : রাজা রামমোহন তো বাঙলাতেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজে!

স্বাতি বলল : তার চেয়ে বেশি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি সবই বিশুদ্ধ রাগরাগিণীতে।

বলে গাইল : শোন তাঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্তে—

থেমে বলল : ইমনকল্যাণ চৌতাল। তেমনি আড়ানা চৌতাল—বাণী ভব ধায় অনন্ত গগনে গগনে। আবার খেয়ালে আড়ানা একতাল হল—মন্দিরে মম কে আসিল হে। ধ্রুপদে তাঁর বাগেশ্রী তেওরা আছে—নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে। আর খেয়ালে ছায়ানট ঝাঁপতাল—তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।

স্বাতি যখন গানের প্রথম লাইনটি আমাকে গেয়ে শোনাচ্ছিল, আমি তখন তার গাইবার ভঙ্গিটি লক্ষ্য করে আশ্চর্য হচ্ছিলুম। মনে হচ্ছিল যে ধ্রুপদ ও খেয়াল গাইবার তফাৎটাও যেন সে আমাকে বুঝিয়ে দিল। তারপরেই লজ্জা পেয়ে বলল : তুমি হাসছ নাকি!

হাসি আমার পায় নি। আমি তার সঙ্গীতে দখল দেখেই আশ্চর্য হয়েছিলুম। আর মুগ্ধ হয়েছিলুম তার গান শুনে। কিন্তু

কোন উত্তর দেবার আগেই সে বলল : আমার কী ইচ্ছে জানো? আমার ইচ্ছা করে যে আজ যেমন বাঙালী শিল্পীরা হিন্দীতে ধ্রুপদ ও খেয়াল গাইছে, তেমনি এক দিন আসুক যেদিন সারা ভারতের শিল্পী ধ্রুপদ ও খেয়াল গাইবে বাঙলায়। আর—

আর কী?

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে দেখব বাঙলা যাত্রাগান। বাঙলার লোকনাট্য লোকগীতি ও লোকনৃত্য সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মতো। লোকে জানবে যে শুধু ধর্মে নয়, কাব্যে ও সাহিত্যেও নয়, শিক্ষা বিজ্ঞানচর্চা রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, আমাদের বাঙলা বিশ্বকে জয় করতে পারে তার সংস্কৃতি দিয়ে। বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ নেতাজীর জন্ম দিয়েই যে বাঙলা বন্ধ্যা হয়ে যায় নি, সেই কথা আমাদের প্রমাণ করতে হবে।

কিন্তু কে প্রমাণ করবে সেই কথা?

তুমি।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলুম তার উত্তর শুনে। আর অন্ধকারেও দেখলুম তার দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গভীর প্রত্যাশায়।

সমুদ্র গর্জন করছে দূরে। প্রতিবাদ করছে, না সমর্থন করছে স্বাতিকে, তা বুঝতে পারলুম না।

৩৩

ভোরবেলাতেই আমরা মুখ হাত ধুয়ে যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছিলুম। পপিরা তখনও ঘুমোচ্ছিল। স্বাতি আমাকে বলেছিল : উমাশঙ্করবাবুকে তুমি জাগিয়ো না। পপিকে আমি বলে যাচ্ছি। ঘুমের চোখে কথাটা সে বোধহয় বুঝতেই পারে নি। হয়তো ভেবেছিল, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা সেই বাজারের দোকানে গরম জিলিপি আর সিঙাড়া দিয়ে চা খেয়ে খড়্গপুরের প্রথম বাসটাই ধরেছিলুম। তারপরে খড়্গপুরে ট্রেন ধরে সোজা ফিরে এসেছিলুম কলকাতায়।

স্বাতি প্রথমেই খোঁজ করেছিল দিল্লীর খবরের। বলেছিল : ভারি আশ্চর্য তো!

কেন?

বাবা মা কি আমার টেলিগ্রাম পান নি? চিঠি পৌঁছতেই বা ক'দিন লাগে!

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম : এমন ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

স্বাতি বলেছিল : ব্যস্ত হবার কথাই যে! বাবার শরীর ভাল নয়, আর মা বলেছিলেন আমাদের খবর পেলেই চলে আসবেন।

তারপরে শেষ ডাকেও কিছু এল না দেখে স্বাতি বলেছিল : তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইল।

কোন্ কথা?

কাল ভোরবেলায় লালগোলা প্যাসেঞ্জারে আমরা বেরিয়ে পড়ছি। সোজা গিয়ে মুর্শিদাবাদে নামব। তারপর--

বল।

সময় পেলে কৃষ্ণনগরে নেমে নবদ্বীপ দেখে ফিরব।

এক দিনে !

কেন হবে না ! এক দিন কি সময় কিছু কম !

ভোর সাড়ে চারটেয় শিয়ালদহ থেকে ছাড়ে লালগোলা প্যাসেঞ্জার। ড্রাইভারকে স্বাতি বাড়িতে ঘুমোতে বলল, আর অ্যালার্ম দিয়ে রাখল নিজের ঘরে। বলল : শীত এখনো এত পড়ে নি যে ভোর চারটেয় বাড়ি থেকে বেরোতে পারব না।

তারপরেই বলল : কাল খুব আমোদ করা যাবে। ঠিক হিপিদের মতো বেড়াব। বাঙালী হিপি। ঘুম থেকে উঠব আর বেরিয়ে পড়ব।

সত্যিই সে তাই করল। বলল : সঙ্গে কাপড় গামছা নিয়ে বেরোচ্ছি, সুযোগ পেলে স্নান করে নেব।

বলে তার বড় ব্যাগটা দেখাল আমাকে। আর আমার জন্যেও কাপড় গামছা নিয়ে এল।

পথে তখনও অন্ধকার ছিল। সেই অন্ধকারেই আমরা স্টেশনে এলুম। তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে চলে গেলুম আট নম্বর প্ল্যাটফর্মে। স্বাতি একটা ফার্স্ট ক্লাসে উঠছিল। বললুম : এ কি, ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটেছ বুঝি !

স্বাতি সংক্ষেপে বলল : ফেরার পথে থার্ড ক্লাসেই উঠব।

যাবার সময়েও তো দরকার ছিল না !

নিজের ব্যাগটা রেখে আমাকে টেনে নিল ভিতরে। তারপরে বলল : আর একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবে।

বলে কামরার দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঢং ঢং করে ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল। গাড়ি ছাড়বে। স্বাতি বেশ পুলকিত হয়ে বলল : আজ বেশ ভাল লাগছে, তাই না !

লাগছে বৈকি ! এমনি করে আমরা অনেক বেড়াতুম।

ট্রেন ছেড়ে দিল। কিন্তু আর কোন যাত্রী আমাদের গাড়িতে উঠল না। স্বাতি বলল : লম্বা হয়ে শুয়ে পড়। আর এক ঘুম ঘুমিয়ে নাও। সারা দিন ঘুরতে হবে তো !

বলে নিজেও শুয়ে পড়বার উদ্যোগ করল।

আকাশে তখনও অন্ধকার ছিল। তাই আমি আপত্তি করলুম না।

এ ট্রেন সব স্টেশনে দাঁড়ায় না। দমদমের পর দাঁড়াবে ব্যারাকপুরে, তারপর নৈহাটি কাঁচরাপাড়ায়। রাণাঘাটের পর সব স্টেশনে দাঁড়াবে। কিন্তু আমরা যে এতক্ষণ ঘুমোব, তা বুঝতে পারি নি। ছটার পরে রাণাঘাটে এসেই ঘুম ভাঙল। স্বাতি হেসে বলল ঃ এই জন্যেই ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটেছিলাম।

আমি বললুম ঃ এই জন্যেই এ পথটা চেনা গেল না।

ট্রেনের বাথরুমে আমরা স্নান সেরে নিলুম। স্বাতি ফিরে আসতেই বললুম ঃ কৃষ্ণনগরে আমরা চা খাব।

স্বাতি বলল ঃ তার আগে পেলে কি খাবে না ?

আশ্চর্য হয়ে বললুম ঃ সঙ্গে ফ্লাস্ক এনেছ নাকি ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে স্বাতি তার ব্যাগ খুলে সকালের খাবার বার করল। রুটি মাখন আর কলা। তার পরিমাণ দেখে বললুম ঃ এত খাবে কে ?

স্বাতি বলল ঃ মুর্শিদাবাদে কি দুপুরের খাবার পাবে! না যেখানে সেখানে খাওয়াই উচিত হবে !

হেসে বললুম ঃ পাকা গিন্নীর মতো কাজ।

স্বাতিও হেসে জবাব দিল ঃ তোমার গিন্নী থাকলে কিছু করতাম না।

বলে চায়ের ফ্লাস্ক বার করল। বলল ঃ ডিম অযাত্রা বলে সঙ্গে নিয়ে বেরোই না।

পরীক্ষার সময় শুধু ডিম নয়, কলা আর রসগোল্লাও অযাত্রা।

স্বাতি নিশ্চিন্ত সুরে বলল ঃ আর আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে না।

আমি বললুম ঃ সব চেয়ে বড় পরীক্ষাটাই বাকি আছে।

তারপরে আমরা কৃষ্ণনগর সিটি এসে পৌঁছলুম। রাণাঘাটের মতো বারো মিনিট এখানে দাঁড়ায় না, দাঁড়ায় মাত্র পাঁচ মিনিট। সোয়া সাতটাতেই ট্রেন ছাড়ল। মুর্শিদাবাদ পৌঁছবে বেলা সাড়ে দশটায়।

স্বাতি সব কিছু গুছিয়ে ব্যাগে তুলে রেখে বলল: কৃষ্ণনগর সম্বন্ধে কিছু বলবে না ?

বললুম: তাহলে তো গোপাল ভাঁড়ের কথা বলতে হয়।

কেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা ?

ও ভদ্রলোককে আমার ভাল লাগে না। বাঙালীর জন্যে তাঁর মোটেই দরদ ছিল না।

কী রকম!

ইতিহাসে তো পড়ি নি, কোন প্রবন্ধে পড়েছি তাঁর কথা। ভবানন্দ মজুমদার নামে এক ভদ্রলোক নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম সপ্তম পুরুষে। কৃষ্ণনগরে দুর্গ নির্মাণ করেন, রাজধানী স্থাপন করেন। বহু গোয়ালার বাস ছিল বলে রাজধানীর নাম হয় কৃষ্ণনগর। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক গুণ ছিল বলে শুনেছি। ভাল সংস্কৃত জানতেন, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, সঙ্গীতের চর্চাও করেছিলেন। আর নিজের সভায় যে পণ্ডিতদের সম্মান করতেন তারও প্রমাণ আছে। তাঁরই আশ্রয়ে থেকে কবি ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। উদ্ভট কবি রসসাগরও ছিলেন তাঁর সভায়। আর সব চেয়ে বিখ্যাত লোক গোপাল ভাঁড় ছিলেন তাঁরই সভাসদ।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: তবে তাঁকে পছন্দ কর না কেন ?

শুধু একটি কারণে। কৃষ্ণনগর থেকে পলাশীর মাঠ মাত্র তিরিশ মাইল দূরে। বাঙলার তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজ এই পলাশীর মাঠে যুদ্ধ করেছিল ১৭৫৭ সালের জুন মাসে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সিরাজকে সাহায্য না করে ইংরেজের পক্ষ নিয়েছিলেন।

দিল্লীর বাদশাহকে তাঁর পূর্বপুরুষ কুড়ি লক্ষ টাকা কর দিতেন, আর ইংরেজকে সাহায্য করে তিনি ক্লাইভের সুপারিশে দিল্লীর বাদশাহের কাছে খেতাব পেলেন রাজরাজেন্দ্র বাহাদুর।

স্বাতি বলল : এ তো মীরজাফরের মতো কাজ হল!

অতটা খারাপ নয়। মানে, বিশ্বাসঘাতকতা না করে প্রথমেই ইংরেজপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। ইংরেজ হেরে গেলে সিরাজের হাতে রক্ষা পেতেন না। তাঁর রাজবাড়িতে পলাশীযুদ্ধের কামান দেখতে লোকে আর আসত না।

স্বাতি বলল : এই বারে তোমার নিজের কথা বলবে না ?

নিজের কথা ?

তারপরেই তার সকৌতুক হাসি দেখে বললুম : বলব বৈকি। দিল্লীর বীরবলের মতো কৃষ্ণনগরের গোপাল চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

কিন্তু দিল্লীর বীরবল অনেক উঁচুদরের রসিক ছিলেন।

আমি বললুম : গোপালকে আমরাই নিচু করেছি। মানে, যে সব গল্প এখন তাঁর নামে প্রচলিত, সেগুলি আদৌ তাঁর কিনা বলা যায় না।

কেন ?

গোপালের চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তিনি খুব হাল্কা স্বভাবের লোক ছিলেন না। তবে নিঃসন্দেহে রসিক ছিলেন। তাঁর আসল নাম গোপাল ভাঁড় নয়, তাঁর নাম ছিল গোপালচন্দ্র নাই। জাতে নাপিত, কিন্তু পেশায় তাঁরা নাপিত ছিলেন না। পিতামহ আনন্দরাম মুর্শিদাবাদে বিখ্যাত তান্ত্রিক ছিলেন, আর পিতা দুলাল-চাঁদের বৈদ্য ও শল্যচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি ছিল। কল্যাণ ও গোপাল ছিলেন দুই ভাই। গোপালের পুত্র অল্পবয়সেই মারা যায়, আর কন্যা রাধারাণীর দুই ছেলে রমেশ ও উমেশেরও কোন বংশধর আজ বেঁচে নেই।

স্বাতি বলল : লোকে তাঁকে ভাঁড় বলত কেন ?

বললুম : ভাণ্ডারী বা ভাণ্ডার থেকে ভাঁড়। গোপালের রূপে ও গুণে রাজা এমন আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে রাজভাণ্ডারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁকে। এই কাজের জন্যেই লোকে তাঁকে গোপাল ভাঁড় বলত। পরে তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরত্ন সভার এক রত্ন হয়ে উঠেছিলেন। হালিশহরের সাধক রামপ্রসাদ ও সভাকবি ভারতচন্দ্রের মতোই রাজা তাঁকে সম্মান করতেন। গোপাল মন্ত্রীর মতো রাজনীতির পরামর্শও দিতেন। এক দিকে বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব, অন্য দিকে ইংরেজ প্রবল হয়ে উঠছে। কেমন করে শান্তিরক্ষা সম্ভব এই পরামর্শ দিতেন গোপাল, আর দুশ্চিন্তায় মগ্ন মহারাজকে হাস্যরস পরিবেশন করে প্রফুল্লও করতেন।

গোপাল যে কবি ভারতচন্দ্রেরও সম্মানের পাত্র ছিলেন তাও জানা যায়। কবির বিদ্যাসুন্দর নাটকে আদিরসের প্রাবল্য দেখে মহারাজা প্রশ্ন করলেন, এ রস আপনি কোথায় পেলেন? সঙ্গে সঙ্গে কবি উত্তর দিলেন,

গোপালচন্দ্র নাই নাম
রসরাজ রসের সাগর।
ভারতচন্দ্র গুণাকর
যার ভণে গুণাকর
মথিলেন সে মহাসাগর॥

স্বাতি চুপ করে ছিল, আর আমি বলছিলুম গোপাল ভাঁড়ের কথা। বললুম : গোপাল ভাঁড়ের রসিকতার গল্প বলব না। অনেক গল্পে সত্যিই সুরুচির অভাব আছে। কোন্‌টা সত্যি গল্প আর কোন্‌টা নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামাবারও দরকার নেই। মুর্শিদাবাদের নবাবকে নিয়েই তাঁর অনেকগুলি গল্প প্রচলিত আছে—আকাশের তারা গোনার গল্প, মহাভারত রচনার গল্প, আরও অনেক গল্প যা সবার সামনেই বলা যায়। কিন্তু আমি এমন একটা গল্প বলব, যা অন্যের নামে প্রচলিত আছে।

বল।

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম : কাশীর গঙ্গায় কৃষ্ণচন্দ্র তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে নৌকোয় বেড়াচ্ছিলেন, সঙ্গে গোপাল ভাঁড়ও আছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ছিল একটি সুন্দর সোনার তরোয়াল। তৈলঙ্গস্বামী সেটি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, এটা আমার রাজদণ্ড, উত্তরাধিকারসূত্রে এটি আমি পেয়েছি। স্বামীজী গোপালকে বললেন, ওটা গঙ্গার জলে ফেলে দাও। গোপাল কোন দ্বিধা না করে রাজার প্রিয় তরোয়ালটি নিয়ে জলে ফেলে দিলেন।

তারপর?

রাজা কোন কথা বলবার সময় পেলেন না, গোপালের পরবর্তী কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এক হাতে স্বামীজীর পা ধরে অন্য হাত জলে ডুবিয়ে তরোয়ালটি খুঁজতে লাগলেন। অলৌকিক ব্যাপার। গোপালের হাতে অলৌকিক ভাবে উঠে এল সেই তরোয়াল। কৃষ্ণচন্দ্র সেই দিন বুঝলেন যে গোপাল শুধু হাসাতেই জানে না, তার মনেও ধর্ম বিশ্বাস গভীর হয়ে আছে।

স্বাতি বলল : কৃষ্ণনগরে তাঁর কোন স্মৃতি নেই?

বোধহয় না। ঘুর্ণি এলাকায় তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে শুনেছি, কিন্তু স্মৃতিচিহ্ন কিছু নেই।

আশ্চর্য তো!

বললুম : আশ্চর্য হচ্ছ কেন! ঐতিহাসিকেরা তো গোপাল ভাঁড়ের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

তবে এতক্ষণ এই বংশপরিচয় কার দিলে?

বোধহয় কোন প্রবন্ধে পড়েছিলুম। কিংবা কোন বটতলার বইএ দেখেছি। গোপাল ভাঁড়ের নামে নানা মজার গল্প তারা ছেপে

বার করেছে। আর সাধারণ ভাবে এ অঞ্চলের লোক এ সব গল্প বিশ্বাসও করে।

তবে ঐতিহাসিকেরা কেন মানেন না?

তার প্রধান কারণ হল, কবি ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমস্ত সভাসদ ও পাত্রমিত্রের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের নাম করেন নি। গোপাল ভাঁড় নামের কোন সভাসদ থাকলে কবি নিশ্চয়ই তাঁর নাম লিখতেন। যাঁরা গোপাল ভাঁড়কে মানেন, তাঁরা মনে করেন যে এ কবির ঈর্ষার কথা। কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল ভাঁড়কে বেশি ভালবাসতেন বলে নাকি কবি তাঁকে অস্বীকার করেছেন তাঁর কাব্যে—অথচ গোপাল ভাঁড় যে ভারতচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করতেন, তার প্রমাণ রেখে গেছেন একটা পরিহাসের কথায়।

তারপরে সেই গল্পটি স্বাতিকে বললুম। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভারতচন্দ্রকে খুব হিংসা করতেন। তাই গোপাল ভাঁড় এক দিন অন্নদামঙ্গলের পুঁথিখানি বাণেশ্বরের হাতে দিয়ে পড়তে বললেন। বাণেশ্বর যখন নিতান্ত অবহেলাভরে পুঁথির পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, গোপাল ভাঁড় তখন চেঁচিয়ে উঠলেন, কর কি ঠাকুর, এ তোমার শুকনো ন্যায়শাস্ত্র নয়, এ হল রসের কাব্য। সামলে না ধরলে সমস্ত রস গড়িয়ে পড়ে যাবে।

স্বাতি বলল: তোমার বক্তব্য আরও জটিল হয়ে পড়ছে।

বললুম: তা পড়বেই। সংস্কৃত ভণ্ড থেকে ভাঁড়, ভাঁড় থেকে ভাঁড়ামি। তার মানে লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে যে বহুরূপী হতে পারে, সেই হল ভাঁড়। এ রকম কোন ভাঁড় কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু শংকরতরঙ্গ নামে একজন সভাসদের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চতুর ও রসালাপী

ছিলেন। তাঁরই গল্প লোকে গোপাল ভাঁড়ের নামে চালিয়েছে কিনা বোঝা মুস্কিল।

স্বাতি বলল : ঘুর্ণিতে গিয়ে আমরা খোঁজ করব।

হেসে বললুম : সেখানে গিয়ে শুধু কেষ্টনগরের পুতুলই দেখবে।

তা হোক, তবু নামব।

আর কলকাতায় ফিরব সরপুরিয়া আর সরভাজা খেয়ে।

৩৪

ট্রেন এখন থেমে থেমে চলেছে। এক সময় পলাশী স্টেশনে এসে দাঁড়াল, আবার চলতে লাগল।

সেকালে রানী ভবানীর জমিদারী ছিল এই পলাশী। এক লাখ আমগাছ তিনি এখানে লাগিয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল এই আমবাগানে। শেষ আমগাছটি শুকিয়ে গিয়েছিল প্রায় এক শো বছর আগে। ইংরেজ তার মূল উপড়ে বিলেতে নিয়ে গেছে যুদ্ধ-জয়ের স্মৃতিচিহ্ন রাখবার জন্যে।

কিন্তু সত্যিই কি তারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল!

ইংরেজের রাজত্বকালে প্রকাশিত বাঙলার ইতিহাসে এর সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাঙালী ঐতিহাসিককে আবার অনুসন্ধান করতে হবে।

বাঙলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দী খাঁর দৌহিত্র ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবক বলে দুর্নাম ছিল তাঁর। দাদামহাশয়ের আদরে নাকি আরও অধঃপাতে যাচ্ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তিনিই নবাব হয়ে সিংহাসনে বসলেন।

যে ভাবে তিনি ইংরেজকে পর্যুদস্ত করেছেন নানা জায়গায়, তাতে তাঁকে বীর বলে স্বীকার করতেই হবে। কাশিমবাজারে ইংরেজদের কুঠী তিনি অধিকার করেছিলেন। কলকাতা থেকে সব ইংরেজকে তাড়িয়ে তিনি তার নাম রেখেছিলেন আলিনগর। অন্ধকূপ হত্যার দায়িত্ব ইংরেজরা অকারণে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধেও তাঁর জয় হত। তাঁর প্রধান সেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধ করে নি। তাতে ক্ষতি হয় নি। মোহনলাল ও মীরমদন দুজনেই সমস্ত ইংরেজ সৈন্য শেষ করে ফেলছিল।

অন্ধকারের অপেক্ষা করছিলেন ক্লাইভ। মীরজাফরের পরামর্শে স্থির করেছিলেন যে রাতের অন্ধকারে নবাবের শিবির আক্রমণ করবেন।

কিন্তু একটা আচমকা আঘাতে মীরমদনের মৃত্যু হল। একা তাঁর সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন মোহনলাল।

মীরজাফরকে ডেকে সিরাজ যা বলেছিলেন, তা মনে রাখবার মতো। বলেছিলেন, আপনি বাঙালী, আমার আত্মীয়। আগে দেশকে রক্ষা করুন, তারপরে আমার দোষ বিচার করে আমাকে শাস্তি দেবেন।

মীরজাফর সিরাজকে বলেছিলেন, আজ যুদ্ধ বন্ধ করবার হুকুম দিন, কাল সকালে আমি যুদ্ধে নামব। আর ক্লাইভকে খবর পাঠিয়েছিলেন, আর ভয় নেই, রাতের অন্ধকারেই কাজ হাঁসিল করুন।

নবাবের হুকুম মোহনলালকে মানতে হয়েছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মোহনলাল পিছন ফিরেছিলেন। আর বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর তাঁকে আক্রমণ করিয়েছিলেন পিছন থেকে।

যুদ্ধে হেরে গিয়েও ইংরেজ বাঙলা জয় করেছিল মীরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে। পলাতক সিরাজকে তিনি হত্যা করিয়েছিলেন।

সিরাজ বাঙলার টিপু সুলতান। ইংরেজ এই দুজনকেই ভয় পেত। আর এই দুজনেই প্রাণ দিয়েছেন স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে। টিপু সুলতানকে আমরা আবিষ্কার করেছি। কিন্তু সিরাজ-উদ্দৌলার সত্য পরিচয় এখনও অজ্ঞাত আছে। সিরাজের পরাজয়ে বাঙলার পরাজয় হয়েছে, লুপ্ত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা।

পলাশী থেকে মুর্শিদাবাদের দূরত্ব হবে ত্রিশ মাইল। কলকাতা থেকে এক শো তেইশ মাইল। তার আগেই বহরমপুর স্টেশন।

অনেকে বলে যে এ জায়গার নাম আগে ব্রহ্মপুর ছিল। একটি পুরনো গ্রাম। পলাশীযুদ্ধের পরেই এ জায়গা বেড়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদের উপরে নজর রাখবার জন্যে ইংরেজ একটা সেনানিবাস

তৈরি করে যুদ্ধের দশ বছর পরেই। ক্যাণ্টনমেণ্ট না বলে লোকে তাকে গোরা ব্যারাক বা গোরা বারিক বলত। এক শো বছর পরে এই ব্যারাক উঠে যায়, কিন্তু গোরা কথাটা এখনও আছে গোরা-বাজারে। ব্যারাকে এখন অফিস কাছারি ও সরকারী বাসস্থান হয়েছে, আর জেলখানা হয়েছে গোরাদের হাসপাতাল।

স্বাতি এতক্ষণ নীরবে ছিল। বহরমপুর স্টেশনে পৌঁছে প্রশ্ন করল: আমরা কি মুর্শিদাবাদ স্টেশনেই নামব?

আমি বললুম: সেই রকমই তো কথা ছিল।

কিন্তু সেখানে নাকি যানবাহনের ভারি অসুবিধে।

সাইকেল-রিক্সা ঠিকই পাওয়া যাবে।

স্বাতি বলল: আমি শুনেছি বহরমপুরে টুরিস্ট-লজ আর দু-একটা হোটেল আছে। মুর্শিদাবাদ দেখতে এলে লোকে বহরমপুর থেকেই যাতায়াত করে।

তাহলে বোধহয় রাত্রিবাস করতে হয় বহরমপুরে।

ট্রেন এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। বহরমপুর ছেড়ে কাশিম-বাজারে এসে আবার থামল। তারপরে মুর্শিদাবাদ পৌঁছবে।

স্বাতি বলল: এমন ঘন ঘন স্টেশন হয়েছে কেন জানি না।

বললুম: এক সময় এই অঞ্চল যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল এ তারই পরিচয়। বিদেশীরা এ দেশে বাণিজ্য করতে এসে প্রথমে সপ্তগ্রামে কুঠী তৈরি করেছিল। সপ্তগ্রামের পতনের পরেই তারা কলকাতায় আসে নি, এসেছিল এই অঞ্চলে। এখানে রেশমের ব্যবসা বিখ্যাত ছিল, ছিল কাঁসার বাসন, আর হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কাজ। গালগল্প কিনা কে জানে, লোকে বলত, শহরের এক প্রান্তে এক বাড়ির ছাদে উঠলে শহরের অন্য প্রান্তে গিয়ে ছাদ থেকে নামা চলত। কিন্তু এখন কাশিমবাজার দেখলে লোকে একে পাগলের গল্প বলবে।

স্বাতি বলল: তুমি এ কথা কোথায় শুনলে?

বললুম: 'বাঙলায় ভ্রমণ' নামে একখানা পুরনো বইএ এ

রকমের অনেক কথা আছে। কিন্তু এ সব কথা আর কোনও বইএ আমি পড়ি নি।

মুর্শিদাবাদে নামবার জন্যে আমরা তৈরি হয়ে নিয়েছিলুম। আর এই অবসরেই কাশিমবাজারের গল্প শোনালুম স্বাতিকে।

কলকাতা ফেঁপে উঠবার আগে বিদেশীরা এই অঞ্চলে এসে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। কাশিমবাজারে ইংরেজ, কালিকাপুরে ওলন্দাজ আর ফরাসী ও আর্মেনিয়রা ছিল সৈদাবাদে। আর্মেনিয়দের শ্বেতা খাঁ বলত কেন জানি নে। তবে তারা যেখানে ব্যবসা করত সে জায়গার নাম হয়েছিল শ্বেতা খাঁর বাজার। এখন আমানিগঞ্জ বলে। আর ফরাসীরা যেখানে ছিল, তার নাম হয়েছে ফরাসডাঙা।

সে সময়ে এখানকার গঙ্গায় নাকি মস্ত বড় একটা বাঁক ছিল। তাই নৌকোয় বহরমপুর থেকে মুর্শিদাবাদ যেতে গোটা একটি দিন সময় লাগত। ব্যবসার সুবিধার জন্যে নাকি একটি খাল কেটে গঙ্গার প্রবাহকে সোজা করা হয়েছে।

এর পরেই একটা কথা মনে পড়ে গেল। 'বাঙলায় ভ্রমণে' এই কথা পড়ে এমন কৌতুক বোধ হয়েছিল যে মনে রেখেছি বেশ কষ্ট করে। স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়েই কিছু অনুমান করে জিজ্ঞাসা করল: কী মনে পড়েছে বল তো?

বললুম: সেকালের কাশিমবাজারে যে সব কাপড় তৈরি হত তার নাম।

শুনি।

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম: ইয়োরোপের জন্যে গাউনপিস কোড়া, আরবের জন্যে রেখাধারী ও চারখানা, বর্মার জন্যে ফুলিকাট চেক, আসামের জন্যে মেখলা রিয়া আর মহারাষ্ট্র ও বাঙলার জন্যে মটকা ও চেলির ধুতি শাড়ি।

স্বাতি বলল: এর জন্যে এমন কৌতুকের কী কারণ আছে?

বললুম: কৌতুক হবে ধুতি ও শাড়ির পাড়ের নাম শুনে। বলব?

বল।

সাদা রেশমের তাজপাড় কল্‌কাপাড় পদ্মপাড় ভোমরাপাড় শাড়ি, ধানী, কট্‌কাপাড় ফিতেপাড় ঘুন্‌সিপাড় চুড়িপাড় ধুতি, বালুচর বুটিদার শাড়ি।

স্বাতি বলল: বালুচর নাম তো এখনও আছে!

কিন্তু এর পরে আর কোন কথা হল না। মুর্শিদাবাদে এসে ট্রেন থামতেই আমরা নেমে পড়লুম। তারপরে প্ল্যাটফর্মের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলুম যে অনেকগুলো রিক্সা অপেক্ষা করছে। তাদেরই একজনের সঙ্গে সব কিছু দেখাবার চুক্তি করে আমরা উঠে পড়লুম। মতিঝিল দেখিয়ে সে আমাদের বহরমপুর স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

রিক্সা দেখে আমি রিক্সাওয়ালা ঠিক করি নি, ভাড়া দেখেও না। যে ছেলেটির মুখ দেখে প্রসন্ন মেজাজের বলে মনে হয়েছিল, তাকেই আমি পছন্দ করেছিলুম। ভেবেছিলুম যে সে-ই আমাদের গাইডের কাজ করবে। স্বাতি আমার মতলব বুঝতে পেরেছিল। তাই রিক্সায় বসেই বলল: আগে ইতিহাসের কথা বল, পরে ওর গল্প শুনব।

বললুম: তাহলে তো প্রথমে এই শহরের জন্মকথা বলতে হয়। কিন্তু সে বিচারে এ খুব পুরনো শহর নয়। মোগল আমলে ঢাকায় ছিল বাঙলার রাজধানী, ঢাকার নবাবরা দিল্লীর অধীন ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যিনি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আনলেন বাঙলার রাজধানী, তাঁর নাম মুর্শিদকুলী খাঁ। জাতে তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ব্রাহ্মণের নাম মুর্শিদকুলী খাঁ?

কেন, বাঙলার নিষ্ঠুর হিন্দুবিদ্বেষী কালাপাহাড়ও তো ব্রাহ্মণ

ছিলেন। নবাব বাদশাহদের অনুগ্রহ লাভের জন্যেই তাঁরা মুসলমান হতেন। এ যুগের অনেকে যেমন ইংরেজের প্রীতির জন্যে খ্রীষ্টান হয়েছেন ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে।

তারপর বল।

এই মুর্শিদকুলী খাঁর নামেই মুর্শিদাবাদ নাম। তার আগে মুখসুদাবাদ নাম ছিল, না অন্য কিছু সে তর্ক তুলব না। হল্‌ওয়েল সাহেবের বইএ মুখসুদাবাদ নাম আছে, সেইটেই মেনে নেওয়া যাক।

স্বাতি বলল: এই নামের কোন লোকও নিশ্চয়ই ছিলেন!

এক নানকপন্থী সন্ন্যাসীর নাম ছিল মধুসূদন দাস। সুলতান হুসেন শাহর রোগ সারিয়ে এই জায়গাটা লাখেরাজ পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর নামেই জায়গাটার নাম হয়েছিল মুখসুদাবাদ।

তেমন জুতসই জবাব হল না।

তাহলে আরও অনেক মতের কথা বলতে হয়।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: তর্কের কথা থাক।

যে পথ ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলুম, তাকে ভাল রাস্তা মোটেই বলা যায় না। স্বাতি সেই কথা বলতেই রিক্সাওয়ালা বলল: স্টেশনের পূর্বদিক দিয়ে গেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে। সে খুব ভাল রাস্তা। আমরা এখন সেই দিকেই চলেছি। পরে পশ্চিমে গঙ্গার দিকে যাব।

অনেক কথাই তার কাছে জানলুম। মুর্শিদাবাদের পরের স্টেশন নশীপুর রোড, তারপরেই জিয়াগঞ্জ। জিয়াগঞ্জে গঙ্গা পার হলেই ওপারে আজিমগঞ্জ। সেখান থেকেই রানী ভবানীর বড়নগর ও সাধক বাগ দেখতে হয়।

এখানেও লালবাগ খেয়াঘাট থেকে গঙ্গা পার হয়ে লোকে খোশবাগ দেখতে যায়। নবাব আলিবর্দী খান নিজের সমাধির জন্যে এই খোশবাগ রচনা করেছিলেন। এরই মধ্যে সমাধি আছে সিরাজ ও লুৎফার, আর দানশা ফকিরের। সিরাজ যখন

লুৎফাকে নিয়ে রাজমহলের পথে পালাচ্ছিলেন, এই ফকির তখন সিরাজকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেন। তারই পুরস্কার এই সমাধি।

কিরীটেশ্বরীর মন্দিরও দেখে অনেকে। গুপ্তমঠ কালী ও শিবের মন্দির, কালীসাগর। রাজা দর্পনারায়ণ ডাহাপাড়ায় বাস করতে এসে এই সব নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পৌষ মাসের মেলায় এখনও অনেক লোক আসে। কিরীটেশ্বরী এক সময় এ অঞ্চলের জাগ্রত দেবতা ছিলেন। মীরজাফরের নাকি কুষ্ঠ-রোগ হয়েছিল। সেই যন্ত্রণার উপশমের জন্যে দেবীর চরণামৃত পান করেছিলেন মহারাজ নন্দকুমারের পরামর্শে।

ডাহাপাড়ার পূর্বেই হীরাঝিলের ধ্বংসাবশেষ। হীরাঝিল হল সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদ। এপারে ঘসেটি বেগমের মতিঝিল আর ওপারে সিরাজের হীরাঝিল।

স্বাতি বলল: ঘসেটি বেগমের নাম শুনেছি, কিন্তু কে তা মনে পড়ছে না।

বললুম: নবাব আলিবর্দী খানের বড় মেয়ের নাম মেহেরউন্নিসা, লোকে তাঁকেই ঘসেটি বেগম বলত। এঁর বিয়ে হয়েছিল নবাবের ভাইপো নৌজেস মহম্মদের সঙ্গে। বেগমের জন্যে ইনিই মতিঝিলের ধারে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করেছিলেন গৌড় থেকে পাথর এনে। লোকে বলে যে মতিঝিলের সৌন্দর্যের কথা শুনে ঈর্ষান্বিত সিরাজ তাঁর দাদামশায়কে বলেছিলেন, তাঁরও একটা নিজের প্রাসাদ চাই। এ কথা শুনে আলিবর্দী নাকি বলেছিলেন, দুজন ফকির একখানা কম্বলে শুতে পারে, আর আমরা একটা প্রাসাদে থাকতে পারব না! সিরাজ উত্তর দিয়েছিলেন, এক বনে যেমন দুটি পশুরাজ থাকতে পারে না, তেমনি এক প্রাসাদে দুজন নবাবের স্থান হয় না। এর পরেই হীরাঝিল তৈরি হয়েছিল গঙ্গার ওপারে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এখন কি সেখানে দেখবার কিছুই নেই?

রিক্সাওয়ালার কথায় বোঝা গেল যে এক সময়ে যে সেখানে কিছু ছিল, সেইটুকুই দেখতে পাওয়া যায়। আর গল্প শোনা যায় যে অনেকগুলি মহল ছিল প্রাসাদে—এমতাজমহল রঙমহল মহালসরা চেহেলসাতু। আফগানিস্থান থেকে নারগিস ও হারসিঙ্গা, বসরা থেকে গোলাপ ও কাশ্মীর থেকে জাফরান এনে হীরাঝিলের বাগানে লাগিয়েছিলেন সিরাজ। জ্যোৎস্না রাতে হীরাঝিলে আলোকিত প্রাসাদের ছায়া হীরার মতো ঝকমক করত।

এর কাছেই হল রোশ্‌নিবাগ। তার বয়স অনেক বেশি। মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দীনের সমাধি তার ভিতরে। তিনি ছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা। বিলাসী বলে খ্যাত এই নবাবের জাঁকজমকের গল্প কিংবদন্তীর মতো হয়ে আছে। বেড়া উৎসবের রাতে নবাব হাতির পিঠে বেরোতেন শোভাযাত্রা করে। পিছনে চলতেন ওমরাহ ক্ষপণক নর্লাক রিসালদার তামামদার আশা সোটা বল্লমবরদা ছাতা পাখা-বরদা যশওয়াল জিমোদার চৌসান। আরবী ও ইরাকী ঘোড়ার পিছনে নহবং। সকলের পিছনে পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী ও পঁচিশ হাজার পদাতিক সেনা। এ সব কথা এখন গল্পের মতো মনে হয়।

রিক্সাওয়ালা বলল : ভাস্কর পণ্ডিত এই রোশ্‌নিবাগের সামনে একটি শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে মন্দির এখনও আছে।

স্বাতি বলল : ভাস্কর পণ্ডিতের নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।

বললুম : কোনও বাঙালী পণ্ডিত নয়, ভাস্কর পণ্ডিত ছিলেন মারাঠা বর্গীদলের সর্দার বা সেনাপতি। বর্গীদের উপদ্রবে বাঙলার গরীব প্রজাদের প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত। মুর্শিদাবাদের নবাব শুনেছি কৌশলে এই ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করেছিলেন। বারে বারে তিনি সন্ধি করতেন টাকা পয়সা দিয়ে, আর বারে বারে তারা সন্ধি ভঙ্গ করে

ফিরে আসত। একবার অনেক টাকা দেব বলে ডেকে এনে লুকনো সৈন্য দিয়ে ঘিরে ফেললেন। আর তাকে হত্যা করলেন মানকরা ভাস্করদহে।

আমরা তখন বড় রাস্তায় পৌঁছে কাট্‌রা মসজিদের দিকে চলেছিলুম। বললুম: গঙ্গার ওপারে আর একটি ঐতিহাসিক স্থান আছে। তার নাম রাঙ্গামাটি, ইতিহাসের নাম কর্ণসুবর্ণ। বাঙলার প্রথম রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: কত দূর এখান থেকে?

বললুম: বহরমপুরের ওপারে খাগড়াঘাট স্টেশন। সেখান থেকে ছ সাত মাইল দক্ষিণে।

কিন্তু এ নিয়ে আর কিছু আলোচনার সুযোগ আমরা পেলুম না। আমাদের রিক্সা এসে কাট্‌রা মসজিদের সামনে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম।

কাট্‌রা মানে বাজার। কাট্‌রার মধ্যে নির্মিত হয়েছিল বলে মসজিদের নাম কাট্‌রা মসজিদ। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন মক্কার কাবা মসজিদের অনুকরণে। নবাবের সমাধিও এই মসজিদের সিঁড়ির নিচে একটি ঘরে। জীবিত অবস্থাতেই তিনি এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

মসজিদের এখন জীর্ণ দশা। চারি পাশের ছোট ছোট ঘরগুলো আছে। এই সব ঘরে মুসাফীর ও কারীরা থাকত। কোরাণ পাঠকদের বলে কারী। দু'ধারের দুটি উঁচু মিনারের একটায় বোধহয় এখনও ওঠা যায়। উপরে উঠবার ইচ্ছা আমার ছিল না, তবু বললুম: এসো, ওপরে উঠে মুর্শিদাবাদ শহরটা এক নজরে দেখে নিই।

স্বাতি আমার হাত টেনে ধরে বলল: না না, ওপরে উঠে কাজ নেই।

আমি জানি, কেন সে এ কথা বলল। আর সেই সঙ্গেই মনে পড়ল দিল্লীর কুতুবমিনারে ওঠার কথা। সে নিজেই আগে ছুটে

গিয়েছিল, আশা করেছিল আমি তাকে অনুসরণ করব। আজকের এই ভয় দেখে আমার হাসি পেল।

রিক্সায় উঠে এবারে আমরা তোপখানায় এলুম জাহানকোষা কামান দেখতে। বিষ্ণুপুরের দলমাদলের মতো, বারো হাত লম্বা, আর বেড় প্রায় তিন হাত। ওজন দু'শো মণের বেশি। উনত্রিশ সের বারুদ লাগত একটা গোলা দাগতে। লোকে বলে ঢাকার জনার্দন কর্মকার এই কামানটি তৈরি করেছিল শাহজাহানের আমলে।

মদিনার সামনে বাচ্চাওয়ালী তোপ নামে আর একটি কামান আছে তিন নলা। তার শব্দে নাকি মেয়েদের গর্ভপাত হত।

তোপখানা থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলে পুরনো ফকিরদের আড্ডা কদমশরিফ। কিন্তু সেদিকে আমরা গেলুম না। রিক্সাওয়ালা আমাদের গঙ্গার ধারে হাজারদুয়ারী রাজপ্রাসাদের সামনে এনে হাজির করল।

ইতালীয় শৈলীতে তৈরি বিশাল প্রাসাদ। এক হাজার দরজার জন্যে এর হাজারদুয়ারী নাম। সামনে থেকেই অনেকগুলো সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। অত্যন্ত চওড়া সিঁড়ি, এক সঙ্গে কয়েক শো লোক ওঠানামা করতে পারে।

এই প্রাসাদের ভিতরে দ্রষ্টব্য হল একটি অস্ত্রাগার, লাইব্রেরি ও চিত্রসংগ্রহ। গাইডরা নাকি বলে যে এর ভিতরে শুধু আলিবর্দী ও সিরাজের অস্ত্র নয়, বিক্রমাদিত্যের বর্শা ও পারস্যের সম্রাট নাদির শাহর ঢালবর্শা ও লৌহজাল আর সেনাপতি রুস্তমের লৌহ শিরস্ত্রাণও আছে। লাইব্রেরিতে আছে আকবর বাদশাহর মন্ত্রী আবুল-ফজলের স্বহস্তে লেখা আইন-ই-আকবরী ও অনেক উর্দু ও ফার্সি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। চিত্রসংগ্রহের মধ্যে র‍্যাফেল মার্শাল টিশিয়ান ও ভ্যানডাইকের ছবিও আছে।

কিন্তু এ সব দেখবার জন্যে অনুমতির দরকার। তাই খোলা ঘরগুলোর ভিতর দেখেই আমরা বেরিয়ে এলুম।

নিকটেই ইমামবাড়া ও মদিনা। সিরাজউদ্দৌলার তৈরি কাঠের ইমামবাড়া আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। বর্তমানের বিশাল ইমামবাড়া তৈরি হয়েছে এক শো বছরের কিছু বেশি আগে।

হাজারদুয়ারীও খুব পুরনো বাড়ি নয়। পলাশী যুদ্ধের আশি বছর পরে নবাব নাজিম হুমায়ুন জা এই বাড়ি তৈরি করেন। সে সময়ে আঠারো লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। আর লোকে বলে যে তখন মিস্ত্রীর মজুরি দু আনা আর এক আনা ছিল সাধারণ মজুরের দৈনিক মজুরি।

নবাবদের নতুন প্রাসাদও বেশি দূরে নয়। দূরে অন্য সব দর্শনীয় স্থান। মীরজাফরের প্যালেস জগৎশেঠের বাড়ি ও কাঠগোলা উত্তর দিকে, আর মতিঝিল ও রাধামাধবের মন্দির দক্ষিণে বহরমপুরের দিকে। রিক্সাওয়ালার কাছে এই খবর পেয়ে স্বাতি ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল : বিকেলের আগে ফেরার গাড়ি ধরা যাবে না।

বললুম : তা বুঝতেই পারছি।

স্বাতি বলল : তাড়া না করে ধীরে ধীরেই সব দেখা যাক।

বলে একটা গাছতলায় এসে বসল। সঙ্গে তার ব্যাগটাও এনেছিল। বলল : কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। তারপরে নতুন উদ্যমে সব দেখা যাবে।

বলে রিক্সাওয়ালাকেও ছুটি দিল কিছুক্ষণের জন্যে।

খেতে খেতে আমি বললুম : রবার্ট ক্লাইভ একটা মজার কথা বলেছিলেন।

কী কথা ?

পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের পরে তিনি মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে। এই শহর দেখে তিনি লিখেছিলেন, মুর্শিদাবাদ শহর লণ্ডনের মতোই বিশাল জনবহুল ও সমৃদ্ধ। প্রভেদ এই যে মুর্শিদাবাদে এক একজনের এত ধন আছে যে লণ্ডনের কোন অধিবাসীর তা নেই। শেষের কথাটি

বোধহয় তিনি জগৎশেঠকে দেখে বলেছিলেন। কিন্তু প্রথম কথাটি সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।

কেন ?

ক্লাইভ তো হাজারদুয়ারী আর ইমামবাড়ার এই বাড়ি দেখেন নি। যা দেখে এই কথা লিখেছিলেন, তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হীরাঝিল তো গঙ্গার গর্ভে, মতিঝিলে কী আছে জানি নে।

স্বাতি বলল ঃ সত্যি বলতে কি, ইতিহাসের টুকরো কথাই শুনতে বেশি ভাল লাগছে।

খেয়েদেয়ে আবার আমরা যাত্রা করলুম। প্রথমে উত্তরে গেলুম, তারপরে দক্ষিণে। কোন জায়গাই তেমন আকর্ষণীয় নয়। জাফরাগঞ্জের সমাধিক্ষেত্র ছাড়িয়ে পথের বাঁ ধারে মীরজাফরের ভাঙা প্রাসাদ। মীরজাফর দু'বার নবাব হয়েছিলেন। তাঁর জামাই মীরকাশেম রাজধানী তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন মুঙ্গেরে।

জগৎশেঠের বাড়িও নাকি গঙ্গার গর্ভে গেছে। তার ধ্বংসাবশেষ আমরা দেখলুম। আর তাঁর ঠাকুরবাড়ি। জগৎশেঠ কারও নাম নয়, এ একটা উপাধি। ইন্দ্রচাঁদ ছিলেন মুর্শিদাবাদের শেষ জগৎশেঠ।

কাঠগোলার বাগান যে ঐতিহাসিক নয়, তা সেখানে গিয়েই জানতে পারলুম। এই সুন্দর বাগানের মধ্যে পরেশনাথের মন্দির।

নশীপুরের রাজবাড়ি এই দিকেই। কিন্তু কোথায় যেন পড়েছিলুম যে এই বংশের দেবীসিং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাঙলার প্রজাদের কাছে রাজস্ব আদায়ের জন্যে অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন। এ অঞ্চলের অনেক রাজা মহারাজাই অবাঙালী। বাঙালী হলেন কাশিমবাজারের রাজা। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ছিলেন ইংরেজ কুঠীর গোমস্তা।

এবারে আমরা মতিঝিলের দিকে চললুম। রিক্সাওয়ালা তার জ্ঞানের কথা মাঝে মাঝেই শোনাচ্ছিল। ঝিলের জলে মুক্তা পাওয়া যেত বলে ঝিলের মতিঝিল নাম হয়েছে। সে যুগে

এক একটা মুক্তোর দাম ছিল দু'শো টাকা। মতিঝিলে নবাব প্রাসাদের নাম ছিল সাংহীদালান। ফরাসী ভাষায় সাংহী মানে পাথর। এখন এই জায়গার নাম কোম্পানীবাগ। প্রাসাদ আর নেই।

মতিঝিলে পৌঁছে আমরা কতকটা হতাশ হলুম। একটি অনাদৃত ঝিল আর সমাধিস্থান দেখলুম। তার নাম কালা মসজিদ। আর দরজা জানালাহীন একটি বিরাট ঘর দেখতে পেলুম। তার গল্প শুনলুম রিক্সাওয়ালার কাছে। ঘসেটি বেগমের ধনরত্ন নাকি এই ঘরে লুকনো আছে। এক সাহেব এই ঘর ভাঙবার জন্যে মজুর লাগিয়েছিল। তারা নাকি রক্তবমি করে মারা যায়। আর সাহেবও আত্মহত্যা করে।

তার পরে বলল: সত্যকথা কিন্তু তা নয়। সিরাজ মতিঝিল লুঠ করে ঘসেটি বেগমকে নিজের হারেমে ধরে নিয়ে যাবার সময় তাঁর সহচরীদের এইখানে মেরে কবর দিয়ে যান। পরে এই ঘর করে ঢেকে দিয়েছিলেন জায়গাটা।

মতিঝিলের কাছেই রাধামাধবের মন্দির। লোকে চার শো বছরের পুরনো বলে মনে করে। রাধামাধবের সম্বন্ধেও একটা গল্প শোনাল রিক্সাওয়ালা। এই মন্দিরের আরতির শব্দে নৌজেস ও ঘসেটি বেগমের নমাজে বিঘ্ন হত, তাই দেবতাকে দূষিত করবার জন্যে নিষিদ্ধ মাংস ফুল দিয়ে ঢেকে নিবেদন করতে পাঠালেন। সরল বিশ্বাসে পুরোহিত তা নিবেদন করে ফেরত দিতেই দেখা গেল যে পাত্রে আছে কয়েকটি যুঁই ফুল।

এখান থেকে আমরা মুর্শিদাবাদ স্টেশনে ফিরে এসে ট্রেন ধরতে পারতুম, কিন্তু স্বাতির ইচ্ছায় এগিয়ে গেলুম বহরমপুরের দিকে। আর সৈদাবাদে পৌঁছবার ঠিক আগে কুঞ্জঘাটায় একটি জীর্ণ বাড়ি দেখিয়ে রিক্সাওয়ালা বলল মহারাজ নন্দকুমারের বাড়ি।

স্বাতি বলল: নন্দকুমারের সম্বন্ধে কিছু বল নি।

বললুম: বড়লাট হেস্টিংস সাহেবের বন্ধু বিচারপতি এলিজা

ইম্পে তাঁর ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সেই বিখ্যাত মামলার দলিল আছে।

তার পরে তাঁদের বিবাদের গল্প সংক্ষেপে বললুম।

এক সময় ওরারেন হেস্টিংস এখানকার ইংরেজ কুঠীতে কর্মচারী ছিলেন, আর কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্স্ সাহেব। সিরাজ দুজনকেই নাকি বন্দী করেছিলেন, আর কলকাতার কেরী সাহেব মুক্তিপণ দিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেন। হেস্টিংসের প্রথমা স্ত্রী মেরী ও শিশুকন্যা এলিজাবেথের সমাধি আছে কাশিমবাজারে। মহারাজ নন্দকুমার তাঁকে খুব ভাল করেই জানতেন। তাঁর ঘুষ নেবার অনেক দলিলপত্র ছিল তাঁর কাছে। নন্দকুমার এই নিয়ে লড়তে গিয়েছিলেন বড়লাটের সঙ্গে। এই জন্যেই বোধহয় লোকে তাঁর নাম রেখেছিল কালা কর্ণেল।

ভারতের প্রথম বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর বিরুদ্ধে নানা জনে নানা অভিযোগ তুলেছে। শাসন পরিষদের সভ্যরাও এই সব অভিযোগের কথা শুনলেন। সুবিচারের আশায় নন্দকুমার দলিলপত্র নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু হেস্টিংস এই প্রসঙ্গ শাসন পরিষদে উঠতে দিলেন না। আর মোহনপ্রসাদ নামে একজনকে লেলিয়ে দিলেন নন্দকুমারের পিছনে। সে আনল নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একটা জালিয়াতির মামলা। হেস্টিংসের পরমবন্ধু ইম্পে এই মামলায় নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম দিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে নিজের প্রাণ দিলেন, কিন্তু তাঁর সেই মৃত্যু ব্যর্থ হয় নি। হেস্টিংসের বিচার হয়েছিল তাঁর নিজের দেশে। ইম্পিচ্মেণ্ট অফ ওয়ারেন হেস্টিংস। সেই বিচারসভায় এড্মণ্ড্ বার্কের বক্তৃতা আজও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ি, আর সে যুগের ইংরেজকে শ্রদ্ধা করি সত্যবাদিতার জন্যে। অন্যায়কে তারাও ঘৃণা করত। ফাঁসির আসামী নন্দকুমারকে তারাও শ্রদ্ধা জানিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

দুপুরের ট্রেন আমরা ধরতে পারলুম না। বহরমপুর স্টেশনে এসে যে ট্রেন পেলুম তা ছাড়ল প্রায় বিকেল পাঁচটায়।

রিক্সায় চেপে স্টেশনে আসবার পথেই শহরের একাংশ দেখতে পেয়েছিলুম। বেশ বড় ও ভাল শহর। কলকাতার বাইরে এ রকম শহর আর দেখি নি। কোর্ট কাছারির সামনে বিরাট মাঠ, কৃষ্ণনাথ কলেজ, গঙ্গার তীর ও লালবাঁধ এই সবই দেখবার জায়গা। কিন্তু দুপুরে ঘুরে কিছু দেখবার ইচ্ছা ছিল না বলে স্টেশনে এসেই আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম। আর চা খেয়ে উঠেছিলুম ফেরার গাড়িতে।

গাড়ি ছাড়তেই স্বাতি বলল: নবদ্বীপ আজ আর দেখা হবে না মনে হচ্ছে।

বললুম: কৃষ্ণনগরে নেমে গঙ্গা পার হতে গেলেই অন্ধকার হয়ে যাবে।

স্বাতি বলল: না, নবদ্বীপে আমরা রাত কাটাব না।

বললুম: নবদ্বীপে রাত কাটাবার প্রশ্ন তো আর আসে না। আমরা তো কলকাতার টিকিট কেটেছি। আজই আমাদের ফিরতে হবে।

এবারে আমরা থার্ড ক্লাসেই উঠেছি। কাছাকাছি অনেক যাত্রী আছেন। কিন্তু আমরা বসেছি জানালার ধারে মুখোমুখি। এবারে আর শুয়ে ঘুমোবার জায়গা নেই, এবারে আমাদের গল্প করেই কাটাতে হবে।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পরে স্বাতি বলল: নবদ্বীপে তুমি কখনও যাও নি?

বললুম: অনেক দিন আগে একবার গিয়েছিলুম।

বল না কী দেখেছিলে ?

সব কথা তো ভাল মনে নেই !

দাম বাড়াচ্ছ কেন !

বলে যা মনে আছে তাই বলবার জন্যেই অনুরোধ করল।

কৃষ্ণনগরে নেমে নবদ্বীপে কেন গিয়েছিলুম, সে কথা মনে পড়ছে না। ছোট লাইনের ট্রেনে চেপে আট মাইল দূরে নবদ্বীপঘাট স্টেশনে পৌঁছতে অনেক সময় লাগে। তাই একখানা টেম্পোয় গাদাগাদি হয়ে চেপে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলুম। তার পরে খেয়া-নৌকোয় চেপে ওপারে নবদ্বীপে পৌঁছেছিলুম।

যত দূর মনে পড়ছে, নৌকো থেকে একটা দ্বীপ দেখতে পেয়েছিলুম। মন্দিরের চূড়ো দেখেছিলুম বলেও মনে পড়ছে। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম যে ওরই নাম মায়াপুর। অনেকের মতে মায়াপুরই আসল নবদ্বীপ, চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল ঐ মায়াপুরে।—

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥

স্বাতি বলল : এ আবার কী ?

বললুম : ভক্তিরত্নাকরে নরহরি চক্রবর্তী এই কথা লিখেছিলেন। আর এইজন্যেই মায়াপুরে যোগপীঠমন্দির চৈতন্যমঠ ও অদ্বৈতভবন। চাঁদ কাজীর সমাধিও আছে এই মায়াপুরে।

চাঁদ কাজী কে ?

চাঁদ কাজী ছিলেন গৌড়ের রাজা হুসেনশাহর শিক্ষক। চৈতন্য-দেবের কীর্তন বন্ধ করবার জন্যে তাঁর খোল ভেঙে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর কীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন বলেই মায়াপুরে তাঁর সমাধি। কিন্তু এ সব কিছুই আমি দেখি নি, শুনেছিলুম নৌকোর যাত্রীদের কাছে।

স্বাতি বলল : নবদ্বীপে কী দেখেছিলে বল।

বললুম : সবার আগে দেখেছিলুম পোড়া মা তলা। নামটা অদ্ভুত বলেই জায়গাটা মনে আছে। একটি ছায়াশীতল স্থানে সিদ্ধেশ্বরী ভবতারিণীর মন্দির। বৃন্দাবনে যেমন যোগমায়া, তেমনি নবদ্বীপে এই পোড়া মা বা বিদগ্ধ জননী। কোন সময়ে এখানকার বটগাছে আগুন লেগেছিল বলে এ জায়গার নাম হয়েছে পোড়া মা তলা।

বেশ নাম তো!

নবদ্বীপে বুড়োশিব তলাও আছে। কিন্তু এ কোন পুরনো তীর্থ-স্থান নয়। চৈতন্যদেবের জন্যেই নবদ্বীপ তীর্থে পরিণত হয়েছে। দর্শনীয় স্থানের শেষ সেখানে নেই। বহু জায়গায় ভেট দিয়ে দেখতে হয়। আবার ভেট দিতে হয় না এমন জায়গাও অনেক আছে।

স্বাতি বলল : মনে আছে এমন কয়েকটি জায়গার নাম কর।

বললুম : বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির আর সোনার গৌরাঙ্গ নামই মনে আছে। আর মনে আছে যে প্রত্যেক বাড়িতেই কিছু না কিছু দেখবার আছে। আর ভেট নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির পুরুষ ও মহিলারা। অনেক মঠ ও আখড়াও আছে। কিন্তু কেন জানি না সারা দিন ঘুরেও মনে আমার ভক্তির ভাব জাগে নি। ধূলোট মেলায় কীর্তন শুনলে হয়তো তা জাগত।

স্বাতি বলল : ভক্তি জাগাবার জন্যে ঘোরাঘুরির দরকার হয় না। আর কীর্তনের আসরে না বসে নিঃশব্দে ধ্যান করলেই সে ভাব তাড়াতাড়ি জাগবে।

সত্যি কথা।

এই প্রসঙ্গেই আমার একটি দিনের কথা মনে পড়ল। পুরীর গম্ভীরায় এসেছিলুম একটুখানি সময় কাটাবার জন্যে। সেখানে তখন কীর্তন হচ্ছিল—

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে॥

গানের সঙ্গে খোল-করতাল আছে, হাততালিও দিচ্ছেন অনেকে। আমার শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। তিনি এই গান গাইতেন, আর গৌরাঙ্গের অগণিত ভক্তকে এই নামই ভজনা করতে শিখিয়েছিলেন। বলতেন, প্রভু, তুমি শ্রীকৃষ্ণের নামগান কর, কিন্তু আমি অন্য নামগান করি।

সে কি আজকের কথা! পাঁচ শো বছর পুরো হতে আর বেশি বাকী নেই। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দুর্দশাক্লিষ্ট বাঙলায় আবির্ভাব হয়েছিল গৌরাঙ্গের। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে দোল-পূর্ণিমায় নদের নিমাইয়ের উদয় হয়। চঞ্চল শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে আসে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে ভরা উদ্ধত যৌবন। কিন্তু গতানুগতিক জীবনে প্রথম পবিবর্তন আসে গয়ায় পিতার পিণ্ডদান করে নবদ্বীপ ফেরার পথে। সেখানে দীক্ষা নিয়েছিলেন ঈশ্বরপুরীর নিকটে, আর সম্মোহিত হয়েছিলেন বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখে। আর দশজন মহাপুরুষের জীবনেও যেমন জীবের দুঃখে প্লাবন আসে হৃদয়ের দু'কূল ভরে, নিমাইএর জীবনেও আসে সেই মুহূর্ত। ভক্তির তরঙ্গ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর থেকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীবের্ মুক্তির জন্যে গাইলেন :

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্॥

কিন্তু দেশের মানুষ নিত্যানন্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইল :

যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে।

আজও বাঙলার বৈষ্ণব সেই নামই গাইছেন। কিন্তু সে শক্তি আজ কোথায়!

একদিন নবদ্বীপের মুসলমান শাসনকর্তা কাজীসাহেব বলে-ছিলেন, নবদ্বীপের পথে কীর্তন করা চলবে না। ভক্তরা বিচলিত হয়ে এলেন গৌরাঙ্গের কাছে। কৃষ্ণের নামগান কি তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে! নিমাই বললেন, না। নবদ্বীপের

পথে আজ নগর-সংকীর্তন হবে, চারিদিকে এই কথা প্রচার করে দাও।

অদ্ভুত ব্যাপার। দলে দলে নরনারী এসে সম্মিলিত হল। সুন্দর তাদের সাজসজ্জা। মুখে প্রসন্ন হাসি। সত্যাগ্রহ। অহিংস আন্দোলন। পাঁচ শো বছর আগে নবদ্বীপের রাজপথে জন্ম হল ভারতের অহিংস যুদ্ধের নীতির। খোল-করতাল-খঞ্জনি বাজিয়ে কৃষ্ণনাম করতে করতে এক বিশাল জনতা কাজীর গৃহে পৌঁছল শোভাযাত্রা করে। ভীত স্তম্ভিত কাজী হিন্দুর ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

এক দিন মায়ের পায়ে ধরে নিমাই কেঁদে উঠলেন। তিনি সন্ন্যাস নেবেন, মাকে সেই অনুমতি দিতে হবে। মা-ও কেঁদে উঠলেন। নিমাই বললেন, তোমার কান্না আমি চোখ দিয়ে দেখি মা, কিন্তু মন দিয়ে শুনি পৃথিবীর মানুষের কান্না। সকলের চোখের জল আমি মোছাতে চাই। কাঁদতে কাঁদতেই শচীমাতা সম্মতি দিয়েছিলেন। আর গভীর রাত্রে সংসার ত্যাগ করেছিলেন নিমাই। তাঁর সন্ন্যাস-জীবনের নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর।

বৃন্দাবনে নয়, মায়ের ইচ্ছায় নীলাচলপুরীতে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন। নিত্যানন্দকে তিনি নবদ্বীপে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। নিজেও নবদ্বীপে এসেছিলেন একবার, আর অন্য এক মানুষ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। চলাফেরায় নাচে ও কীর্তনে সে মত্ততা আর ছিল না। মহাপ্রভু স্থির-গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন কখনও কখনও। এক দিন হারিয়ে গেলেন। গম্ভীরায় নেই, মন্দিরেও নেই। ভক্তরা চারিদিকে খুঁজলেন। জাল ফেললেন সমুদ্রে। কিন্তু মহাপ্রভু নেই। চিরদিনের মতো তিনি হারিয়ে গেলেন আটচল্লিশ বছর বয়সে। পিছনে রেখে গেলেন তাঁর জাতি-ভেদহীন প্রেমধর্ম। সমকালীন পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ বললেন :

আমার পরশমণির কী দিব তুলনা।
পরশমণির গুণে জগতের জীব গণে
নাচিয়া গাইয়া হৈল সোনা॥

বাঙলার আধ্যাত্মিক জগতের প্রথম গুরু হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁর পরে সর্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, জীবগোস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী। এর পরের যুগে আমরা পাই রাজা রামমোহন, রামপ্রসাদ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, কমলাকান্ত ও লালাবাবুকে। সব শেষের যুগে বামাক্ষেপা, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, চরণদাস ও সন্তদাস বাবাজী। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দকে তো আমরা একালের মানুষ বলেই জানি। এঁরা সকলেই বাঙলার সন্তান। ভারতের অধ্যাত্ম-আকাশে তাঁরা জ্যোতিষ্কের মতো দীপ্তিমান।

বাঙলার অধ্যাত্ম-সাধনা শেষ হয়ে যায় নি। শেষ হবে না।

আমাদের ট্রেন সব স্টেশনে দাঁড়াচ্ছিল। যাত্রীরা ওঠানামা করছিল। আর অলস ভাবে আমরা সময় কাটাচ্ছিলুম।

এক সময় স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: কী স্থির করলে?

কী বিষয়ে বল তো!

স্বাতি বলল: নবদ্বীপ দেখবার কথা কি ভুলে গেলে?

বললুম: দেখবার ভাবনা না থাকলে নামা যেতে পারে। কিংবা—

কিংবা কী?

কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া আর সরভাজা খেয়ে পরের একটা লোকাল ট্রেন ধরা যেতে পারে।

স্বাতি খুশী হয়ে বলল: সেই ভাল।

কিন্তু কৃষ্ণনগরে আমরা নামতে পারলুম না। একদল উন্মত্ত যাত্রী হৈ হৈ করে আমাদের গাড়ি আক্রমণ করলেন। তাঁদের মধ্যে

একজনকে আমি চিনতে পারলুম। আমার পুরনো অফিসের তরুণ বন্ধু নন্দ। সে আমাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল: আরে গোপালদা যে, কোথা থেকে? আপনিও আছেন?

বলে স্বাতির সঙ্গে এমন সহজ ভাবে কথা বলল যে মনে হল সে তার অনেক দিনের চেনা। সবার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল তৎপর ভাবে।

স্বাতি লজ্জিত ভাবে বলল: আপনাকে তো চিনলাম না?

দেখা না হলে চিনবেন কী করে! গোপালদাও জানে না যে আমি আপনাকে চিনি।

তবে!

নন্দ হেসে বলল: মনোরঞ্জনদার কাছে সব কথা শুনেছি।

বললুম: কী বলেছে মনোরঞ্জন?

নন্দ সকৌতুকে বলল: এই বছরেই হবে।

প্রসঙ্গটা স্বাতি তাড়াতাড়ি পাল্টে দিল। ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে জিজ্ঞাসা করল: আপনারা আজ এখানে?

নন্দ বলল: আজ তো রবিবার। আমাদের প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের পিকনিক ছিল কালিদার বাড়িতে। দেখেন নি কালিদাকে! আমাদের ট্রেনে তুলে দিতে স্টেশনে এসেছিলেন!

এ দলে আমার পরিচিত আর কেউ ছিলেন না। নন্দ বলল: আপনি উতোরপাড়ার মানুষ বলেই এ লাইনের কাউকে চেনেন না।

দূর থেকে আর একজন বললেন: কিন্তু আপনাদের আমরা সবাই চিনি। নন্দকে আমরা অনেক দিন বলেছি, আপনাদের এক দিন এ লাইনে আনবার জন্যে।

নন্দ বলল: তাহলে মতলবটাও কেন বলছ না রমেশ?

রমেশ লজ্জা পেল, আর উত্তর দিলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তাঁর নাম শুনলুম অমরবাবু। তিনি বললেন: আমাদের এই লাইনের কথাও আপনি লিখবেন। আর আমাদের কথাও।

রমেশ বলল: শুধু শুধু লিখবেন না। এ লাইনের প্রতিটি স্টেশনের কথা আমরা আপনাকে বলব।

সত্যিই শুনলুম সব স্টেশনের কথা। এক একজন এক এক জায়গার কথা বললেন। এ সব দিকেও যে অনেক জানবার কথা আছে, তা আমি তাঁদের কাছেই জানলুম।

এক ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবারে বললেন: আমি তো বাবা রাণাঘাটে নেমে শান্তিপুর যাব। আমাকে আগে ফুলিয়া-শান্তিপুরের কথা বলতে দাও।

একবাক্যে সবাই এ কথা মেনে নিতেই তিনি বললেন: শান্তিপুরের আগের স্টেশন হল ফুলিয়া। কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়েছেন তো! ফুলিয়া হল কৃত্তিবাসের জন্মস্থান। আর ফুলিয়ার মঠ হল হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ। কিন্তু শান্তিপুরের কথা বলতে অনেক সময় লাগবে।

নন্দ বলল: সময় তো নেই! সংক্ষেপে বলুন।

ভদ্রলোক বললেন: অদ্বৈত আচার্যের নাম শুনেছেন তো? চৈতন্যদেবের বাহান্ন বছর আগে জন্মেছিলেন, আর মারা গিয়েছিলেন তাঁর মহাপ্রয়াণের পঁচিশ বছর পরে। তার মানে, এক শো পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর পাটবাড়ি হল শান্তিপুর।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন: জটিয়া বাবার নাম শুনেছেন? বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তাঁরই জন্মস্থান এই শান্তিপুর। মন্দির দেখুন শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদ, জলেশ্বর মহাদেব আর সিদ্ধেশ্বরী কালীর।

রাণাঘাট স্টেশনে ট্রেন তখন ঢুকে পড়েছিল। ভদ্রলোক ব্যস্ত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: আমার নামটা টুকে নিলেন না? মনে থাকবে তো? সুকুমার সান্যাল।

বলতে বলতেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

নন্দ এবারে বলল: চাকদহ-শিমুরালির কেউ আছেন? না,

কেউ নেই। তাহলে আমিই বলি শোনা কথা। জগদীশ পণ্ডিত আর মহেশ পণ্ডিত হলেন দুই ভাই। পুরীর নব কলেবরের সময় জগদীশ পণ্ডিত নাকি জগন্নাথের পুরনো বিগ্রহ মাথায় করে এনে শিমুরালিতে প্রতিষ্ঠা করেন। আর চাকদহে মহেশ পণ্ডিতের ফুল সমাজ বেদী ও মন্দির। চাকদহ নাম কেন হল তারও একটা গল্প আছে। গঙ্গাকে আনবার সময় ভগীরথের রথের চাকা মাটিতে ঢুকে গিয়ে চাকদহ হয়েছে। এরই কাছে পালপাড়ার পাঁচ শো বছরের পুরনো মন্দির। অনেকে বলে, নিচে প্রত্যুম্ননগরের ধ্বংসাবশেষ আছে।

তারপরে চেঁচিয়ে বলল: গুহবাবু কোথায়? কাঁচরাপাড়ার কথা আপনি বলুন।

গুহবাবু একটু দূরে ছিলেন। এবারে এগিয়ে এসে কাছে বসলেন। বললেন: হালিশহরের কথাও আমাকে বলতে হবে নাকি?

নন্দ চারিধারে তাকিয়ে বলল: ইস্, হালিশহরের দুলালবাবু থাকলে আজ রামপ্রসাদী গান শুনতে পেতেন।

তারপরে গুহবাবুর দিকে চেয়ে বলল: আপনিই বলুন।

গুহবাবু বললেন: সাধক রামপ্রসাদের ভিটে আমার দেখা আছে। দেখা আছে তাঁর পঞ্চবটী ও সাধন বেদী। কিন্তু দুলালবাবু যে চৈতন্যডোবার কথা বলেন তা আমার দেখা নেই। চৈতন্যডোবা নাকি চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।

তারপরেই কাঁচরাপাড়ার কথা শুরু করলেন: কাঁচরাপাড়ার পুরনো নাম হল কাঞ্চনপল্লী। আর বৈষ্ণবসাহিত্যে এর নাম সেন-শিবানন্দের পাট। শিবানন্দ বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন ও পুরীযাত্রীদের সেবা করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায়ের মন্দির দেখবার মতো। কবি ঈশ্বরগুপ্তের জন্মস্থান এর নিকটে। রেলের কারখানা অঞ্চলের নাম হল বীজপুর। সেখানে আছেন ডাকাতে কালী। লোকে বলে, নরবলি হত এই কালীর সামনে।

একটু থেমে বললেন: কুলিয়ার পাট বা অপরাধ অঞ্চল হল মাইল তিনেক উত্তর-পূর্বে। সেখানে গৌরনিতাই বিগ্রহ। কুলিয়ার পণ্ডিত দেবানন্দ বৈষ্ণবদের নিন্দা করতেন। চৈতন্যদেব তাঁর অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। ঘোষপাড়ার কথাও বলা দরকার। কাঁচরাপাড়া থেকে পাঁচ মাইল দূরে এই ঘোষপাড়ায় হল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র।

নন্দ বলল: কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেও কিছু বলুন গুহবাবু। সবাই এ কথা জানেন না।

গুহবাবু বললেন: কর্তাভজা বৈষ্ণবদেরই একটি সম্প্রদায়। ভক্তরা মনে করেন যে তাঁদের প্রবর্তক অটলচাঁদ চৈতন্যের অংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের ধর্ম হল সত্যধর্ম বা সহজধর্ম। কর্তা হলেন জগতের স্রষ্টা ও গুরু তাঁর প্রতিনিধি। 'গুরু সত্য' এই মন্ত্র তাঁরা প্রচার করেন। গুরুরা মহাশয় ও শিষ্যরা বরাতি নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়েরই এক গুরুর স্ত্রী 'সতী-মা' নামে পরিচিত। ডালিমতলায় তাঁর সমাধিস্থান।

হঠাৎ গুহবাবুর একটা পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। বললেন: কাঁচরাপাড়ায় যে কৃষ্ণরায়ের মন্দিরের কথা বললাম, পুরাকালে নাকি প্রতাপাদিত্যের কাকাও কৃষ্ণরায়ের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

তারপরেই বললেন: বারো ভুঁইঞার কথা যেন বাদ দেবেন না— প্রতাপাদিত্য কেদার রায় ঈশা খান এঁদের মতো বীর সারা ভারতে কম জন্মেছে। 'হিরোস অব বেঙ্গলে' ঈশা খানের গল্প পড়েছেন তো? মানসিংহের তরোয়াল দু'টুকরো করে দিয়েছিলেন।

গল্পে-গল্পেই আমরা কল্যাণী ছাড়িয়ে কাঁচরাপাড়ায় এসে পৌঁছে গেলুম। গুহবাবু নামবার আগে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে গেলেন: কল্যাণীর অনেক উন্নতি হবে ভেবে জমি কিনেছিলাম। কিন্তু বিশেষ কিছু হল না।

অমরবাবু ও রমেশ নামলেন নৈহাটিতে। নৈহাটির কথায় অমর-

বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বললেন। আর গৌরিদা গ্রামে কেশবচন্দ্র সেনের জন্মের কথা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথাও বললেন। কিন্তু দর্শনীয় কোন স্থানের কথা বললেন না। ভাট-পাড়ার কথায় এল সংস্কৃতচর্চার কথা, আর বড় বড় কয়েকজন পণ্ডিতের নাম জানা গেল। শ্যামনগরের কালীবাড়ি ও দ্বাদশ শিব-মন্দিরের কথা এঁরাই বললেন। আর একটি গল্পও শোনালেন। পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের সাত বছর বয়সের মেয়ে ব্রহ্মময়ীর মৃতদেহ গঙ্গায় ভেসে এসে শ্যামনগরের ঘাটে লাগে। গোপীমোহন স্বপ্নাদেশ পেয়ে এইখানে ব্রহ্মময়ীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্যারাকপুরে কেউ নামলেন না। ব্যারাকপুরের কথাও বললেন না কেউ। ব্যারাকপুরে ছিল ইংরেজের সেনানিবাস। সিপাহী-যুদ্ধের আগুন জ্বলেছিল এইখানেই। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে সেনা পাঠানোর গল্প আর জাত-যাওয়া টোটার গল্প। এখানে তখন বড়-লাটের বাড়ি ছিল। লর্ড ক্যানিংএর মেমসাহেব এই বাড়িতে থাকতে ভালবাসতেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে এই বাড়ির বাগানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। যে মিষ্টি খেতে তিনি ভালবাসতেন তার নাম হয়েছে লেডিকেনি।

এরপরে খড়দহর অধীরবাবু এলেন গল্প বলবার জন্যে এগিয়ে। বললেন: টিটাগড়ে আপনারা পাট ও কাগজের কারখানা আছে বলেই জানেন। কিন্তু গঙ্গার ধারে যে বিশালাক্ষীর মন্দির আছে তা জানেন না। রানী রাসমণির কন্যা তারাঠাকুরাণী এখানে গঙ্গার ঘাটে দ্বাদশ শিবমন্দির ও অন্নপূর্ণার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর খড়দহ নাম কেন হল তা নিশ্চয়ই জানেন?

বললুম: না।

অধীরবাবু বললেন: প্রভু নিত্যানন্দর জন্যে এই নাম হয়েছে। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে গৃহী হতে বললেন। নিত্যানন্দ শালিগ্রামের

পণ্ডিত সূর্যদাস সরখেলের দুই মেয়ে বসুধা ও জাহ্নবীকে বিয়ে করে খড়দহে এলেন বসবাস করতে। এখানকার জমিদারের কাছে এক খণ্ড জমি চাইতেই তিনি বিদ্রূপ করে একটি খড় গঙ্গার জলে ফেলে বললেন, এই তোমার জমি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! গঙ্গার প্রবল স্রোতের মধ্যে একটি চড়া জেগে উঠল। আর সেই খড়দহে বাস করতে লাগলেন নিত্যানন্দ। এখানকার শ্যামসুন্দরের প্রতিষ্ঠার কথা জানেন তো?

বললুম: না।

সে সম্বন্ধেও একটি গল্প আছে। গঙ্গার ওপারে বল্লভপুরে থাকতেন রুদ্র ব্রহ্মচারী। তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে কৃষ্ণ তাঁকে গৌড়ের সুলতানের প্রাসাদ থেকে একখানি পাথর এনে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন। রুদ্র গৌড়ে গিয়ে সেই পাথরটি চাইলেন। কিন্তু সুলতান সেই পাথর দেবেন কেন! হঠাৎ তাঁর হিন্দু মন্ত্রী দেখলেন যে পাথর থেকে ঘাম বেরোচ্ছে। তাই দেখে তিনি সুলতানকে বোঝালেন যে এ খুব খারাপ লক্ষণ, পাথরখানা দিয়ে দেওয়াই ভাল। কিন্তু পাথরটি নৌকোয় তোলবার সময় তা জলে পড়ে গেল, আর স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকল বল্লভপুরের ঘাটে। সেই পাথরে রুদ্র তিনটি বিগ্রহ নির্মাণ করলেন—শ্যামসুন্দর রাধাবল্লভ ও নন্দদুলাল। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের খুব পছন্দ হয়েছিল শ্যামসুন্দরের বিগ্রহটি। রুদ্রের দেবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। প্রবল জলঝড়ে রুদ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হবার উপক্রম হয়েছে। বীরভদ্র নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, তিনি এই দুর্যোগ থেকে সব রক্ষা করলেন। রুদ্র কৃতার্থ হয়ে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহটি বীরভদ্রকে দিলেন। শ্যামসুন্দরের প্রতিষ্ঠা হল খড়দহে।

অধীরবাবু বোধহয় আরও অনেক কিছু বলতে পারতেন। কিন্তু ব্যারাকপুরে পৌঁছতেই উঠে পড়লেন। বললেন: এখান থেকে আমাকে একটা লোকাল ধরতে হবে। এসো নন্দ।

বলে তিনি নামবার উদ্যোগ করলেন।

নন্দ বলল : আমি অবশ্য গোপালদাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে ফিরতে পারি।

বললুম : রাত অনেক হয়েছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

অধীরবাবু নন্দর হাত ধরে ট্রেন থেকে নামলেন। আর আমাদের জানালার কাছে এসে নন্দ বলল : এ লাইনের আর বেশি কথা নেই। সোদপুরের সুধীনবাবু থাকলে পানিহাটির কথা বলতেন। বৈষ্ণবদের তীর্থ, রাঘব পণ্ডিতের মদনমোহন ঠাকুর। চৈতন্যদেবের পায়ের চিহ্ন আছে গঙ্গার ঘাটে। আর একটা নতুন কথা—এই ঘাটের ইঁট আমেরিকার ফ্লোরিডার এক পার্কে আছে ওয়াক্ অব ফেম নামে এক প্রতিষ্ঠানে।

সত্যি !

পড়েছি বাঙলা ভ্রমণে।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। নন্দ চলতে চলতে বলল : আগরপাড়া প্ল্যাটফর্মের পাশে পীরের দরগা, বেলঘরিয়ায় জন্ম কৃষ্ণদাসের যিনি বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের নামে রায়মঙ্গল—

লিখেছিলেন কথাটা আর শোনা গেল না। আমি হাত নেড়ে তাঁদের বিদায় দিলুম।

৩৬

রাত প্রায় এগারোটায় আমরা শিয়ালদহে পৌঁছলুম। আর গেটে টিকিট জমা দিয়ে বেরোতে গিয়ে আশ্চর্য হলুম—সুবলবাবু আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

স্বাতি লজ্জিতভাবে বলল: আপনি কষ্ট করলেন কেন সুবলদা?

কষ্ট আর কী! আর আজকালকার লোকের উপরে কোন ভরসা তো নেই! গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার বাইরে বসে থাকত। আর তারপরে ফিরে এসে বলত, কেউ আসে নি।

আমাদের দুজনকে গাড়ির পিছনে তুলে দিয়ে নিজে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। বললেন: দিল্লীর খবর এসেছে।

এসেছে!

সুবলবাবু তাঁর পকেট থেকে একখানা টেলিগ্রাম বার করে স্বাতির হাতে দিলেন। বললেন: পরশু বিকেলের গাড়িতে এসে পৌঁছবেন।

অন্ধকারেই স্বাতি টেলিগ্রামটা পড়ে ফেলল। উজ্জ্বল দেখাল তার চোখজোড়া। বলল: বাবা মা এসে পড়লে আমি বেঁচে যাই।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম: এখন কি খুব কষ্টে আছ?

শান্তি কোথায় বল!

তা ঠিক।

তারপরেই স্বাতির আর একটি সমস্যা দেখা দিল। বলল: পরশু আর এক বিপদ আছে।

কী? বলে তার মুখের দিকে আমি তাকালুম।

স্বাতি বলল: পরশু সন্ধ্যাবেলায় যে পপির বিয়ে তা মনে নেই!

বললুম : তাতে বিপদ কিসের !

যদি স্টেশনে যেতে না পারি !

বললুম : আমি গিয়ে নিয়ে আসব।

স্বাতি বলল : উমাশঙ্করবাবু যে রকম লোক, তোমাকেও টেনে নিয়ে যাবে।

সুবলবাবু সামনে থেকে বললেন : আমি তো থাকবই। আপনারা দুজনেই বিয়ে দেখতে যাবেন।

দেখি। বলে স্বাতি চুপ করে রইল।

পরদিন স্বাতি বলল : আজ তোমার ছুটি। তুমি পড়াশুনো করে দিনটা কাটাও।

আর তুমি ?

আমার আজ অনেক কাজ। বাবা মা আসছেন, সব গোছগাছ করে রাখতে হবে তো! আর—

আর কী ?

পপির জন্যে একটা উপহারও কিনতে হবে।

বলে স্বাতি বেরিয়ে গেল। আর আমি অলসভাবে বসে রইলুম।

নানা ভাবনা এল মনে, অনেক রকমের অদ্ভুত আজগুবি ভাবনা। আমি যে স্বাতির সঙ্গে এই বাড়িতে আছি, এ দৃশ্য দেখে মামা মামী কী ভাববেন জানি না। অথচ এ নিয়ে স্বাতির কোন ভাবনা নেই। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা যে আর কিছু হতে পারে না, তার মধ্যে এই রকমই একটা ভাব দেখতে পেয়েছি।

দুপুরে স্বাতি যখন ফিরে এল তখন তাকে এই কথা বললুম। স্বাতি হেসে উঠল আমার ভাবনার কথা শুনে। তারপরে বলল : এ ভাবনা তোমার, না আমার! তোমাকে উত্তরপাড়ার বাড়িতে পৌঁছে দিলে কি ওঁরা খুশী হবেন ভাবছ ?

এখানে থাকাও খুব শোভন মনে হচ্ছে না।

আজ তোমার এ কথা কেন মনে হচ্ছে!

আমি লজ্জা পেলুম এই কথায়। কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

পপি আর উমাশঙ্করের টেলিফোনে আমরা অস্থির হয়ে গেলুম বিকেলবেলায়। উমাশঙ্কর বলল: কী আশ্চর্য লোক মশাই আপনি! সকালে উঠে দেখি, খাঁচার পাখি উড়ে গেছে! তা একবার বলে আসবেন তো?

স্বাতি পপিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে সে তাদের বলেই এসেছে। কিন্তু বিশ্বাস করে নি সে। বলেছে, আমরা কি বেহুঁশ ছিলাম যে বলে এলে বুঝতে পারতাম না!

তাদের সারকথা হল যে স্বাতিকে সকালবেলাতেই পপিদের বাড়ি যেতে হবে। আশীর্বাদ আগেই হয়ে গেছে। সকালে গায়ে হলুদ, আর বিয়ে সন্ধ্যেবেলায়। বিয়ের পরে বাসরেও রাত জাগতে হবে। স্বাতি বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, তা হয় না। দিল্লী থেকে বাবা মা আসছেন। বিকেলে হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে, আর রাতে বাড়ি ফিরতেই হবে তাকে।

উমাশঙ্কর আমাকে বরযাত্রী নেবে। বলল: ফাঁকি দিলে চলবে না ব্রাদার! মানে আপত্তি থাকলে আমি এসে টেনে নিয়ে যাব। মানে, আপনি আমার দলে।

আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম যে সন্ধ্যেবেলায় আমার একটু অসুবিধে আছে। কিন্তু কার কথা কে শোনে! বলল: বুঝেছি, বিকেলবেলায় ধরে আনতে হবে। ঠিক সময়মতোই নিয়ে আসব।

পরদিন সকালবেলায় স্বাতি বলল: এ বেলায় তো কোন অসুবিধে নেই। এক ফাঁকে গিয়ে ওর গায়েহলুদটা দেখে আসব। কিন্তু বিকেলে আমাকে স্টেশনে যেতেই হবে। বাবার শরীর তো আর আগের মতো নয়, আমাকে দেখতে না পেলে ভেবে অস্থির হবেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : শরীর খারাপ নিয়ে আসছেন!

স্বাতি বলল : বলি নি তোমাকে! বুকের কষ্ট হয়েছিল একবার। সারা জীবন সাবধানে থাকতে হবে।

এ কথা নিয়ে আমি আর আলোচনা করলুম না। বললুম : আমাকে দেখলেও সাহস পাবেন।

স্বাতি বলল : তোমার উপরে ভরসা নেই কিনা? উমাশঙ্করবাবু তোমার কোন কৈফিয়ৎ শুনবেন না। কাজেই আমাকেই থাকতে হবে।

তারপরে বলল : সাড়ে চারটের পরেই আসে ডি-লাক্স ট্রেনটা। বাবা-মাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি স্বচ্ছন্দে যেতে পারব।

বললুম : তাহলে আমরা দুজনেই যাব, কী বল!

উত্তরে স্বাতি বলল : আমি গেলে তোমার না গেলেও চলে।

কেন জানি না আমার মনে হল যে স্বাতি খানিকটা দ্বিধার সম্মুখীন হয়েছে। পরশু রাত্রে মামা মামীর আসার সংবাদ পেয়ে তার যে আনন্দ দেখেছিলুম, আজ তা এক রকমের সমস্যায় পরিণত হয়েছে। স্বাতি ঠিক করে উঠতে পারছে না, আমরা দু'জনে কেন হাওড়া স্টেশনে যেতে পারি না।

শেষ পর্যন্ত স্বাতি পপির গায়েহলুদ দেখে দুপুরের খাওয়া সেখানেই সেরে এল। বলল : একা খেয়ে পেট ভরেছে তো! না মার কাছে নালিশ করবে পেট ভরে নি বলে!

তারপরেই বলল : না বাপু, হাওড়া স্টেশনে আমি যাব না।

কেন?

পপির কাছে যেতে দেরি হলে ও পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে। আমি বরং ওদের বাড়িতেই নেমে যাব। বাবা মাকে তুমিই বাড়ি এনো।

বিকেল চারটের আগেই আমরা হাওড়া স্টেশনে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লুম। স্বাতি একটা ব্যাগের মধ্যে শাড়ি-গয়না নিয়ে

গাড়িতে উঠল। স্টেশনে সে যাবে না, তাকে আমরা নামিয়ে দিলুম পপির বাড়িতে।

ট্রেন এল প্রায় সাড়ে পাঁচটায়। মামী জানালার কাচ তুলে বসেছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই হাত নাড়লেন। সুবলবাবু গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন খানিকটা।

মামাকে নিয়ে মামী খুব ধীরে ধীরে নামলেন। আমি প্রণাম করলুম দুজনকে। সুবলবাবুও প্রণাম করলেন। আমার চোট-পাওয়া হাতখানা তখনও গলার সঙ্গে বাঁধা ছিল। মামী সেই হাতের উপরে হাত বুলিয়ে বললেন : আর কোন কষ্ট নেই তো বাবা ?

বললুম : না।

মামীর চোখ দুটি হঠাৎ ছলছল করে উঠল। মুখ ফিরিয়ে সুবলবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন : স্বাতি আসে নি ?

সুবলবাবু বললেন : বন্ধুর বিয়ে। সেখানেই নামিয়ে দিয়ে এলাম।

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন : স্টেশনে ও আসবে না জানি।

ক্যাব রোডের ভিতরে গাড়ি রাখা হয়েছিল। জিনিসপত্র নিয়ে আমরা গাড়িতে উঠলুম। মামী আমার হাত ধরে নিজের পাশে নিয়ে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : আমার চিঠি পেয়েছ তো ?

বললুম : না তো। পরশু আপনাদের টেলিগ্রাম পেয়েছি।

আমার কথা শুনে মামী সোজা হয়ে বসলেন, বললেন : পাও নি আমার চিঠি! তোমাকে দেবার জন্যে স্বাতির হাতে দিয়েছিলুম যে!

মামা বললেন : বলি নি তোমাকে! ও চিঠি স্বাতি গোপালের হাতে কিছুতেই দেবে না! তার লজ্জা তো জানো!

আমি উদ্বিগ্ন হলুম অপরিমিত। চিঠিতে মামী এমন কী লিখেছিলেন যে স্বাতি লজ্জায় তা আমাকে দিতে পারে নি! তবু বললুম : কাজের চাপে বোধহয় ভুলে গিয়েছে। এখন তো ওকেই সব দেখাশুনা করতে হচ্ছে।

মামা বললেন: তুমিও যেমন! ও ইচ্ছা করেই চিঠি দেয় নি। তা ভালই করেছে। বাড়ি পৌঁছে ধীরেসুস্থে তুমি প্রস্তাব কোরো।

মামীকে উপদেশ দিয়ে মামা আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। আমি লজ্জা পেলুম তাঁর হাসি দেখে। তবে কি এই জন্যেই তাঁরা নির্ভয়ে মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছেন! কিন্তু—না, আর বোধহয় কোন দ্বিধা নেই মামীর মনে। আমি আজ জাতিচ্যুত, আমি আর কেরাণী নই। অন্য এক সমাজে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়েছি আমি। সেই জন্যেই কি মামী আজ আমাকে নতুন চোখে দেখছেন! তবু একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে! আমি তো সেই আমিই আছি! নিজেকে কি বদলাতে পারব আমি!

বাড়ি পৌঁছে মামী কোন কথা আমাকে বলতে পারলেন না। উমাশঙ্কর হুড়মুড় করে এসে উপস্থিত হল। বলল: চলুন শিগগির।

আমি বললুম: মামা মামী এসেছেন—

এসেছেন নাকি! তা ওঁদেরও নিয়ে চলুন। ওঁরা বরযাত্রী যাবেন।

মামা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন: আমরা বুড়োবুড়ি অনেক দূর থেকে এসেছি। খুব ক্লান্ত শরীর। এখন গোপাল আপনার সঙ্গে যাক।

ব্যস, এইটুকুরই যেন অপেক্ষা। উমাশঙ্কর আমাকে হাত ধরে তার গাড়িতে টেনে তুলল। তারপরে পথে যেতে যেতে বলল: একটা খুব বড় কাজ করেছি ব্রাদার। ধন্যবাদ দেবেন আমাকে। মানে—

বলুন।

বিয়ের মন্ত্রগুলো বাঙলায় শুনতে পাবেন। এক পণ্ডিত যোগাড় করেছি, পুরুতের পাশে বসে বাঙলা অনুবাদ শোনাবে। আর একটা মতলব করেছি। কোনরকমে সন্ধ্যার লগ্নটা পার করে দেব, তার-পরে ফাঁকা ময়দানে সব দেখবেন।

তাই হল। বিয়ে দেখবার জন্যে বেশি লোক আর রইলেন না। খেয়েদেয়ে প্রায় সবাই চলে গেলেন। এক ফাঁকে স্বাতিকে আমি বললুম: মামা মামীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি।

জানি। বলে স্বাতি সরে গেল।

আর একবার তাকে জিজ্ঞাসা করবার চেষ্টা করলুম: মামী একখানা চিঠির কথা বলছিলেন—

হারিয়ে গেছে। বলে এবারেও সে সরে গেল।

তারপরে আশ্চর্য হলুম একটা ব্যবস্থা দেখে। বিয়ে আরম্ভ হবার সময়ে পপির মা স্বাতিকে ধরে এনে বললেন: তুমি এইখানে বসে বিয়ে দেখবে, আর গোপালকে আমি ডেকে আনছি।

বলে আমাকে ধরে আনলেন। বললেন: দশজনের মধ্যে তোমাকে দেখে আমি চিনেছি। শুধু হাতখানা এখন বাঁধা নেই বলে চিনতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল।

হাতখানা যে আমার এখন খোলা তা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। উমাশঙ্কর এটা খুলে দিয়েছিল, বলেছিল: আপনি হলেন রিয়েল মিতবর, মানে আমার কাছে কাছে সারাক্ষণ থাকবেন। জানেন তো ব্রাদার, মেয়েদের নাকি নানা রকম উপদ্রব জানা আছে। পপিকে বলে দিয়েছি, আপনাকে আমার পাশে বসতে দেবার জন্যে।

মনে হল, পপির মা এই ব্যবস্থাই করেছেন। শুধু দুজনে বসতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল বলে আমরা আরও কয়েক জনের সঙ্গে পাশা-পাশি বসলুম।

এর আগে ঠিক এ রকম কাছে থেকে কোন বিয়ে আমি দেখি নি। কখন যে নিজের অজ্ঞাতসারে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম, তাও বুঝতে পারি নি। যে ভদ্রলোক বাঙলায় অনুবাদ শোনাচ্ছিলেন, তিনি আমার কাছেই ছিলেন। সংস্কৃত মন্ত্রের পরে তাঁর অনুবাদও আমার কানে যাচ্ছিল। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলুম যে এই সব মন্ত্র কোন বালিকাবধূর উদ্দেশ্যে রচিত নয়, এই মন্ত্রে নবযৌবনা নারীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

পপির বাবা কন্যা-সম্প্রদান করতে বসেছিলেন। কয়েক গাছি কুশ পাদ্য-অর্ঘ্য আচমনীয় ও মধুপর্ক দিলেন বরকে। বর সেই কুশ

পায়ের নিচে রাখবার সময় বলল, আকাশে যেমন সূর্য, এই বিবাহ-বাসরে তেমনি আমি। এখানে কেউ যদি আমাকে হিংসা করে তো তাকে আমি এমনি করে পায়ের নিচে রাখছি। তারপরে মধুপর্ক ঘ্রাণ করবার সময় বলল, মধুর যে মধুময় রূপ, আমি যেন সেই রূপের অন্ন ভোগ করতে পারি।

তারপরে দ্বিতীয় মুখচন্দ্রিকার মন্ত্র।—

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥

সমস্ত দেবতারা আমাদের উভয়ের হৃদয় মিলিত করুন। বরুণ পবন ও দেষ্ট্রী দেবতা আমাদের সম্পূর্ণভাবে মিলিত হতে দিন।

সম্প্রদানের পর বর কামস্তুতি পাঠ করল—প্রশ্ন, কে দান করল? কাকে দান করল? উত্তর, কামদেবই দান করলেন, কামদেবকেই দান করলেন। কামদেবই দাতা ও প্রতিগ্রহীতা। হে কামদেব, এই কন্যা তোমারই জন্য। আমরা উভয়ে যেন তোমারই সত্তা দিয়ে উপভোগ করতে পারি। আকাশ কন্যাকে দান করলেন বৃষ্টি রূপে, আর বর রূপে পৃথিবী তা ধারণ করলেন।

শুভদৃষ্টির মন্ত্রগুলিও সুন্দর।—

হে বধূ, তুমি প্রশান্তদৃষ্টি ও পতির প্রতি অহিংস ও প্রফুল্লমনা হও। গৃহপশুদের হিতকারিণী তেজস্বিনী বীরপ্রসবিনী দেব-অভিলাষিণী ও সুখকর ও পরিজনের কল্যাণী হও।

কয়েকটি হোমের পরে লাজ-হোম শুরু হবার আগে একটি নতুন কথা শুনলুম। যে ভদ্রলোক মন্ত্রের অনুবাদ করছিলেন, তিনি বললেন: কনেকে দিয়ে এই লাজ-হোমের মন্ত্র পাঠ করনো উচিত, কিন্তু বরকে দিয়েই এই মন্ত্র পাঠ করানো হয়ে আসছে।

কথাটা যে সত্য তা মন্ত্রের মানে শুনেই স্বীকার করলুম।—

পতিলাভের জন্য এই কন্যা যে অগ্নিরূপ অর্যমার পূজা করেছিল সেই দেবতা আমাকে এই পিতৃকুল থেকে মোচন করুন। কিন্তু

পতির কাছ থেকে কখনও নয়। এই নারী অগ্নিতে ইখ ছড়িয়ে তাকে বলছে যে আমার পতি আয়ুষ্মান ও জ্ঞাতিরা ধনবান হোন। এতে তোমারও সমৃদ্ধিলাভ হোক ও আমাদের দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠুক—অগ্নিদেব আমাদের এই আশীর্বাদ করুন।

তারপরে কন্যার পাণিগ্রহণ করে বর মন্ত্র পাঠ করল—

তোমার সৌভাগ্য লাভের জন্যে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করছি, তুমি আমার সঙ্গে শেষ বয়স পর্যন্ত এক সঙ্গে থাক। গৃহস্থ-ধর্ম পালনের জন্য দেবতারা তোমাকে আমার হাতে অর্পণ করুন। তোমার ও আমার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হোক। আমি সাম ও তুমি ঋক্। আমি আকাশ ও তুমি পৃথিবী, এইরূপে আমরা দুজনে আজ বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হচ্ছি। আমরা যেন বহু পুত্র লাভ করি ও তারা যেন দীর্ঘজীবী হয়। আমরা যেন পরস্পরের প্রিয় রুচিসম্মত ও মনোরঞ্জনে সক্ষম হই। আমরা যেন শত শরৎ আনন্দে জীবিত থেকে শত শরতের বার্তা শুনতে পাই।

এর পরে সপ্তপদী গমনের মন্ত্রগুলিও যে তাৎপর্যপূর্ণ তাতেও সন্দেহ নেই। হোমের অগ্নির উত্তরে সাতটি মণ্ডল আঁকা ছিল। বর নিজের ডান পা দিয়ে বধূর ডান পা এক মণ্ডল থেকে অন্য মণ্ডলে ঠেলে দেয় আস্তে আস্তে। আর মন্ত্র পাঠ করে—

অন্ন লাভের জন্য বিষ্ণু তোমাকে এক পা আমার সঙ্গে নিয়ে যান। তেমনি বললাভের জন্য দু পা, ধনলাভের জন্য তিন পা, সুখলাভের জন্য চার পা, পশুকল্যাণের জন্য পাঁচ পা, অনুকূল ধাতুলাভের জন্য ছ পা; আর সপ্তপদী গমনে তুমি আমার সখী হও। তুমি আমার অনুবর্তী হও, এই উদ্দেশ্যে বিষ্ণু তোমাকে আমার সঙ্গে সপ্তপদ নিয়ে যান।

হৃদয় লাভ অনুষ্ঠানের মন্ত্রটি মনে রাখবার মতো।—হে বধূ, আমার জীবনের ব্রতে তোমার হৃদয় স্থাপিত করছি। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হোক। আমার কথা তুমি এক মনে মেনে

নাও। প্রজাপতি দেবতা তোমাকে আমার জন্য আদর্শ জীবন যাপনে নিযুক্ত করুন।

আমাদের আশপাশ থেকে কখন যে সবাই উঠে গিয়েছিল তা খেয়াল করি নি। হঠাৎ মনে হল যে স্বাতির একখানি হাত আমি নিজের দু'হাতের মধ্যে ধরে আছি। এ কথা মনে হতেই তার হাতখানি আমি ছেড়ে দিলুম। কিন্তু স্বাতি তার হাত সরিয়ে নিল না, কোন কথাও বলল না।

বাড়ি ফেরার পথে স্বাতি প্রশ্ন করল: সেই মন্ত্রটা তো এরা পড়ল না?

কোন্ মন্ত্র?

স্বাতি বলল: ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব।

বললুম: তদস্তু হৃদয়ং মম।

তারপর?

যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম: সামবেদীয় বিয়ের শেষে এই মন্ত্র পাঠ করে খাবার নিয়ম। ব্রাহ্মরা এই মন্ত্র পাঠ করেন বিয়ের সময়। হিন্দু বিবাহের সবচেয়ে বড় কথা হল এই—তোমার এই যে হৃদয় তা আমার হোক, আর আমার এই যে হৃদয় তা তোমার হোক।

স্বাতি বলল: খুব সুন্দর কথা।

তারপরে অস্পষ্টভাবে আবৃত্তি করল:

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব,
তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম,
তদস্তু হৃদয়ং তব॥

ভাগীরথী পর্ব সমাপ্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য

মানুষের নূতন দেশ দেখার বাসনা কতকটা নেশার মতো। কেউ সে সুযোগ পান, কেউ পান না। কিন্তু শখ সবারই সমান। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের একটা সঙ্গীর দরকার, যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য ভ্রমণকাহিনীই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। আর যাঁরা বাড়িতে বসে ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁদের কাছেও ভ্রমণকাহিনী অপরিহার্য। এঁদের সবার জন্যে লেখা হয়েছে রম্যাণি বীক্ষ্য। পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী শুধু রবীন্দ্র পুরস্কারেই সম্মানিত হন নি, গত কয়েক বৎসরে বাঙলার ভ্রমণ-সাহিত্যকে অভাবনীয় রূপে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, নানা রম্যস্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল তারই অভিব্যক্তি এই রচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত-দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, বর্তমানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্য ও তার কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ পাঠকের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনীও বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এ গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। স্টেশনে তাঁদের ভৃত্য নিখোঁজ, আর এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পালানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী,

কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। কিন্তু সামাজিক মাপকাঠিতে গোপালের বাজার দর যাই হোক, সুরুচি ও শিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন, আর গোপালও স্বাতির চোখের দৃষ্টিতে আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। ফলে সেও হল তাঁদের সহযাত্রী।

প্রথম গ্রন্থ অন্ধ্র পর্বে ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু ধরা দেবার মতো মেয়েও সে নয়। সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াড়া ও মঙ্গলগিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বেও তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরু-চেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর কেরল পর্বে তাদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম, বর্কলা, পেরিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারি। যমজ শহর এর্নকুলম-কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখান থেকে কালিকটের সমুদ্র দেখে নীলগিরি পাহাড়।

কর্ণাট পর্ব শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে মহিসুর রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে তারা এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

তারপর যখন যবনিকা উঠল তখন গোপালকে দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত দেখা গেল। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে কালিন্দী পর্বে। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়। মামা গোপালকে গরিব জেনেও জামাই করতে পারতেন, কিন্তু নিতান্ত সামাজিক কারণে মামীর তাতে গভীর আপত্তি।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি রাজস্থান পর্বে। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমীর পুষ্কর

চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা। গোপাল ও স্বাতির সম্পর্ক আগের মতোই সহজ রইল।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ **কোঙ্কণ পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাটের আমেদাবাদ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।

তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু ইন্দোর ও উজ্জয়িনী, সাঁচী, ভোপাল, বিদিশা ও খাজুরাহো। এই কাহিনী পাওয়া যাবে **অবন্তী পর্বে**।

পরবর্তী তিনটি পর্বে সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহুঃ। **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায়, ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল ঋতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে।

মগধ পর্বে শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা। সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে। তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে।

কোশল পর্বে বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা। কুমায়ুনের শৈলাবাস ও হিমালয়ের তীর্থস্থানগুলির পরিচয়ও এতে বাদ পড়ে নি।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান।

কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীরে গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস্ বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। একদিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্য দিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে তীর্থযাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও আহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে নেফা নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের কথা এবং এই স্বল্প পরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিং কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার কথা। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

এরপর **ভাগীরথী পর্বে** পশ্চিম বাঙলার কথা। রাজধানী কলকাতা যে কত বিচিত্র নিজের চোখে দুবেলা দেখেও তা জানা যায় না। আর কলকাতাই পশ্চিম বাঙলার সব নয়। বিস্মৃত-প্রায় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর, রাঢ় দেশ ও শান্তিনিকেতন, দীঘা গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন—সব দেখা হতে না হতেই মামা মামী এলেন দিল্লী থেকে। স্বাতি ও গোপাল তখন মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে: ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব…

ভাগীরথী পর্বেই কি রম্যাণি বীক্ষ্যের শেষ?

নিতা মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক